পরেশের গল্প

সম্পাদনা করেছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনুবাদ করেছেন

বুদ্ধদেব বসু

ক্ষিতীশ রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সিগনেট প্রেস

কলিকাতা

মিসেস ফ্রিডা লরেন্সের সহযোগিতায়
প্রথম সংস্করণ ১৩৫২
—প্রকাশক—
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড কলিকাতা
—প্রচ্ছদপট ও ছবি—
সত্যজিৎ রায়
—মুদ্রাকর—
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রিট কলিকাতা
—প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
গসেন এণ্ড কোম্পানি কলিকাতা
৯।১এ শ্রীনাথ দাস লেন
—বাঁধিয়েছেন—
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট কলিকাতা

*
দাম সাড়ে তিন টাকা

সূচিপত্র

(১৮৮৫—১৯৩০)

ডি. এইচ. লরেন্স

ইংরাজি সাহিত্য-ক্ষেত্রে লরেন্সের আবির্ভাব, ইংলণ্ডের হিমেল আব-হাওয়ায়, সূর্যতপ্ত গরম দেশের গাঢ় সবুজ রহস্য-নিবিড় বর্ণসমারোহময় অরণ্যের দেখা পাওয়ার মতোই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। মনের মেঘ-লোক যারা ছাড়িয়ে উঠেছেন, এমন বহু বিরাট দিক্‌পাল ইংরাজি সাহিত্যে আছেন, কিন্তু লরেন্স ঠিক যেন তাঁদের জাতের নয়। মনের দিক দিয়ে সুমেরুবৃত্তের চেয়ে বিষুবরেখার যেন তিনি বেশি কাছাকাছি। আগ্নেয়গিরির দুরন্ত তীব্র উত্তাপ তাঁর ভাষায়, তাঁর মনে রৌদ্রোজ্জ্বল বিচিত্র রঙের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য। ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত শান্ত গম্ভীর বনেদী চালের সাহিত্যের জগতে তিনি কিছুদিন বজ্রঘোষিত বিদ্যুৎ-কশায়িত মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন।

কয়লার খনির এক শ্রমিকের ঘরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ডেভিড হারবার্ট লরেন্সের জন্ম হয়। বাপমায়ের তিনি চতুর্থ সন্তান। নিজের চেষ্টায় যথাসাধ্য পড়াশুনা করে অল্প বয়সেই তাকে কাজে বেরুতে হয়। সতেরো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত খনির শ্রমিকদের একটি প্রাথমিক পাঠশালায় তিনি শিক্ষকতা করেন; তার পরের দুবছর কাটান নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে বেরিয়ে ক্রয়ডনের একটি স্কুলে মাস্টারি করবার সময় তাঁর অনুরাগিণী এক বান্ধবী তখনকার ইংলিশ রিভিউ কাগজের সম্পাদক ফোর্ড ম্যাডক্স হুয়েফারের কাছে তাঁর কয়েকটি কবিতা পাঠান। ফোর্ড ম্যাডক্স হুয়েফারই এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রতিভার অসামান্য দীপ্তি দেখে লরেন্সের সাহিত্য-জগতে প্রবেশের সহায় হন।

৪৫ বৎসর বয়সে ১৯৩০ সালের ৩রা মার্চ লরেন্স মারা যান

জীবনে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা বেশ প্রচুরই তিনি লিখে গেছেন। ভাষা, ভঙ্গী, বিষয়-বস্তুর অভিনবত্ব সব দিক দিয়েই তাঁর রচনা ইংরাজি সাহিত্যে একটি বিশেষ অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছে। তবু শুধু সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তাঁর সমস্ত রচনার সম্পূর্ণ মূল্য বোধহয় কষে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *The White Peacock* থেকে, তাঁর শেষ রচনা *The Escaped Cock* পর্যন্ত যে জ্বলন্ত প্রচণ্ড সৃষ্টি-প্রবাহ আমরা অনুভব করি, তা বিশুদ্ধ শিল্প-নিষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা নয়। সৃষ্টির রহস্য-মর্ম-সন্ধানী সাধকের তৃপ্তিহীন জীবন-জিজ্ঞাসাই নানা ছন্দে নানারূপে তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

জীবনের বিপুল বিচিত্র প্রকাশ থেকে নিজের খেয়াল খুশি ও মতলব মাফিক টানাপোড়েনের নক্সা বুনে তোলাতেই যাদের তৃপ্তি, লরেন্স ঠিক সেই জাতের সাহিত্যিক নন, তাঁর চোখে সেই তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি, অর্ধ-সত্য-বিড়ম্বিত আমাদের কুয়াশাচ্ছন্ন বাহ্যিক সচেতনার পর্দা যার কাছে আপনা হতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—তাঁর অন্তরে ঋষি-মনের সেই অনির্বাণ প্রচণ্ড আকুতি জীবনের নিরুদ্দেশ নিরর্থক আবর্তকে যা সত্যকার কেন্দ্র-নিষ্ঠ করে সার্থক করে তুলতে চায়। জীবন-জিজ্ঞাসার দুর্গম, বন্ধুর, গোলকধাঁধার মতো জটিল পথ তিনি যেমন অতিক্রম করে গেছেন, তাঁর আত্মোপলব্ধির ইতিহাস নানা রচনায় তেমনি স্মারক-চিহ্ন হিসাবে পথের ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

লরেন্সের জীবন-জিজ্ঞাসা অবশ্য সহজ সর্বজন-বোধ্য নয়। যৌন-মিলন সম্বন্ধে তাঁর যে তন্ময়তা সাধারণ পাঠকের অগভীর দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে, তাঁর আত্মানুসন্ধানের অভিযানকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার পক্ষে তা যথেষ্ট অন্তরায়। এক হিসেবে লরেন্সের সমস্ত রচনার মূলেই যৌন-মিলনের প্রসঙ্গ প্রধান হয়ে আছে এ কথা সত্য। কিন্তু যৌন-মিলন

বলতে তিনি যা বোঝেন, দেহ-সম্ভোগের সংকীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়িয়ে জীবনের রহস্য-গভীর আর এক অতলতায় না পৌছলে তার সত্যকার অর্থ মেলে না।

আমাদের এই পরমাশ্চর্য চেতনার দীপ দেহাধারেই প্রজ্বলিত। তাই দেহাতীত অবাস্তব আবছা কোনো আদর্শ-বাদের আলেয়ায় দিকভ্রান্ত না হবার পণ করে জীবনের আর এক ধ্রুব ভিত্তি তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন ; এই দেহাশ্রয়ী কামনারই দুরবগাহ রহস্য-কেন্দ্রে মানুষের সূর্য-সত্তা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

ইউরোপের এই নব্য তান্ত্রিক হয়তো ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। তিনি সত্যদ্রষ্টা কি না সে বিচারের ভার আমাদের ওপর নেই। আত্মোপলব্ধির পথে তাঁর দীপ্যমান মনের যে আলো সাহিত্যের জগতে এসে পড়েছে, আমাদের কাছে তাই সব চেয়ে মূল্যবান।

লরেন্সের ছোট বড় সমস্ত গল্প থেকে বাছাই করা যে কটি রচনা এই বই-এ অনুবাদ করা হয়েছে, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সব চেয়ে ভালো পরিচয় সেগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীমন জীবন-জিজ্ঞাসার আবেগ-প্রবাহে অনেক জায়গাতেই ভেসে গেছে, প্রচারকের উদ্দীপনা শিল্প-সীমার সম্মান রাখার বিশেষ প্রয়োজনই সেখানে অনুভব করেনি। কিন্তু ছোট গল্পের অপরিসর সীমার মধ্যে তাঁর শিল্পী মন অনেক বেশি সজাগ। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের মতো তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নামে এ সমস্ত গল্পের নায়ক নন। এখানে যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তারা কেউই সাধারণ কাহিনীর জগতের মামুলী চরিত্র অবশ্য নয়, তবু অচেনা অবাস্তবও তাদের মনে হয় না। বরং তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার নকল মুখোশ পরে আমাদের চারিধারে যারা ঘুরে বেড়ায়, ছদ্মবেশ ছাড়িয়ে তাদেরই সত্যকার রূপ যেন লরেন্স প্রকাশ করে দিয়েছেন। লরেন্সের কাহিনীর ধারা-নিয়ন্ত্রণের নিয়তিও

একেবারে আলাদা। মামুলী গল্পের হাসিকান্নার দোলায় দোলানো চিরাচরিত বিন্যাস সে জানে না। সাধারণ বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতার আলো-ছায়ার নক্সা কাটা কাহিনী-বিন্যাসে মুখে একটু হাসি ফোটাবার, কি চোখ একটু অশ্রুসজল করবার দায় নিয়ে লরেন্স গল্প লিখতে বসেননি। কোষ-মুক্ত তরবারের মতো উজ্জ্বল, নিরাবরণ তাঁর সমস্ত চরিত্র দুর্জ্ঞেয় এক শিল্প-নিয়তির নির্দেশে আমাদের অগোচর মনের অনাবিষ্কৃত সমস্ত কোণে অদ্ভুত অনুভূতির বিদ্যুৎ স্পর্শ রেখে যায়।

অনুবাদে, যে-কোনো লেখকেরই মূলের সম্পূর্ণ মর্যাদা রাখা একরকম অসম্ভব। লরেন্সের মতো লেখকের বেলা একথা যে কতখানি সত্য তা বিস্তারিত করে বলা নিষ্প্রয়োজন। বাংলা অনুবাদে লরেন্সের পরিচয় পেয়ে মূল ইংরাজীতে তাঁর রচনা পড়বার উৎসাহ যদি কারুর জাগে তাহলেই আমাদের চেষ্টা সার্থক।

দ্বীপ যে ভালোবাসতো

সে দ্বীপ ভালোবাসতো। এক দ্বীপেই তার জন্ম, তবে সেখানে সে ছাড়া আরও বহুলোকের বাস। তাই সেটা ঠিক তার মনোমত নয়। একেবারে নিজের একটি দ্বীপ সে চায়, সেখানে একলা থাকবে বলে নয়, সেটা নিজের মনের মতো করে গড়ে নেবে বলে।

দ্বীপ যদি বড় হয়, তাহলে তা মহাদেশেরই সামিল। বেশ একটু ছোট না হলে কোনো দ্বীপকে ঠিক দ্বীপের মতো লাগে না। কত ছোট হলে, একটা দ্বীপকে শুধু নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে ছেয়ে রাখা যায়, এ কাহিনীতে তাই দেখানো হয়েছে।

ঘটনাচক্রে পঁয়ত্রিশ বছর যখন তার বয়েস, তখন এই দ্বীপ-প্রেমিক সত্য-সত্যই নিজের একটি দ্বীপ পেয়ে গেল। নিষ্কর সম্পত্তি হিসেবে দ্বীপটি সে পায়নি, এ দ্বীপের ওপর তার নিরানব্বই বছরের ইজারা ছিল। একটা মানুষ, আর তার দ্বীপের পক্ষে এ ব্যবস্থা একরকম চিরন্তনই বলা যেতে পারে। কারণ এব্রাহামের মতো কেউ যদি সমুদ্র-সৈকতের বালির কণার মতো অগণন সন্তান-সন্ততি চায়, তাহলে সে অন্তত ছোট একটা দ্বীপ বেছে নিয়ে বসতি সুরু করে না। তা করলে দেখতে-দেখতে বাসিন্দার ভিড়ে দ্বীপ ছেয়ে গিয়ে বস্তির দুর্দশা দেখা দেবে। একান্তে থাকবার জন্যে, যে-লোক দ্বীপ ভালোবাসে তার পক্ষে এ চিন্তাই অসহ্য। না, দ্বীপ হবে ঠিক পাখির বাসার মতো, তাতে যেন একটি—কেবল একটিমাত্র ডিমই ধরে। সে ডিম হল দ্বীপে যে থাকবে, সে নিজে।

আমাদের দ্বীপের বাসিন্দা, যে দ্বীপটি পেয়েছিল, কোনো দূর সমুদ্রে তা অবস্থিত নয়। দ্বীপটি ইংলণ্ডের নেহাৎ কাছে। তার তীরে তাল-

নারকেলের পত্রপুঞ্জের দোলা, বা তার অগভীর সাগরতটের প্রবাল-প্রাচীরে ফেনিল ঢেউয়ের আঘাত, এসব কিছুই নেই। ছোট বন্দরটার কাছে শুধু একটা মজবুত গোছের থাকবার বাড়ি। আর দূরে কয়েকটা ছাউনি সমেত একটা ছোট গোলাবাড়ি। সেই গোলাবাড়ির ওধারে খোলা মাঠ। জাহাজ-ঘাটের কাছে এক সারিতে সমুদ্রের পাহারা-দারদের কুটিরের মতো তিনটি পরিচ্ছন্ন চুনকাম করা ঘর।

এর চেয়ে নিজের বাড়ির মতো আরামের ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? কাঁটা ঝোপ আর সমুদ্রের ধারের খাড়া পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে প্রিমরোজ-ফুল-ফোটা ছোট ছোট উপত্যকা পার হয়ে সমস্ত দ্বীপটা ঘুরে এলে, চার মাইলের বেশি হয় না। দ্বীপের একপ্রান্ত থেকে, ছোট ছোট পাহাড়ের টিবি দুটোর ওপর দিয়ে সোজা আর এক প্রান্তে যেতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগেনা। মাঝে পড়ে গরু চরবার কঙ্করময় মাঠ, আর নাতিউর্বর ওট্‌সের ক্ষেত। দ্বীপের প্রান্তে পাহাড়গুলোর ধারে এলে, দূরে আর একটি বড় দ্বীপ দেখা যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে পূব দিকে আরও একটি দ্বীপ চোখে পড়ে। সে দ্বীপটি কিন্তু নেহাতই ছোট্ট, যেন এই দ্বীপটার ছানা।—এই ছোট্ট দ্বীপটিও তার।

দেখা যাচ্ছে, যে দ্বীপেরাও যেন পরস্পরের কাছাকাছি থাকতে চায়। আমাদের দ্বীপের বাসিন্দা, তার দ্বীপটিকে অত্যন্ত ভালোবাসে। প্রথম বসন্তে সেই দ্বীপের ধূসর সবুজ-স্তব্ধ পার্বত্য-ভূমি, ব্ল্যাকথর্ন-ফুলের শুভ্র বন্যায় ঢেকে যায়। ব্ল্যাকবার্ড-পাখিগুলোর প্রথম সুদীর্ঘ ডাক সুরু হয়। ব্ল্যাকথর্ন আর প্রিমরোজ-ফুলের পর ঝোপগুলোর মধ্যে, আর বড় বড় গাছের সারির তলায় দেখা দেয় পরীদের হ্রদের মতো, নীল হায়াসিন্‌থ্-ফুলের সমারোহ। আর সে দ্বীপে কত রকম পাখি যে বাসা বাঁধে! ইচ্ছে করলে সে সব বাসায় উঁকি মেরেও দেখা যায়। সত্যিই অপরূপ সে এক রাজ্য।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম। কাউস্লিপ্-ফুলের আর দেখা নেই, শুধু বাতাসে বুনো গোলাপের মৃদু গন্ধ। সমুদ্রের যেখানটিতে সে স্নান করে, সেখানে গ্র্যানাইট পাথরের ওপর রোদ এসে পড়ে, আর ছায়া থাকে ওপরের পাহাড়ে। রাতের কুয়াশা চুপি চুপি ভেসে আসার আগে, বাড়ি ফেরার পথে পড়ে ওট্‌সের ক্ষেত। সেখানে ফসল প্রায় পেকে এসেছে। দূরের বড় দ্বীপটি থেকে কুয়াশার মধ্যে জাহাজদের সতর্ক করবার বাঁশি শোনা যায়। উর্ধ-আকাশে সমুদ্র যেন প্রতিফলিত। সন্ধ্যার আলোর দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে।

তার পর সমুদ্রের কুয়াশাও কেটে গেল। এল শরৎ। ওট্‌সের ডগাগুলো ফসলের ভারে নুয়ে পড়ে। সমুদ্র থেকে আর একটা দ্বীপের মত বিশাল সোনালী চাঁদ উঠে সমস্ত জলরাশি শাদা করে দেয়।

বৃষ্টি ধারায় শরৎ শেষ হল, তার পর এল শীত। অন্ধকার আকাশ, আর্দ্র বাতাস, আর বৃষ্টি। তুষার তবু নেই বললেই হয়। মনে হয় দ্বীপটা যেন সভয়ে দূরে সরে থাকতে চাইছে। যত ভিজে ছায়াচ্ছন্ন খানায়, খাদে, গহ্বরে, না-সুপ্ত, না-জাগ্রত, দ্বীপের সেই অসন্তুষ্ট আত্মা যেন সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, বুঝতে পারা যায়। তারপর রাতে ঝড়ের ঝাপটা আর দম্‌কা হাওয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন মনে হয় দ্বীপটাই যেন একটা আলাদা জগৎ, অন্ধকারের মতো আদিম ও অনন্ত। শুধু একটা দ্বীপ যেন আর তা নয়, সীমা-হীন একটা অন্ধকার রাজ্য, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত অতীত রাত্রির আত্মারা বাস করে, অনন্ত দূর যেখানে একান্ত নিকট।

ভৌগোলিক এই ছোট দ্বীপটি থেকে মহাকালের অসীম অনন্ত রাজ্যে তখন যেন পাড়ি দিয়েছি মনে হয়। পার্থিব এই দ্বীপটি নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। সেই শূন্য দ্বীপ ছেড়ে, সময়ের বিশাল অন্ধকার রহস্য-লোকে তখন যেন চলে এসেছি—যা বিগত তা সেখানে এখনো জেগে

আছে, আর যা অনাগত তাও সেখান থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়।
দ্বীপে বাস করার বিপদ এই। শহরে পরিপাটি পোশাক পরে, প্রতি মুহূর্তে গাড়ি চাপা পড়বার মৃত্যু-ভয় নিয়ে, যারা রাস্তা পার হয়, অনন্ত কালের সম্মুখীন হওয়ার এই বিভীষিকা থেকে তারা অন্তত নিরাপদ। কিন্তু একবার কোনো নির্জন দ্বীপে নিজেকে নির্বাসিত করা মাত্র, সেই মুহূর্তটি যেন উদ্বেলিত হয়ে বৃত্তাকারে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে যায়; মাটির কঠিন পৃথিবী কোথায় যায় হারিয়ে, আর আমাদের নগ্ন আত্মা সেই সময়হীন লোকে চলে আসে, যেখানে মৃত বলে যাদের জানি, তাদেরই রথ বিলুপ্ত শতাব্দীর প্রাচীন রাজপথে ধাবিত. আর বিগত বলে যা মনে করি সেই চিরন্তন মুহূর্তের পায়ে চলা পথে অগণন আত্মার ভিড়।
এই গল্পের দ্বীপের বাসিন্দারও এইরকম একটা কিছু হয়েছে। এমন সব অদ্ভুত ভাব তার মাঝে মাঝে আসে, এর আগে যা তার জানাই ছিল না। অতীত যুগের কত আশ্চর্য মানুষের অস্তিত্ব সে যেন টের পায়। বিশাল গুম্ফ-শোভিত প্রাচীন গল্‌-এর লোকেরা একদিন এই দ্বীপে বাস করেছে। এই দ্বীপের ওপরে আজ তাদের চিহ্ন না থাকলেও রাত্রির জগত থেকে তারা হারিয়ে যায় নি। মিস্‌লটো-পাতা আর সোনার ছুরিকা হাতে প্রাচীনকালের পুরোহিতদের সে দেখতে পায়, তার পর ক্রশ হাতে আর এক নতুন ধর্মের পুরোহিতদের সে দেখে। জলদস্যুরাও আসে এদের পিছনে; সমুদ্রে নরহত্যার আর্তনাদ শোনা যায়।
দ্বীপের বাসিন্দা কেমন অস্বস্তি বোধ করে। দিনের বেলায় এই সমস্ত আজগুবি ব্যাপারে কোনো বিশ্বাস তার থাকে না, কিন্তু রাত্রে সব বদলে যায়। জলের ঢেউয়ে পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিলে যেমন সাগরে ভেসে যেতে হয়, তেমনি রাত্রে তাকে অনন্ত কালের আর এক জগতে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
দিনের বেলাতেই ব্ল্যাক-থর্নের ঝোপগুলো দেখলে কেমন একটা

গা ছম্ ছম্ করা অদ্ভুত ভাব হয়, আর রাত্রে সে জায়গা, প্রস্তর-বেদীর চারিধারে সমবেত কোন এক লুপ্ত অদৃশ্য জাতির বৃদ্ধদের চীৎকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। হর্নব্লিন্ গাছের তলায় দিনের বেলায় যেটা ধ্বংস-স্তূপ, অবর্ণবিয় রাত্রে ক্রশধারী রক্তাক্ত পুরোহিতদের গোঙানিতে তা ভরে যায়। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের ভেতরে লুকোনো একটা গুহা রাত্রে জলদস্যুদের হিংস্র ইতর কণ্ঠের কোলাহলে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

মনের এই ধরণের অনুভূতি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে, সে বাস্তব দ্বীপটির ওপরই বেশি করে মনোযোগ দিতে সুরু করলে।

হেস্‌পেরিডিজের এক দ্বীপের মতো, এই দ্বীপটিও কেনই বা সে আদর্শ সুখের স্বর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেনা ?

দ্বীপটির উন্নতির জন্যে প্রথমত সে যথাসাধ্য অর্থব্যয় করাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ধরে নিলে। সামন্ত যুগের ধরনে তৈরি যে পুরোনো বাড়িটি সে পেয়েছিল, যথাসাধ্য তার সংস্কার করে, মূল্যবান আসবাব-পত্রে, সমস্ত বাড়ি সে ভরিয়ে দিলে। মেঝেতে দামী কার্পেট, জানালায় ফুলের পাপড়ির মতো কোমল পর্দা, আর মাটির তলার ভাঁড়ারে দামী মদ। ঘর সংসার দেখা শোনা করবার জন্যে বাইরে থেকে সে একজন মজবুত জাঁদরেল গোছের মহিলাকে আনিয়ে নিলে, আর তারই সঙ্গে বেশ অভিজ্ঞ, অতি মিষ্টভাষী একজন বাট্‌লার।

গোলাবাড়ি তদারক করবার জন্যে দুজন চাকরের সঙ্গে একজন লোককে সে রেখে দিলে। দুটি তার জার্‌সি-গাই আছে, মাঠে চরে বেড়াবার সময় তাদের গলার মন্থর ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায়। দুপুর বেলা খাবার ঘণ্টা বাজে, আর সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামের অবসর হয়, তখন চিম্‌নির ধোঁয়ায় যেন একটি নিশ্চিন্ত শান্তি আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

সেই তিনটি সারবন্দী শাদা ঘরের নিচে সমুদ্রের ছোট খাঁড়িতে মোটর-লাগানো একটি পাল-তোলা বোট থাকে। তাছাড়া একটি

জাহাজী নৌকো ও দুটি দাঁড় টানা নৌকো বালির ওপর তুলে রাখা হয়েছে। সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে পোঁতা খুঁটিতে একটি মাছ ধরবার জাল শুকোচ্ছে, শাদা কয়েকটা নতুন তক্তা আড়াআড়ি ভাবে দাঁড় করানো। বালতি হাতে একজন স্ত্রীলোক কুয়োর দিকে যাচ্ছে।

শাদা ঘর তিনটির শেষেরটিতে পাল তোলা বোটের সারেঙ্গ তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থাকে। ওধারের বড় দ্বীপটিতে তার বাড়ি, এখানকার সমুদ্রের সঙ্গে সে পরিচিত। আকাশ পরিষ্কার থাকলেই সে তার ছেলেকে নিয়ে মাছ ধরতে যায়, দ্বীপে সেদিন টাটকা মাছের অভাব হয় না।

মাঝখানের কুটিরটিতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এক বৃদ্ধ দম্পতি থাকে। বুড়ো ছুতোরের কাজ এবং তাছাড়া আরও অনেক কিছু করে। তার র‍্যাদা কিম্বা করাত সব সময়েই চলছে, সারাক্ষণই সে কাজে ব্যস্ত।

তৃতীয় ঘরটিতে একজন রাজমিস্ত্রী, তার দুটি মেয়ে ও একটি ছেলেকে নিয়ে থাকে। সে বিপত্নীক। ছেলেটির সাহায্যে খানা কাটা, দেয়াল তোলা, নতুন ঘর দোর দরকারমতো তৈরি করা, পাহাড় থেকে পাথর কাটা প্রভৃতি সব কাজই সে করে। তার একটি মেয়ে মনিবের বাড়িতে কাজ করে।

ছোট্ট একটি শান্তিময় ব্যস্ত জগৎ। দ্বীপের মালিকের অতিথি হিসেবে কখনো সেখানে গেলে, প্রথমেই মোটর-বোটের সারেঙ্গ আর্নল্ড আর তার ছেলে চার্লসের সঙ্গে দেখা হবে। আর্নল্ডের একমুখ কালো দাড়ি, রোগা সদা-হাস্যময় চেহারা। মালিকের বাড়িতে তারপর বাট্‌লারের দেখা পাওয়া যাবে। পৃথিবীর কোনো জায়গা ঘুরতে তার বাকি নেই। মুখের মিষ্টি কথায় আর ব্যবহারে এমন একটি নিশ্চিন্ত বিলাসের আবহাওয়া সে অতিথির চারধারে সৃষ্টি করে তুলতে পারে, যা শুধু ঈষৎ অবিশ্বাসী আদর্শ ভৃত্যেরই সাধ্য। বাড়ির কর্তৃত্ব যার হাতে, সেই মহিলাটির কাছে সত্যিকারের ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সসম্ভ্রম হাস্যমধুর

ব্যবহার পাওয়া যাবে। পরিচারিকা মেয়েটি একবার হয়তো অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে বাইরের বিস্ময়কর জগতের এই আগন্তুককে চেয়ে দেখবে। গোলাবাড়ি যে চালায়, তার বাড়ি কর্নওয়ালে। মুখে তার হাসি কিন্তু চোখে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি। গোলাবাড়ির চাকরটির সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। বার্কশায়ার থেকে সে এসেছে। একটু লাজুক প্রকৃতির। স্ত্রীটি পরিচ্ছন্ন, দুটি ছেলে মেয়ে আছে। আর একটি চাকরের বাড়ি সুফোকে, একটু বদমেজাজী। রাজমিস্ত্রী কেন্টের লোক, সুবিধে পেলে অনর্গল কথা বলে যায়। শুধু বুড়ো ছুতোর একান্ত স্বল্পভাষী, সব সময়ই কাজে ব্যস্ত।

সত্যই একটি স্বসম্পূর্ণ ছোট্ট জগৎ। সবাই বেশ একটু নিশ্চিন্ত, সকলেরই ব্যবহারে বিশেষ সম্ভ্রমের পরিচয়। কিন্তু দ্বীপের মালিকের জন্য সবারই আছে বিশেষ একটু হাসি, তার প্রতি বিশেষ একটু মনোযোগ। কি সুখে যে তারা আছে, তা সবাই জানে। তাই দ্বীপের বাসিন্দা আর শুধু মিঃ অমুক নয়, সকলের কাছেই সে মনিব, হুজুর।

সব দিক দিয়ে একেবারে আদর্শই বলা যেতে পারে। দ্বীপের মালিক অত্যাচারী মোটেই নয়। মন তার কোমল, অনুভূতি সূক্ষ্ম, চেহারা সুশ্রী। সব কিছু সে নিখুঁত ভাবে গড়ে তুলতে চায়, সকলকে খুশি করা তার কামনা। অবশ্য এই সুখ ও পরিপূর্ণতার উৎস হবে সে নিজে।

কিন্তু তার নিজের দিক থেকে সে একজন কবি। অতিথিদের সে রাজ-সমাদরে রাখে। কর্মচারীদের প্রতি ব্যবহার তার উদার। তবু সে নির্বোধ নয়, বুদ্ধি তার বরং তীক্ষ্ণই বলা যায়। কারুর ওপর মাতব্বরি সে করে না, কিন্তু সব কিছুর ওপর তার দৃষ্টি আছে। সব কিছু সম্বন্ধেই সে বেশ কিছু জানে। জারসি-গাইএর পরিচর্যা থেকে, পনির তৈরি করা, খানা কাটা, বেড়া তৈরি করা থেকে ফুলের বাগান করা, পাল জাহাজ চালানো থেকে জাহাজের অন্ধি-সন্ধি পর্যন্ত, সব তার নখদর্পণে। তার

অধীনস্থ লোকদের সব বিষয়েই, তাই সে আধা-পরিহাস আধা-উপদেশের ভঙ্গীতে পরিচালিত করে—সত্যই যেন সে স্বপ্নে সত্যে মেশান দেবতাদের জগতের লোক।

শাদা পোশাক তার পছন্দ—মাখনের মতো শাদা, আর তার সঙ্গে চওড়া টুপি আর ক্লোক। আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে, সেদিন গোলাবাড়ি থেকে দেখা যায় শাদা সার্জের পোশাকে, বাঁজা জমিটার ওপর দিয়ে তার দীর্ঘ মূর্তি শালগম-ক্ষেতের দিকে নেমে আসছে। চাষিরা তখন শালগম ক্ষেতের আগাছা নিড়োচ্ছে। তাকে দেখে তারা টুপি খুলে অভিবাদন করে। চাষি-সর্দারের সঙ্গে কয়েক মিনিট চাষবাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়। চাষি-সর্দারের কথা শুনে বোঝা যায় মনিবের ওপর শ্রদ্ধা তার কতখানি। চাষিরাও কোদালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে মনিবের কথা শোনে। চাষি-সর্দারের মনিবের ওপর বেশ একটু স্নেহ আছে বলেই মনে হয়।

আবার কোনো এক মেঘলা সকাল বেলা তাকে দেখা যায়, ছোট একটা জলা থেকে বদ্ধজল বার করে দেবার জন্যে যে নালা কাটা হচ্ছে, তারই ধারে দাঁড়িয়ে খামার মজুরের সঙ্গে কথা বলছে। সমুদ্রের চট্‌চটে দম্‌কা হাওয়ায় তার ক্লোকটা পালের মতো পেছনে ফুলে ফুলে উঠছে। কখনো কখনো বাদলা সন্ধ্যায় তাকে দ্রুত পদে বড়বাড়ির চত্বর পার হতে দেখা যায়—মাথার চওড়া টুপিটা বৃষ্টিধারা আটকাবার জন্যে ঈষৎ হেলানো। বার্কশায়ারের স্ত্রী তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডেকে মনিবের জন্যে বসবার জায়গা পরিষ্কার করতে বলে। তারপর দরজাটা খুলে যায়—তারি সঙ্গে সকলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়: "কি আশ্চর্য, হুজুর নিজে এই বর্ষার ভেতরে আমাদের খোঁজ নিতে এসেছেন!" তারপর চাষী-সর্দার মনিবের ক্লোকটা খুলে নেয়, চাষির স্ত্রী নেয় টুপিটা, দুই চাষী তাদের চেয়ারগুলো পেছনে টেনে বসে, আর মালিক সোফায় বসে একটি ছোট ছেলেকে

কাছে টেনে নেয়। ছেলেদের বশ করবার ক্ষমতা তার অদ্ভুত। মেয়েরা তো বলে যে স্বয়ং যীশুর কথাই তাকে দেখলে মনে পড়ে যায়।

সবাই হাসিমুখেই তাকে অভ্যর্থনা করে। সে যেন আরও উপরের জগতের কোনো জীব, মানুষের চেয়ে একটু বুঝি দুর্বল—তাদের সম্ভ্রমের বিশেষ ধরন দেখে সেই কথাই মনে হয়। তার ওপর সকলেরই কেমন যেন একটু মায়া আছে, একটা সাদর সস্নেহ ভাব। কিন্তু অসাক্ষাতে তার কথা বলবার সময় ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি বুঝি তাদের মুখে ফুটে ওঠে। 'হুজুর'কে ভয় করবার কিছু নেই। তাকে শুধু নিজের মতো চলতে দিলেই হল। শুধু বুড়ো ছুতোর মাঝে মাঝে মনিবের ওপর সত্য সত্যই রূঢ় হয়ে ওঠে। ছুতোরের প্রতি মনিবেরও তাই বিশেষ অনুরাগ নেই।

তাদের কেউ সত্য-সত্যই তাকে ভালোবাসে কিনা সন্দেহ; পুরুষের প্রতি পুরুষের অনুরাগের দিক দিয়ে তো নয়ই, পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের ভালোবাসার দিক দিয়েও নয়। অবশ্য সে নিজেও তাদের কাউকে সেরকম ভাবে ভালোবাসে কিনা বলা যায় না। সে শুধু তার ছোট্ট জগৎ আদর্শ হয়ে উঠুক, এইটুকুই চায়—শুধু সকলকে সুখী করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু আদর্শ জগৎ যে চায়, সত্যকার অনুরাগ বা বিরাগ তার সাজেনা। একটা সার্বজনীন প্রীতির বেশি আর কিছু তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুঃখের কথা এই যে, সার্বজনীন প্রীতিটা যাদের ওপর বর্ষিত হয়, সাধারণত তারাঃ সেটাকে সম্মান বলেই মনে করে না! তাই শেষ পর্যন্ত তা থেকে একটা নতুন ধরনের বিদ্বেষেরই সূত্রপাত হয়। সার্বজনীন প্রীতি বোধহয় আসলে এক ধরনের অহমিকা, তা না হলে, এমন পরিণাম তার কেন?

দ্বীপের মালিকের নিজস্ব আলাদা কাজও অবশ্য আছে। লাইব্রেরিতে সুদীর্ঘ ঘণ্টার পর ঘণ্টার সে কাটায়। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের বইয়ে

যত ফুলের উল্লেখ আছে, তার তালিকা সমন্বিত একটা পরিচয়-গ্রন্থ সে রচনা করছে। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সে অবশ্য বড় পণ্ডিত নয়। সাধারণ স্কুলে যতদূর শেখানো হয়, ততদূরই তার বিদ্যা। তবে আজকাল এত ভালো সব অনুবাদের বই পাওয়া যায় যে অসুবিধা বিশেষ কিছু নেই। আর সেই প্রাচীন জগতে যে সব ফুল ফুটেছিল, তাদের খুঁজে-খুঁজে বার করার নেশা বড় মধুর।

এমনি করে সেই দ্বীপের প্রথম বৎসর কেটে গেল। অনেক কিছুই ইতি-মধ্যে করা হয়েছে। পাওনাদারদের বিল যখন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ল, ভালো করে সেগুলির হিসেব কষে দেখে মালিকের তো চক্ষু স্থির। তেমন কিছু বড়লোক সে নয়। দ্বীপটিকে চালু করবার জন্যে নিজের তহবিল সে যে নিজেই ফুটো করেছে, তা সে জানে। কিন্তু ফুটোগুলি ছাড়া সেখানে যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, এতটা সে ভাবেনি। হাজার হাজার পাউণ্ড এই দ্বীপের গর্ভে কোন শূন্যে তলিয়ে গেছে।

কিন্তু আর বেশি তাকে নিশ্চয় খরচ করতে হবে না। লাভ না হোক নিজের খরচা উঠিয়ে দেবার মতো উন্নতি দ্বীপটির নিশ্চয়ই হয়েছে। ভয় তার সুতরাং আর নেই বোধহয়। বেশির ভাগ দেনাই শোধ করে দিয়ে সে বুকে একটু বল পেল। তবু বিপদ যখন একবার এসেছে, তখন সাবধান হওয়াই ভালো। পরের বছর থেকে আরও হিসেব করে কম খরচে চালাতে হবে। সকলকে মর্মস্পর্শী ভাষায় সে-কথা সে জানালে। তারাও জবাব দিলে, "বাঃ, তা তো বটেই!"

তাই ঝড়ের দাপটে বৃষ্টি-ধারা যখন দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ছে, এমন দিনে তাকে আমরা দেখি লাইব্রেরি-ঘরে এক পাত্র বিয়ার আর তামাকের পাইপ নিয়ে, চাষি-সর্দারের সঙ্গে চাষ বাসের নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে মুখ তুলে চায়ঃ তার নীল চোখ দুটি কেমন স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে, "দেখেছ কি রকম ঝড়!"

ঝড় নয়, মনে হয় যেন কামানের গর্জন। নিজের অনধিগম্য ফেণোর্মিমুখর দ্বীপটির কথা ভেবে সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। না, এ দ্বীপ যেমন করে হোক তাকে রাখতেই হবে। আবার সে গভীর উৎসাহের সঙ্গে তার সমস্ত প্রতিভা চাষের উন্নতির সমস্যায় নিযুক্ত করে। চাষি-সর্দার তার কথায় সায় দিয়ে চলে, "যে আজ্ঞে, যা বলেছেন হুজুর।"

মনিবের কথায় তার কান নেই বললেই হয়। মনিবের সাজ-পোশাক, তার হাতের আংটি, শার্টের বোতামের জ্বল্‌-জ্বলে লাল পাথরটা, এই সবই সে লক্ষ্য করে। হঠাৎ মনিবের উৎসাহোজ্জ্বল চোখে চোখ পড়ে গেলেই শুধু সে সসম্ভ্রমে মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয়।

এই ভাবে কোথায় কিসের চাষ করা হবে, কি কি সার কোথায় লাগবে, কি জাতের শূয়োর, কি জাতেরই বা টার্কি আমদানি করা হবে এই সব প্রশ্নেরই তারা মীমাংসা করে। মীমাংসা অবশ্য মালিক নিজেই করে, চাষি-সর্দার সায় দিয়ে যায় মাত্র।

নিজের বিষয়ের ওপর মালিকের সত্যই দখল আছে। বই পড়ে যা শিখেছে তা প্রয়োগ করবার কায়দা সে জানে। মোটামুটি তার ধারণা-গুলো ঠিকই বলতে হবে। চাষি-সর্দার ও সে কথা বোঝে। কিন্তু সে মাটির জগতের লোক। মালিক যা বলে তা সে শুনে যায় মাত্র, কিন্তু নিজের সত্যকার কোনো উৎসাহ সে-বিষয়ে তার নেই। খাঁচায় বদ্ধ কোনো অদ্ভুত প্রাণীকে যে ভাবে লোকে দেখে ঠিক সেই ভাবেই নিতান্ত নির্লিপ্ত, নির্বিকার ভাবে মনিবকে সে লক্ষ্য করে যায়।

আলোচনা শেষ হলে মালিক তার বাট্‌লার এলভেরিকে ডাক দিয়ে একটা স্যাণ্ডুইচ আনতে বলে। বাট্‌লার বোঝে যে মালিক খোশ-মেজাজে আছেন। সে এ্যানচোভির সঙ্গে হ্যাম্‌-স্যাণ্ডুইচ, আর এক বোতল ভার-মুথ নিয়ে আসে। ভারমুথের বোতলটা সবে খোলা হয়েছে। কিছু না কিছু এখানে সব সময়ই সবে খোলা হচ্ছে।

রাজমিস্ত্রীর বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। মনিবের সঙ্গে তার কোনো একটা জমির জল-নিকাশ নিয়ে হয়তো আলোচনা হয়, তারপর আরও পাইপের অর্ডার দেওয়া হয়, আরও বিশেষ ধরনের ইটের ফরমাস পড়ে, এটা সেটা অনেক কিছুই আরও দরকার হয়।

মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আবার উজ্জ্বল আলোর দিন ফিরে এল। দ্বীপের কাজে একটু বিশ্রামের অবসর মিলেছে। মালিক তার পাল তোলা বোটে একটু টহল দিতে বেরুল। ইংলণ্ডের তীর ধরে যেতে যেতে, বন্দরে বন্দরে সে বোট ভেড়ায়। কোনো না কোনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে প্রত্যেক বন্দরেই দেখা হয়। বোটে বাট্‌লার পরিপাটি রকমের ভোজের আয়োজন করে, মালিকেরও নানা বাড়িতে, হোটেলে পাল্টা নেমন্তন্ন হয়, তারপর রাজ-সমারোহে বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে বিদায় দেয়।

খরচ হয় যে প্রচুর, তা বলাই বাহুল্য। ব্যাঙ্কে টাকার জন্যে তাকে টেলিগ্রাম করতে হয়। মিতব্যয়ী হবার সংকল্প নিয়ে সে আবার দ্বীপে ফেরে।

জল নিকাশের জন্যে যে জলা জায়গাটিতে নালা কাটা হচ্ছিল, সেখানে এখন গাঁদা ফুলের সমারোহ। নালা কাটার জন্যে তার যেন একটু আফশোশই হল। এই হলুদ বরণ রূপের আগুন আর সেখানে ঝল্‌সে উঠবে না।

ফসল কাটার দিন এল। মাঠ-ভরা ফসল। ফসল ঘরে তোলবার উৎসব উপলক্ষ্যে একটা ভোজ দেওয়া দরকার। গোলা বাড়িটা এখন সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করা হয়েছে, কিছু কিছু বাড়ানোও হয়েছে। ছুতোরের তৈরি লম্বা লম্বা টেবিল সেখানে পাতা, উঁচু ছাদের কড়ি থেকে লণ্ঠন ঝোলানো। দ্বীপের যে যেখানে ছিল সবাই সেখানে নিমন্ত্রিত। চাষি-সর্দার তাদের সভাপতি। চারদিকেই আনন্দ আর স্ফূর্তি।

ভোজের শেষে মখমলের একটা জ্যাকেট পরে মালিক অতিথিদের মধ্যে এলেন। চাষি-সর্দার দাঁড়িয়ে উঠে মালিকের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে মদের গ্লাশ তুলে ধরলে। সোৎসাহে সকলে তাতে যোগ দিয়ে মালিকের শুভ কামনায় মদ্য পান করলে। মালিক সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতায় জানালেন: তারা নিজেদের ছোট্ট একটি জগৎ এই দ্বীপের মধ্যে পেয়েছে। এখানে সত্যকার সুখ ও শান্তি পাওয়া তাদের নিজের হাতে। যার যা কর্তব্য সেটুকু সে যেন করে। সে নিজে যথাসাধ্য করে বলেই তার বিশ্বাস, কারণ দ্বীপটি আর তার লোকেদের সে ভালোবাসে। এর পর বাট্‌লারের বক্তৃতা দেবার পালা। এমন যার মালিক, সে দ্বীপের লোক স্বর্গে বাস করার মতোই সুখী। চাষি-সর্দার এবং আর সবাই সাগ্রহে তাকে সমর্থন্‌ করলে। বোটের সারেঙ্গ তো আনন্দে আত্মহারা। তারপর বুড়ো ছুতোর বেহালা ধরলে, সেই সঙ্গে নাচ সুরু হল।

কিন্তু বাইরে যত উৎসবই হোক ভেতরের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। পরের দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল একটা গরু পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গেছে। মালিক নিজে দেখতে গেল। দামী গরুটা মারা গিয়ে ইতিমধ্যেই একটু ফুলে উঠেছে। এখন কয়েকজন লোক দিয়ে সেটাকে তুলিয়ে, ছাল ছাড়িয়ে, কবর দেওয়া দরকার। সত্যই ব্যাপারটা কি বিশ্রী।

ব্যাপারটা যেন এই দ্বীপেরই রূপক। প্রাণে একটু আশা আনন্দ জাগতে না জাগতে কোথা থেকে কোন অদৃশ্য হাতের নিষ্ঠুর আঘাত আসে। আনন্দ আর নয়, এমন কি শান্তিও আর মিলবে না। একজনের পা ভাঙ্গে, বাতজ্বরে আর একজন পঙ্গু হয়ে পড়ে। শূয়োরগুলোর কি এক অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছে। ঝড়ে পালতোলা বোটটা একটা পাহাড়ে ধাক্কা খায়। বাট্‌লারকে রাজমিস্ত্রী দুচক্ষে দেখতে পারে না, মালিকের বাড়িতে মেয়েকে কাজ করতে পাঠাতে সে আপত্তি জানায়।

দ্বীপের বাতাসেই যেন কার একটা গুরুভার প্রস্তর-কঠিন অভিশাপ প্রচ্ছন্ন। দ্বীপটাই কেমন যেন একটা আক্রোশে ভরা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায়, রুষ্ট অপদেবতার মতো দ্বীপটা যেন শুধু অমঙ্গল চেষ্টাতেই ফেরে। তারপর হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় আবার সব বদলে যায়, সমস্ত দ্বীপটা স্বর্গের মতো সুন্দর হয়ে ওঠে। সকলেই কেমন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে, সকলেরই বুকে আবার সুখের আশা জাগে। কিন্তু দ্বীপের মালিক একটু নিশ্চিন্ত নির্ভয় হয়ে উঠতে না উঠতেই কোথা থেকে একটা নিষ্ঠুর আঘাত আসে। দ্বীপের কোনো একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমেত কারো বেনামী চিঠি সে পায়, কেউ বা হয়তো এসে তার কোনো চাকর-বাকরের নামে তার কাছে নালিশ করে।

রাজমিস্ত্রীর মেয়ে একদিন বাট্‌লারকে চীৎকার করে বলছে শোনা গেল, "যখন যা খুশি সরাচ্ছে—কেউ কেউ খুব মজায় আছে এখানে!" যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব করে মালিক সেখান থেকে চলে গেল।

দ্বীপে কেউ-ই সন্তুষ্ট নয়। আসলে এরকম দ্বীপে বাস করা তারা পছন্দ করে না। যাদের ছেলেপুলে আছে তারা বলে, "কাজটা আমরা ভালো করছি না, ছেলে মেয়েদের মুখ চাইলে এ দ্বীপে থাকা উচিত নয়।" ছেলেপুলে যাদের নেই, তারাও নিজেদের কথা ভেবেই সেই কথা বলে। নিজেদের ভবিষ্যত ভাবলে এ দ্বীপে তাদের থাকা চলে না। দ্বীপের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে মুখ দেখাদেখিই প্রায় বন্ধ হতে চলেছে।

তবু দ্বীপটা সত্যই এমন সুন্দর! যখন বাতাসে হনিসাক্‌ল্‌-এর গন্ধ ভাসে আর সমুদ্রের জলে চাঁদের আলো কাঁপে, তখন অসন্তোষ যাদের সব চেয়ে বেশি তাদের ও মনে দ্বীপের জন্যে কেমন এমটা মমতা জাগে। কেমন একটা প্রচণ্ড আকুলতা সবাই তখন অনুভব করে, হয়তো তা দ্বীপের সেই রহস্যময় অতীতে ফিরে যাবার আকুলতা—রক্তস্রোতের

ন্দই যখন ছিল আলাদা। এই দ্বীপ একদিন যে রক্তের স্বাদ পেয়েছে, যে কামনায় যে লালসায় উদ্বেলিত হয়েছে তারই বন্যা যেন মনকে তখন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্বপ্নে, সত্যে মেশানো সে এক অদ্ভূত অবর্ণনীয় আকাঙ্খা।

মালিকের নিজেরই আজকাল দ্বীপটাকে কেমন ভয় করে। এমন সব অদ্ভুত অস্থির ভাবাবেগ তার মনে জাগে, এমন সব প্রচণ্ড লালসা তাকে জর্জর করে তোলে, যা কোনো দিন তার জানা ছিল না। তাকে যে এখানে কেউ ভালোবাসে না সে কথা এখন সে ভালো করেই জানে। সে জানে যে গোপনে তারা তাকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ঈর্ষা করে। তারা তাকে ছোট করতেই চায়। তাদের সম্বন্ধে সে নিজেও ক্রমশ সাবধানী হয়ে উঠছে।

কিন্তু বেশিদিন এভাবে চলল না। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে কয়েকজন দ্বীপ ছেড়ে গেল। প্রথমেই গেল, বাড়ি দেখা শোনা করবার ভার যার উপর ছিল সেই মহিলাটি। আত্মম্ভরি মেয়েদের, মালিক কোনো দিন সহ্য করতে পারে না। তারপর রাজমিস্ত্রী সপরিবারে দ্বীপ ছেড়ে গেল। বাতজ্বরে যে ভুগেছিল, সেই চাষিও তাদের অনুসরণ করলে।

আবার এল পাওনাদারদের তাগাদা। ফসল ভালো হলেও দেখা গেল খরচের তুলনায় আয় নিতান্ত হাস্যকর। আবার হাজার-হাজার পাউণ্ড কোথায় যে তলিয়ে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

কয়েকদিন হিসেব-পত্তর নিয়ে মালিক লাইব্রেরিতে রাত জেগে কাটালে। তন্ন তন্ন করে সব দেখার পর বোঝা গেল সংসার পরিচালনার ভার যার উপর ছিল, সেই মহিলাটি তাকে বেশ ভালো রকমই ঠকিয়েছে। হয়তো সবাই তাকে ঠকাচ্ছে। চিন্তাটা এত অসহ্য যে সে মন থেকে সেটা জোর করে সরিয়ে রাখে।

এ ভাবে তো আর চলতে পারে না। শিগগিরই তাকে দেউলিয়া

হতে হবে। দুঃখের সঙ্গে বাট্‌লারকে তাকে জবাব দিতে হয়। বাট্‌লার হিসাবে তার এত গুণ, যে সে কত যে ঠকিয়েছে তার হিসেব করার সাহসও মালিকের হয় না। তার পর চাষি-সর্দারের জবাব হয়ে গেল, তার জন্যে মালিকের মনে কোনো আফশোশ অবশ্য নেই। ক্ষেত খামারে লোকসান খেয়ে তার মন তিক্ত হয়ে গেছে।

সে আড়ম্বরও নেই, লোকজনও কম, তাদের মাইনেও অল্প। এমনি ভাবে তৃতীয় বৎসর গেল। কিন্তু কোনো সুরাহাই হল না। সামান্য যা কিছু মূলধন তার ছিল, এই শেষ ফুটো দিয়ে সেটুকুও প্রায় সব গলে গেল। দ্বীপটা যেন একটা অদ্ভুত অক্টোপাস, অদৃশ্য অষ্টবাহু দিয়ে যা কিছু সম্বল, সব যেন সে শুষে নিচ্ছে। এখনো দ্বীপটিকে তবু সে ভালোবাসে। কিন্তু তার সঙ্গে একটু বিদ্বেষও যেন আছে।

চতুর্থ বৎসরের শেষের অর্ধেক তাকে ইংলণ্ডে গিয়ে দ্বীপটি বেচবার চেষ্টাতেই কাটাতে হল। দ্বীপটা বেচা যে এত শক্ত হবে তা সে ভাবতেই পারেনি। তার ধারণা ছিল, সবাই বুঝি এমন একটি দ্বীপ পেলে লুফে নেবে। কিন্তু দেখা গেল কানা কড়ি দিয়েও কেউ তা কিনতে রাজী নয়। তবে তাকে যেমন করেই হোক এ দ্বীপ কাউকে গছিয়ে না দিলেই নয়।

পঞ্চম বৎসরের মাঝামাঝি অনেক কষ্টে, বহু লোকসান স্বীকার করে একটা হোটেল কোম্পানিকে দ্বীপটা নিতে সে রাজি করালে। বিয়ের পরে নব দম্পতিরা দিনকতক বেড়াতে এসে মধুর ভাবে কাটাতে পারে দ্বীপটিকে সেই রকম একটি আস্তানা তারা করে তুলতে চায়। সেই সঙ্গে গল্‌ফ-খেলার ব্যবস্থাও থাকবে।

দ্বীপটা যেন নিজের সৌভাগ্য নিজেই বোঝে না। নবদম্পতির গল্‌ফ খেলার আস্তানা হওয়া, নইলে তার নিয়তি হবে কেন?

—দুই—

এ দ্বীপ তাকে ছাড়তে হল। কিন্তু তা বলে ইংলণ্ডে সে ফিরে যাবেনা, কিছুতেই নয়। পাশের আরও ছোট দ্বীপটিতে সে এবার উঠে গেল। এ দ্বীপটি এখনো তার অধিকারেই ছিল। যে বুড়ো ছুতোরকে কোনো দিন সে বিশেষ পছন্দ করতনা, তাকে এবং তার স্ত্রীকেই শেষ পর্যন্ত সে সঙ্গে নিয়ে গেল। গত বৎসর থেকে একটি বিধবা আর তার মেয়ে, তার ঘরসংসার দেখা শোনা করছে। তাদেরও সে সঙ্গে নিলে। বুড়ো ছুতোরকে সাহায্য করবার জন্যে একটি অনাথ ছেলেকেও সে নিয়ে গেল।

ছোট দ্বীপটি সত্যই নিতান্ত ছোট ; তবে সেটি সমুদ্রের ভেতর পাহাড়ের একটা চূড়া মাত্র, তাই যতটা দেখায় তার চেয়ে আসলে সেটি বেশ বড়। পাহাড় আর ঝোপের ভেতর দিয়ে একটি আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু পথ সমস্ত দ্বীপটি ঘুরে এসেছে। এই পথে সমস্ত দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগেনা।

তবু এটা দ্বীপ তো বটে। পাহাড় ঘেরা ঘাটের ঠিক ওপরে খাড়াই পাথুরে পথটার মাথায় একটি নিতান্ত সাধারণ ছয় কামরাওয়ালা বাড়ি, সেইখানে তার বইটই সমস্ত নিয়ে সে গিয়ে উঠল। এ ছাড়া দুটি ঘর সেখানে আছে। তার একটি, বুড়ো ছুতোর তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে অধিকার করলে, বিধবা ও তার মেয়েটির জন্যে আর একটি নির্দিষ্ট হল। সব কিছু গোছ-গাছ হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই শরৎ এসে পড়েছে, সাগর প্রান্তে কালপুরুষ দেখা দিতে সুরু করেছে। অন্ধকার রাত্রে আগেকার দ্বীপটির আলো এখান থেকে দেখা যায়। হোটেল কোম্পানি সেটিকে প্রমোদ-দ্বীপ হিসেবে বিজ্ঞাপিত করবার জন্যে কয়েকজন অতিথিকে সেখানে আপ্যায়ন করছে।

সমুদ্রের এই পাথুরে চূড়াটুকুর তবু সে একাই মালিক। এর গলি, ঘুঁজি, খানা, খন্দ সে খুঁজে বেড়ায়—কোথায় হাত কয়েক ঘাসের জমি, কোথায় খাড়া পাহাড়ের ওপর বিদায়োন্মুখ কয়েকটি হেয়ার-বেল-ফুল এখনো ফুটে আছে। বহু পুরানো একটা কূপ, সেখানে সে একবার উঁকি দেয়। পাথরের একটা খোঁয়াড়, এককালে কারা সেখানে শূয়োর রাখতো। সেটা সে খুঁজে বার করে। তার নিজের একটি ছাগল আছে।

হ্যাঁ, এটা দ্বীপই বটে। দিন নেই রাত্রি নেই; সেল্‌টিক সমুদ্র এই দ্বীপের পাহাড়কে প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলেছে। সমুদ্রের কতরকমই না শব্দ! কখনো বিপুল বিস্ফোরণ, কখনো অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস, কখনো বা মনে হয় কে যেন কোথায় শিষ দিচ্ছে। হঠাৎ তারপর কোনো সময় জলের তলায় বহুলোকের কোলাহল যেন শুনতে পাওয়া যায়, সেখানে যেন কিসের হাট বসেছে। আবার কোনো দিন বহুদূর থেকে সত্যিকার কোন ঘণ্টার আওয়াজ যেন আসে। তার পর তীব্র দীর্ঘ কম্পিত একটা ধ্বনি—কি যেন তাতে একটা আতঙ্কের আভাস। মনে হয় নিঃশ্বাস নেবার জন্যে কে যেন হাঁপিয়ে উঠছে।

দেহান্তরিত কোনো মানুষের অশরীরী ছায়া, বিলুপ্ত কোনো প্রাচীন জাতির উপস্থিতি, এ দ্বীপে অনুভব করতে হয় না। দুরন্ত বাতাসে আর ফেনিল সমুদ্রের ঢেউয়ে সে সব অনেক আগেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এখন শুধু আছে সমুদ্র, কোটি-কণ্ঠ-নিনাদিত তারই প্রেতরূপ—সমস্ত সুদীর্ঘ শীত দ্বীপটি সেই বিচিত্র বিপুল কোলাহলেই মুখর হয়ে থাকে। আর আছে ধূসর স্বচ্ছ বাতাসে, ধূসর প্রায় স্বচ্ছ পাথর গুলোর মাঝে কয়েকটা কাঁটা গাছ আর সমুদ্রের ঘ্রাণ। শীতল ধূসর দ্বীপটির ওপর সমুদ্র থেকে কোমল কুয়াশা ভেসে এসে সব ঢেকে দেয়। কুব্জপৃষ্ঠ পাহাড়ময় দ্বীপটাকে মনে হয় যেন অনন্ত শূন্যে প্রসারিত পৃথিবীর শেষ বিন্দু।

সমুদ্র সীমায় আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা সবুজ লুব্ধক দীপ্যমান। সমস্ত

দ্বীপটা যেন একটা গাঢ় ছায়া। দূর সমুদ্রে একটা জাহাজের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। পাথর-ঘেরা ছোট সাগরের ঘাটটিতে দাঁড় টানা নৌকা ও মোটর-বোটটি নিরাপদে নোঙ্গর ফেলা আছে। বুড়ো ছুতোরের রান্নাঘর থেকে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। এর বেশি আর কিছু নেই।

তার বাড়িতেও আলো জ্বলছে। বৃদ্ধা বিধবাটি আর তার মেয়ে তার জন্যে খাবার তৈরি করছে। এখানে সে আর সেই 'হুজুর' নয়, দ্বীপের বাসিন্দা মাত্র। এবার সে শান্তি পেয়েছে। বুড়ো ছুতোর, বিধবা আর তার মেয়েটি, সবাই একান্ত বিশ্বস্ত। যতক্ষণ আলো থাকে বুড়ো কাজ করে যায়, কাজই তার নেশা। বিধবা আর তার মেয়েটি এমন আশ্রয় পাবার জন্যে একান্ত কৃতজ্ঞ হয়েই সংসারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স তেত্রিশ, তেমন সবল নয়। তারা খুশি মনেই মনিবকে দেখা শোনা করে, কিন্তু তাকে 'হুজুর' বলে ডাকে না। তার বদলে তারা সশ্রদ্ধভাবে 'মিস্টার ক্যাথকার্ট' বলেই তাকে সম্বোধন করে।

দ্বীপটিকে ছোট একটি আলাদা জগত আর বলা চলেনা। এটি এখন একটি আশ্রয়। ক্যাথকার্ট এখন আর কোনো কিছু নিয়ে যুঝবার চেষ্টা করেনা। তেমন কোনো গরজই তার নেই। সে আর তার আশ্রিত এই কটি প্রাণী যেন ছোট একটি সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক, শূন্য পথে যেতে যেতে খানিকক্ষণের জন্যে তারা যেন এই দ্বীপটিতে নেমে একত্র হয়েছে। তাদের মধ্যেও যাযাবর পাখিদের সেই রহস্যময় স্তব্ধতা।

প্রায় সারাদিনই সে পড়বার ঘরে কাটায়। তার বই-এর কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। বিধবার মেয়েটি লেখাপড়া জানে, সে তার লেখা টাইপ করে দেয়। দ্বীপে এই টাইপরাইটারের শব্দটি শুধু কেমন একটু খাপছাড়া, অদ্ভুত। কিন্তু ধীরে ধীরে সে শব্দ সমুদ্র আর বাতাসের ধ্বনির সঙ্গে কেমন যেন মানিয়ে গেল।

মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। ক্যাথকার্ট তার বই লিখে চলে, আর

সবাই যে যার কাজ করে যায়। ছাগলটির কালো একটি বাচ্চা হয়, চোখ দুটি তার হলদে। সমুদ্রে ম্যাকারেল্‌-মাছ ওঠে। বুড়ো ছুতোর, সমুদ্র শান্ত থাকলে দাঁড়টানা নৌকাটি নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোয়। ডাক আনবার দরকার হলে তারা মোটর বোটে, সবচেয়ে বড় দ্বীপটিতে যায়। দরকারী মালপত্রও সেখান থেকে নিয়ে আসে। বাজে খরচ আজকাল একেবারেই হয় না। এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যায়। অবসাদও নেই, তীব্র কোনো কামনাও নেই।

কামনা-বিরতির এই অদ্ভুত স্তব্ধতা ক্যাথকার্টের নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগে। কিছুই সে চায়না। এতদিনে তার হৃদয় সত্যই প্রশান্ত হয়েছে। তার মন যেন জলের তলাকার ক্ষীণ আলোকিত কোন গুহা, অপরূপ সমুদ্র শৈবাল সেখানে ছড়িয়ে আছে। সেই নিস্তরঙ্গ জলে তাদের কোনো দোলা নেই বললেই হয়, শুধু ছায়ার মতো মৌন একটা মাছ মাঝে-মাঝে সেখানে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। সমস্ত শান্ত, সমস্ত কোমল, সমস্ত নীরব, তবু সমুদ্র শৈবালের মতো সবই জীবন্ত।

"এই কি সুখ?" ক্যাথকার্ট নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। তার মনে হয় সে নিজেই যেন একটা স্বপ্ন। কিছুই যেন সে অনুভব করে না, কিম্বা কি যে অনুভব করে তা বুঝতে পারে না। তবু তার মনে হয় সে সুখী।

শুধু কিছু একটা নিয়ে তার মগ্ন হয়ে থাকা দরকার। তাই পড়ার ঘরে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে কাজ নিয়ে কাটায়। তাড়াতাড়ি কাজ করবার চেষ্টা সে করে না, কাজটাকে খুব বেশি যে মূল্য দেয় তাও নয়। তন্দ্রাময় লূতাতন্তুর মতো তার কলম থেকে লেখাগুলো অনায়াসে শুধু যেন বেরিয়ে আসে। ভালো কি মন্দ, কি যে সে লিখছে তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় না। ধীরে ধীরে শুধু রচনা করে যায়। শরতের হাওয়ায় লূতাতন্তু যেমন করে গলে যায়, তেমনি সেগুলো গলে গেলেও তার কোনো দুঃখ নেই। মাকড়সার জালের মতো যা কিছু কোমল, ক্ষণস্থায়ী, শুধু সেই সবেরই

তার কাছে যেন মূল্য আছে মনে হয়। অনন্তের রহস্য-কুহেলিকায় সেই সব কিছু যেন আচ্ছন্ন। অথচ, কঠিন পাথরে গাঁথা দেবস্থান, বা সেই ধরনের অন্য কোনো স্থাপত্যের নিদর্শন, যেন একদিন ভেঙ্গে পড়তে হবে জেনেই চরম বিলুপ্তির বিরুদ্ধে ক্ষণিক সংগ্রামের চেষ্টায় আর্তনাদ করে উঠছে মনে হয়।

কখনো-কখনো সে ইংলণ্ডের কোনো একটি শহরে গিয়ে ওঠে। পোশাক পরিচ্ছদ তখন তার একেবারে পরিপাটি, সম্পূর্ণ আধুনিক ফ্যাশানের। সে ক্লাবে যায়, কখনো বা থিয়েটারে গিয়ে বসে, বণ্ড ষ্ট্রীটে কেনা-কাটাও করে। প্রকাশকদের সঙ্গে তার বই ছাপানোর ব্যাপার নিয়ে আলোচনাও সে বাদ দেয় না। কিন্তু তার মুখে সেই ক্ষণস্থায়ী অবাস্তবতার আভাস—শহুরে লোকেরা মনে করে তার মাথায় বেশ একটু হাত বুলিয়ে নেওয়া গেছে। আর সে নিজে দ্বীপে ফিরে গিয়ে স্বস্তি পায়।

কোনোদিন যদি তার বই বার নাও হয় তাতেও তার দুঃখ নেই। বছরের পর বছর কেমন একটা কোমল কুয়াশায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, কিছুই তার ভেতর থেকে আর স্পষ্ট হয়ে বার হয়ে আসে না। বসন্ত এল। দ্বীপে একটি প্রিমরোজেরও দেখা নেই, তবে একদিন সে একটি শীতের একোনাইটফুল খুঁজে পেয়েছে। ব্ল্যাকথর্নের দুটি ঝোপও দ্বীপে আছে,আরও অন্যান্য দু'চারটি ফুল। দ্বীপের ফুলগুলির একটি তালিকা সে তৈরি করতে আরম্ভ করলে। এই কাজটাতেই কিছুদিন সে মগ্ন হয়ে রইল। একদিন একটা ভিজে পাথরের কোণে সোনালি স্যাক্সিফ্রেজ-ফুলের একটা গাছ দেখে কি তার আনন্দ। স্বপ্নাবিষ্টের মতো কতক্ষণ যে সে সেখানে বসেছিল, তা সে নিজেই জানেনা। তবু সেটা দেখতে এমন কিছুই নয়। বিধবার মেয়েটির মত ও অন্তত তাই। তাকে ক্যাথ্‌কার্ট সোৎসাহে সেটি দেখিয়ে বুঝিয়ে সেদিন বলেছিল, "জানো, আজ সকালে একটা সোনালি স্যাকসিফ্রেজ দেখেছি।"

নামটা সত্যই অপরূপ। মেয়েটি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তাই নাকি? ফুলটা সুন্দর বুঝি?" মেয়েটির দৃষ্টিতে কি একটা বেদনাময় শূন্যতা, ক্যাথকার্ট তাতে কেমন যেন ভয়ই পায়।

ক্যাথকার্ট উত্তর দিয়েছিল, "না, এমন কিছু আহা মরি নয়। তুমি যদি চাও তো তোমায় দেখাতে পারি।"

"হ্যাঁ, দেখতেই চাই।"

মেয়েটি এমন শান্ত, এমন একটি ঔৎসুক্য তার মধ্যে আছে যে তাকে ভালো লাগবারই কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে কি এমন একটা তার মধ্যে আছে যাতে ক্যাথকার্ট অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। মেয়েটি বলে, সে নাকি সুখী, অত্যন্ত সুখী। পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে সে তাকে ছায়ার মতো সব জায়গায় অনুসরণ করে। সেখানে পাশাপাশি দুজনের যাবার মতো জায়গা নেই। ক্যাথকার্ট আগে আগে যেতে যেতে ঠিক পেছনেই তাকে যেন অনুভব করতে পারে। একান্ত অনুগত ভাবে মেয়েটি তার প্রতি তন্ময় হয়ে তার পিছু পিছু আসছে সে জানে।

তার প্রতি কেমন একটা করুণা থেকেই একদিন ক্যাথকার্ট তার কাছে ধরা দিলে। যদিও তার ওপর মেয়েটির জোর যে কতখানি তা সে তখনো বুঝতে পারেনি। কি শক্তিতে মেয়েটি যে তাকে জয় করল তাও সে জানে না। কিন্তু ধরা দেবার পরমুহূর্ত থেকেই সে কেমন যেন, বিচলিত হয়ে উঠল। তার মনে হলো এ অত্যন্ত অন্যায়। ভেতর থেকে মেয়েটির প্রতি যেন একটা বিরাগই সে অনুভব করে। এমন করে হার মানতে সে চায়নি! তার মনে হয়, মনের দিক বাদ দিলে মেয়েটিরও এমন কোনো কামনা ছিল না। এ যেন শুধু তার সঙ্কল্প। সমুদ্রের কাছে একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল। মনের ভেতরটা তার কেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। একটি কাতর

আর্তনাদ শুধু সেখান থেকে থেকে উচ্চারিত : "আমরা এটা চাই নি, সত্যিই চাই নি।"

স্বক্রিয় কামনার ঘূর্ণিপাকে আবার সে পড়েছে। এ কামনার প্রতি কোনো ঘৃণা যে তার আছে, তা নয়। চীনাদের মতো তারও বিশ্বাস যে জীবনের পরম একটি রহস্য এরই মধ্যে সঙ্গোপন। কিন্তু কামনার যে স্বক্রিয় যান্ত্রিকতার মধ্যে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, তা থেকে সে মুক্তি চায়। তার সমস্ত মন এতে ভেঙ্গে পড়ছে, এ যেন এক ধরণের মৃত্যু। তার ধারণা ছিল নিষ্কামতার এক নতুন স্তব্ধতায় সে এসে পৌছেছে। হয়তো এরও পারে অনাবিষ্কৃত কোনো দেশ আছে, কামনায় যেখানে অভিনব পেলব সূক্ষ্মতা, দুটি মনের অন্তরঙ্গতা যেখানে একান্ত নিবিড়।

কিন্তু যে ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েছে তা নিতান্তই যান্ত্রিক। শুধু সঙ্কল্প ছাড়া আর কোনো প্রেরণা তার পেছনে নেই। মেয়েটিও তার সত্যকার সত্তা থেকে এমন কিছু চায় নি।

অনেক দেরি করে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন মেয়েটির মুখ উদ্বেগে আশঙ্কায় পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। ক্যাথকার্টের মনের বিরাগ যেন সে টের পেয়েছে। ক্যাথকার্টের তার ওপর করুণাই হলো, তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে সে দুটো মিষ্টি কথাও বল্‌লে। কিন্তু নিজে সে দূরে-দূরেই রইল।

কিছু যে বুঝেছে তার কোনো পরিচয় মেয়েটির মধ্যে পাওয়া গেল না। তেমনি নীরবে সে শুধু ক্যাথকার্টের সেবা করে যায়। শুধু ক্যাথকার্টের কাছে থাকতে, শুধু তার সেবা করতে পারলেই সে খুশি। কিছুই সে চায় না, কিন্তু তার অদ্ভুত শূন্যতাময় উজ্জ্বল বাদামী চোখে সেই নীরব এক প্রশ্ন। সে প্রশ্ন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ক্যাথকার্টকে সোজা এসে যেন আঘাত করে। আবার সে তাই হার মানলে। কিন্তু মেয়েটি আপত্তি জানিয়ে বললে, "আমার ওপর যদি ঘৃণাই আসে তাহলে এর দরকার নেই।"

"ঘৃণা কেন আসবে? কিছুতেই না," ক্যাথকার্ট একটু উত্যক্ত হয়েই জবাব দিলে।

"তুমি তো জানো, তোমার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।"

মেয়েটির কথা তখন সে ভালো করে ভেবে দেখবার সময় পায়নি। কিন্তু পরে এই কথাগুলি স্মরণ করেই তার মন তিক্ত হয়ে উঠল। সব যদি করতেই পারে তবে শুধু তারই জন্যে কেন? মেয়েটির নিজের জন্যে কেন নয়? কিন্তু নিজের মনের তিক্ততায় সে যেন আরও গভীর ভাবে এই ব্যাপারে নিমগ্ন হয়ে যায়। নিজের ওপর কোনো শাসন আর সে রাখে না। দ্বীপের কারুরই কিছু এখন জানতে বাকি নেই। তবে সে কিছুই গ্রাহ্য করে না।

তারপর কামনাও যখন নিঃশেষ হয়ে গেল তখন সে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। নিজের মনে তার আত্মগ্লানি ছাড়া আর কিছুই নেই। তার দ্বীপটি যেন কলঙ্কিত। একদিন কালের যে কামনাহীন লোকে সে পৌঁছে-ছিল, সেখান থেকে তার পতন হয়েছে। শুধু যদি সত্যকার সেই সূক্ষ্ম অনুরাগ তাদের পরস্পরের প্রতি থাকত। কিন্তু তা হয়নি, সত্যকার অনু-রাগ নয়, শুধু যান্ত্রিক একটা সঙ্কল্প। এতে শুধু গ্লানিই মনে রেখে দেয়।

মেয়েটির নীরব অভিযোগ সত্ত্বেও একদিন সে দ্বীপ থেকে চলে গেল। ইউরোপের নানা জায়গায় অনেকদিন সে ঘুরে বেড়ালে। কিন্তু কিছুদিন থাকা যায় এমন কোনো জায়গাই সে খুঁজে পেল না। সে নিজেই যেন বেসুরো হয়ে গেছে, পৃথিবীর কোথাও যেন আর খাপ খাচ্ছে না।

তারপর সেই মেয়েটির কাছ থেকে চিঠি এল। ফ্লোরা লিখেছে, খুব সম্ভব সে সন্তানের জননী হতে চলেছে। কে যেন তাকে গুলি করেছে এমনি-ভাবে সে বসে পড়লো। তারপর বহুক্ষণ তার ওঠবার ক্ষমতা রইল না। তবু সে ফ্লোরাকে চিঠি দিলে, "ভয় কি? তাই যদি হয় হোক। এতে ভয় পাওয়ার চেয়ে খুশি হওয়াই আমাদের উচিত।"

সেই সময় অনেকগুলো দ্বীপ নিলাম হচ্ছে সে খবর পেলে। মানচিত্র সংগ্রহ করে সে ভাল করে সেগুলোর খোঁজ খবর নিলে। তারপর নিলামে অতি সামান্য টাকায় আর একটা দ্বীপ সে কিনলে। ইংলণ্ডের উত্তরে ছোট ছোট দ্বীপগুলির একেবারে শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক বিঘা পাথুরে জমি নিয়ে সেই দ্বীপটি। দ্বীপটি একেবারে নিচু। সমুদ্র থেকে একটুখানি উঠে আছে মাত্র। বাড়িঘর কিছুই সেখানে নেই, এমন কি একটা গাছও নয়। শুধু উত্তরাঞ্চলের নোনা মাটি, বর্ষার জল-জমা একটা কুণ্ড, কিছু ঘাসের জমি, পাথর আর সমুদ্রের পাখি। অশ্রুভারাচ্ছন্ন ভিজে আকাশের তলায় এ ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই।

নতুন সম্পত্তিটি সে একবার দেখতে গেল। সমুদ্রের অস্থিরতার জন্যে প্রথম কয়েকদিন সেখানে তো পৌঁছুতেই পারল না। তারপর একদিন হাল্কা সামুদ্রিক কুয়াশার মধ্যে সেখানে গিয়ে সে নামল। মনে হলো সামনে অস্পষ্ট নিচু দ্বীপটি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে। কিন্তু সেটা দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। ভিজে নরম মাটির ওপর দিয়ে সে হাঁটতে লাগল। ধূসর ভেড়ার পাল তার পথের দুপাশ থেকে ভুতুড়ে মূর্তির মতো সরে যাচ্ছে। জলের কুণ্ডটার কাছে এসে সে একবার থামল—পাড়গুলো তার বড় বড় ঘাসে ঢাকা। সেখান থেকে, ধূসর সমুদ্র যেখানে পাহাড়-গুলোর ওপর আছড়ে পড়ছে, সেখানে গিয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সত্যই এটা একটা দ্বীপ বটে!

আবার সে ফ্লোরার কাছে ফিরে গেল। ফ্লোরার চোখে অপরাধীর মতো কেমন একটা সশঙ্ক দৃষ্টি। কিন্তু তারই সঙ্গে বিজয়-উল্লাসের একটা ঝিলিক যেন মিশে আছে। ক্যাথকার্ট আবার মধুর ব্যবহারেই তাকে আশ্বস্ত করলে, এমন কি তার সঙ্গকামনাও সে ত্যাগ করতে পারল না—এ অদ্ভুত কামনা যেন একটা দৈহিক যন্ত্রণার মতো। ফ্লোরাকে এবার সে ইংলণ্ড নিয়ে গিয়ে যথারীতি বিয়ে করলে।

সে তার সন্তানের জননী হতে চলেছে।

তারা আবার দ্বীপে ফিরে এসেছে! ফ্লোরা এখন তার খাবার আনবার সময়, নিজের খাবারটুকুও সঙ্গে করে আনে। তারপর দুজনে একসঙ্গে বসে খায়। ক্যাথকার্ট নিজেই তাকে এ অনুরোধ করেছে। বিধবা মা রান্না ঘরেই থাকা পছন্দ করেন। ফ্লোরা বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে অতিথিদের থাকবার ঘরে শোয়।

সন্তান হতে এখনো কয়েক মাস বাকি। যেটুকু কামনা তার মধ্যে ছিল এরই মধ্যে গভীর বিতৃষ্ণায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। দ্বীপটি এখন তার কাছে সহরতলীর মতো অত্যন্ত কুৎসিত ঘৃণার বস্তু। তার নিজেরই সমস্ত সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি যেন নষ্ট হয়ে গেছে। গভীর গ্লানির মধ্যে দিনগুলি যেন তার কারাগারের মধ্যে কাটছে। তবু সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে জোর করে সে ধরে রাখলে। মনে মনে কিন্তু সে মুক্তি নেবার সঙ্কল্পই করেছে। ফ্লোরা এখনো কিছুই জানেনা।

দ্বীপে একজন নার্সের আবির্ভাব হয়েছে, সে তাদের সঙ্গে এক টেবিলেই খায়। কখনো কখনো ডাক্তারও আসেন। সমুদ্র বেশি অশান্ত থাকলে তাঁকে থেকে যেতে হয়।

তাদের দেখলে মনে হয়, তারা যেন অত্যন্ত সুখী একটি তরুণ দম্পতি।

অবশেষে একটি মেয়ে হলো। মেয়েটিকে দেখে ক্যাথকার্টের মন একেবারে দমে গেল। এ যেন তার সহ্যের অতীত। তার গলায় যেন সত্যই একটা বিরাট পাথর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাইরে সে কিছু প্রকাশ করে না। ফ্লোরাও কিছু জানেনা। সে ক্রমে সেরে উঠছে, এখনো তার মুখে সেই নির্বোধ জয়ের হাসি। তারপর আবার তার চোখে সেই সঙ্কেতময় সকাতর দৃষ্টি দেখা দিতে সুরু করল—সে দৃষ্টির কাতরতার মধ্যেও কোথায় যেন একটা স্পর্ধার আভাস আছে। ক্যাথকার্টের প্রতি তার সশ্রদ্ধ অনুরাগ এমন গভীর!

ক্যাথকার্টের কিন্তু এইটাই অসহ্য। ফ্লোরাকে সে জানাল, কিছুদিনের জন্য তাকে চলে যেতে হবে। ফ্লোরা চোখের জল ফেললে, কিন্তু তার মনে মনে বিশ্বাস, ক্যাথকার্ট তার অধিকার ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। ক্যাথকার্ট তাকে জানালে তার সম্পত্তির বেশির ভাগ সে ফ্লোরার নামে লিখে দিয়েছে। কত তার আয় হতে পারে তাও সে তাকে লিখে দিলে। ফ্লোরা কিছুই শুনতে পেল কিনা কে জানে, সেই গাঢ় কাতর দৃষ্টিতে শুধু তার দিকে চেয়ে রইল। তাকে একটা চেক বই দিয়ে তার জমার টাকার পরিমাণ ক্যাথকার্ট তাকে লিখে দিলে। ফ্লোরার কৌতূহল এইবার বুঝি জাগ্রত হলো। ক্যাথকার্ট তাকে এ-কথাও জানিয়ে দিলে যে যদি কখনো অরুচি ধরে, তাহলে ফ্লোরা ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি গিয়ে নতুন করে বাসা বাঁধতে পারে।

চলে যাবার সময় ফ্লোরার বাদামী চোখে সেই বেদনাময় একাগ্র দৃষ্টি, কিন্তু চোখে তার একবিন্দু জল নেই।

ক্যাথকার্ট সোজা উত্তরে তার তৃতীয় দ্বীপে চলে গেল।

—তিন—

তৃতীয় দ্বীপটি কিছুদিনের মধ্যে বাসোপযোগী হয়ে উঠল। সমুদ্রতটের পাথুরে নুড়ি আর সিমেণ্ট দিয়ে দুজন মিস্ত্রী ক্যাথকার্টের জন্যে করোগেট টিনে ছাওয়া একটি ছোট বাড়ি তৈরি করে দিলে। একটি বোটে তার একটা খাট, টেবিল, তিনটে চেয়ার, একটা ভালো ভাঁড়ারের আলমারি আর কয়েকটা বই আনানো হলো। কিছুদিনের মতো খাবার, কয়লা আর তেলের যোগাড় সে করে রাখলে। তার প্রয়োজন নিতান্ত অল্প।

নুড়ি-কাঁকর-ছড়ানো সমতল সমুদ্র তটের কাছেই তার বাড়িটা। সেই খানেই নেমে সে তার হাল্কা বোটটা ডাঙায় টেনে তুলে রাখলে। তার পর আগষ্টের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, দ্বীপে তার কাজে যারা এসেছিল

তারা তাকে ছেড়ে গেল। ফিকে নীল নিথর সমুদ্র। দূর দিগন্তে ছোট ডাক-জাহাজটা উত্তরমুখে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেন ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে মনে হয়। ডাক-জাহাজটা হপ্তায় দুবার দূরের বড় বড় দ্বীপগুলো ছুঁযে যায়। সমুদ্র শান্ত থাকলে ক্যাথকার্ট ইচ্ছে করলে নৌকো বেয়ে গিয়ে সেটা ধরতে পারে, দরকার হলে তার বাড়ির পেছনের নিশান-মাস্তুল থেকে তাকে সঙ্কেত করতেও পারে। তার সঙ্গী হিসেবে দুটি ভেড়া এখনো দ্বীপে রয়ে গেছে। আর আছে একটি বেড়াল, তার পায়ে গা ঘসবার। উত্তরাঞ্চলের রৌদ্রোজ্জ্বল মধুর শরৎ যতদিন আছে ততদিন সে পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে তার ছোট্ট দ্বীপটি ঘুরে ঘুরে বেড়ালে। যেদিকেই যাক সেই অস্থির অবিরাম সমুদ্র তাকে ঘিরে আছে। দ্বীপে একটিও গাছ নেই, শুধু সমুদ্র-শৈবাল আর জলের কুণ্ডের ধারের সেই ঘাস, আর ছোট মাটি-ছাওয়া আগাছা। এতেই সে খুশি। বড় গাছ সে চায়না। মানুষের মতো তাদের মধ্যে কেমন একটা স্পর্ধা যেন আছে।

আজকাল সে বই-এর কাজও করে না, কোনো আগ্রহ তার নেই। শুধু নিচু দ্বীপটির প্রান্তে সমুদ্রের ধারে সে বসে থাকে। তার মনে হয়, তার মনটাও উত্তরের সমুদ্রের মতো কোমল অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সাগর-দিগন্তে ডাক জাহাজটা দেখতে পেয়ে সে একটু চমকে ওঠে, ডাক জাহাজটাও তার কাছে একটা উপদ্রব। পাছে এখানে থেমে অশান্তি ঘটায়, এই যেন তার ভয়। দিক্‌চক্রবালে ডাক-জাহাজটা বিলীন হয়ে যাবার পর সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মানুষের সংস্পর্শ, মানুষের কণ্ঠস্বর আর সে চায় না। বেড়ালটাকে কিছু বলতে গিয়ে নিজের গলার স্বরেই সে চমকে ওঠে। দ্বীপের এই অনাবিল স্তব্ধতা ভাঙবার জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করে। বেড়ালটাও আজকাল বোঝে, মনিব তার ডাক পছন্দ করে না। ক্রমশ পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালটা বুনো হয়ে যাচ্ছে—হয়তো নিজে নিজে মাছও ধরে।

ভেড়াগুলো যখন কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে তখন সব চেয়ে তার খারাপ লাগে। ভেড়াগুলো এখন তার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। শুধু সমুদ্রের মৃদু কল্লোল আর সাগর-পাখিদের ডাক সে শুনতে চায়—এ যেন অন্য কোনো জগতের ডাক।

পরের বার নৌকো এলেই ভেড়াগুলো সে বিদায় করে দেবে ঠিক করলে। ভেড়াগুলো এখন তাকে চিনে নিয়েছে। তাকে দেখে আর সরে যায় না, কেমন একটা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। সত্যই সেগুলোকে সে ঘৃণা করে। কি একটা কুৎসিত ইতরতার আভাস যেন তাদের মধ্যে আছে।

পরিষ্কার আকাশ আর দেখা যায় না, সারাদিনই এখন বৃষ্টি। বেশির ভাগ সে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই কাটায়, ছাদ থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনে। খোলা দরজা দিয়ে ঝাপসা পাহাড় আর সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। এখন দ্বীপে অনেক রকমের সাগর-পাখি দেখা দিয়েছে। কয়েক ধরনের পাখি সে আগে কখনো দেখেই নি। হঠাৎ একদিন তার ইচ্ছে হলো একটা বই আনিয়ে পাখিগুলোর নাম ও পরিচয় জেনে নেয়। পাখিগুলোর নাম তাকে জানতেই হবে, নাম না জানলে সেগুলো তার কাছে যেন সম্পূর্ণ জীবন্তই মনে হবে না। সে ঠিক করে ফেললে নৌকো বেয়ে গিয়ে ডাক জাহাজটা একদিন ধরবে।

কিন্তু এ খেয়াল তার কেটে গেল। এখন পাখিগুলোকে, কোনো কিছু জানবার চেষ্টা না করেই সে শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখে। শুধু একটি সুশ্রী বড় পাখিকে তার বড় ভালো লাগে। তার ঘরের খোলা দরজার সামনে পাখিটা এমন ভাবে পায়চারি করে বেড়ায় যেন তার মস্ত কি একটা কাজ আছে। মুক্তা-ধূসর তার গায়ের রঙ, গোলগাল মসৃণ চেহারাটা মুক্তার মতোই সুন্দর।

তার পর একদিন দ্বীপ থেকে পাখিরা বিদায় হয়ে গেল। সারাদিন যে

দ্বীপে পাখিদের তীব্র কণ্ঠের ডাক, পাখার ঝিলিক, আর হাওয়ায় ডানা আন্দোলনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যেত না, সেখান থেকে সাগর-পাখিরা একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বললেই চলে।

দিনগুলো ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, সমস্ত পৃথিবী কেমন যেন অদ্ভুত। একদিন দুজন জেলে হঠাৎ একটা নৌকোয় সেখানে এসে হাজির হলো। ক্যাথকার্টের কাছে তারা নিতান্ত অবাঞ্ছিত উপদ্রব। তাদের শাদাসিদে আড়ষ্ট ভাবটাও তার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। যে চিঠিগুলো তারা এনেছিল সেগুলো সে না খুলেই বাক্সে রেখে দিলে। একটির মধ্যে তার টাকা আছে সে জানে, তবু সেটা খুলে দেখাও তার কাছে অসহ্য। নিজের নামটাও সে খামের ওপরে পড়তে চায় না।

ভেড়াগুলোকে ধরে বেঁধে নৌকোয় তোলাও এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার যে সমস্ত প্রাণী জগতের ওপরই সে বিরূপ হয়ে উঠল। পশু আর দুর্গন্ধময় এই সমস্ত মানুষ কোন জঘন্য বিধাতার সৃষ্টি কে জানে। পবিত্র মাটির যেন তারা কলঙ্ক।

পাল তুলে নৌকোটা চলে যাবার পরও কিছুদিন তার অস্থিরতা কাটল না। ভেড়াগুলোর ঘাস চিবোনোর শব্দ মাঝে মাঝে কল্পনা করেই সে ঘৃণায় শিউরে ওঠে।

শীতের অন্ধকার দিনগুলো এসে পড়েছে। এক একদিন যেন ভালো করে দিন বলে চেনাই যায় না। নিজেকে তার অসুস্থ মনে হয়, ভেতর থেকে সে যেন ধীরে-ধীরে গলে যাচ্ছে। মনের ভেতরে বাইরে সর্বত্রই অস্পষ্ট গোধূলি। একদিন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তার মনে হলো সমুদ্রে যেন অনেকগুলো মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। তারা সাঁতার কেটে দ্বীপেই যেন আসছে। সে গুলো যে মানুষ নয়, এক ঝাঁক 'শীল্' তা বুঝতে তার বেশিক্ষণ দেরি হলো না, কিন্তু তার আগেই অযাচিত মানুষের সংস্পর্শের ভয়ে তার মন একেবারে ভেঙে গেছে। মানুষের সংস্পর্শ

থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে জেনে কখন যে তার চোখে জল এসেছিল তা সে নিজেই জানে না। কোনো অদ্ভুত শূন্যদেহ প্রাণীর মতো নিজের কাছে নিজেই যেন সে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন শুধু একলা থাকাতেই তার একমাত্র তৃপ্তি। অসীমতায় মিশে গিয়ে একেবারে একলা থাকতেই সে চায়। শুধু ধূসর সমুদ্র আর ঊর্মিধৌত তার এই দ্বীপটি। এ ছাড়া আর কিছু নয়। একদিন তাই প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রকে উত্তাল হয়ে উঠতে দেখে সে খুশিই হয়ে উঠল। বাইরের জগৎ থেকে আর কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ঝড়ের বেগে নাকাল তাকে ভালো করেই হতে হলো বটে, তবু সে-ঝড়ে পরিচিত পৃথিবীকেও একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেছে এই তার আনন্দ।

সময়ের হিসেব আজকাল সে রাখে না, কখনো ভুলেও একটা বই খুলে দেখে না। মানুষের কণ্ঠের শব্দের মতো ছাপা অক্ষরগুলো তার কাছে অশ্লীল, কুৎসিত। তার বেড়ালটা কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কয়লার ঘরটায় তার বাস ছিল। প্রতি সকালে নিজের খাবার থেকে এক ডিস পরিজ সে তার কাছে ধরে দিত। বেড়ালটার ডাক, অঙ্গভঙ্গী, তার কাছে বিরক্তিকর, তবু সযত্নে তাকে খাওয়াতে সে কোনো দিন ত্রুটি করেনি। খাবার সময় বেড়ালটা এসে রোজ নিজে থেকেই সাড়া দিত। একদিন তার ডাক আর শোনা গেল না। তারপর থেকে সে আর আসেনি।

একটা বড় বর্ষাতি গায়ে দিয়ে সে দ্বীপময় উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। কি যে দেখছে তা সে নিজেই জানে না, কি দেখতে বেরিয়েছে তাও নয়। সময়ের কোনো অনুভূতি আর তার নেই। অন্ধকার আকাশের তলায় অন্ধকার সমুদ্রের দিকে এক এক সময় বহুক্ষণ সে যেন হিংস্র নির্মম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার ধারালো মুখে নীল চোখ দুটিকে অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়। কখনো কখনো দূরের সমুদ্রে কোনো জেলে নৌকোর পাল দেখলে, তার মুখে এক অদ্ভুত বিদ্বেষ ফুটে ওঠে।

সে অসুস্থও হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। হাঁটতে গিয়ে সহজেই টলে না পড়লে সে বোধ হয় তা বুঝতেও পারত না। এ রকম কিছু হলে সে ভাঁড়ারে গিয়ে কিছু শুকনো দুধ ও 'মল্ট' বার করে নিয়ে খায়। তারপর সে কথা একেবারে ভুলে যায়। কি যে বোধ করছে, না করছে সে খেয়ালও তার আর নেই।

দিনগুলো আবার বড়ো হতে শুরু করেছে। সমস্ত শীত ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু ঠাণ্ডা এমন কিছু দুঃসহ ছিল না। হঠাৎ বাতাস একেবারে হিমশীতল হয়ে এল। রীতিমত তাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। কি যেন একটা আতঙ্ক সে অনুভব করলে। ধূসর আকাশ যেন আরো নিচু হয়ে নেমে এসেছে। রাতে একটা তারাও দেখা যায় না। দ্বীপে আবার অনেক পাখি আসতে শুরু করেছে। সমস্ত দ্বীপ ক্রমশ বরফে জমে আসছে। নিদারুণ শীত। কম্পিত হাতে সে অগ্নি-কুণ্ডে আগুন জ্বাললে। দিনের পর দিন দুঃসহ মৃত্যু-গভীর শীতলতা। কখনো বাতাসে তুষারের গুঁড়ো। দিনগুলো বড়ো হচ্ছে তবু ঠাণ্ডা আর কমে না। যাযাবর পাখি-গুলো দলে দলে উড়ে চলে গেল, কয়েকটা ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে দ্বীপেই মারা গেছে। মনে হয় সমস্ত জীবন যেন ধীরে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সরে যাচ্ছে। মনে মনে সে বলে—"আর দেরি নেই! এদিকে কিছু দিন বাদেই জীবিত আর কিছু থাকবে না।" এ কল্পনাতেও যেন তার কি এক নিষ্ঠুর আনন্দ।

আজকাল সব সময়ে সমস্ত শরীর তার কি রকম আপনা থেকে কাঁপে, থেকে থেকে কেমন বেকে যায়। ব্যাপারটা তার সয়ে গেছে বলেই ভালো করে সে লক্ষ্যই করেনি। একদিন কিন্তু বেশ গভীর ভাবে তার ঘুম হল। আধ-ঘুম আধ-জাগরণে কাঁপতে কাঁপতে রাত কাটানো নয়, সত্যিকার গাঢ় ঘুম। সেদিনই নিজের শরীরের অবস্থা সে বুঝতে পারলে।

সকালে উঠে চারধারে অদ্ভুত এক শুভ্রতা দেখে সে অবাক। রাত্রে তুষার-পাত হয়েছে। তার জানলা শাদা বরফে ঢাকা। উঠে দরজা খুলে তীব্র শীতে সে শিউরে উঠলো। চারধারে সব শাদা কালো পাথরগুলোর ওপর তুষারের বিচিত্র ছিটে। শুধু সমুদ্র, গলানো সীসের মতো গাঢ় আর ঢেউএর ফেনাগুলো কেমন নোঙরা।

তুষার-শুভ্র ডাঙাটা যেন শব-দেহ আর সমুদ্র যেন তাতে দোল দিচ্ছে। মরা বাতাস বেয়ে তুষার কণা ঝরে পড়ছে।

মাটিতে প্রায় এক হাত উঁচু বরফ জমে আছে। একটা কোদাল নিয়ে সে বাড়ির চারপাশ থেকে বরফ সরিয়ে দিলে। তুষার-পাতের মধ্যে একটা অস্পষ্ট বিদ্যুৎ-চমক, সুদূর বজ্রের গুরু-গুরু।

কয়েক মিনিটের জন্যে সে বাইরে গেল, কিন্তু হাঁটা অত্যন্ত কষ্টকর। হোঁচট খেয়ে বরফের মধ্যে পড়ে গিয়ে মনে হলো তার মুখটা যেন পুড়ে গেছে। অর্ধ-সচেতন দুর্বল শরীরে কোনো মতে সে বাড়িতে ফিরে এসে একটু দুধ গরম করে খেল।

তুষার-পাতের আর বিরাম নেই। সন্ধ্যার দিকে তারই ভেতর অস্পষ্ট বজ্রের গর্জন আর রক্তাভ বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যেতে লাগল। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সকাল যেন আর হবেনা। তার মনে হলো রাত্রির অন্ধকার কখন একটু পাণ্ডুর হয়ে আসবে তারই আশায় অনন্তকাল ধরে সে অপেক্ষা করে আছে। অবশেষে ম্লান আলো তার ঘরের মধ্যে চুইয়ে এল। নিদারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে উঠে দরজা খুলে সে দেখলে, বাইরে তার বুকের সমান উঁচু বরফের প্রাচীর জমে আছে। তারই ওপর দিয়ে দূরে দেখা গেল তুষারের গুঁড়ো, ভারি হাওয়ায় শব-যাত্রার চাদরের মতো ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে। কালচে সমুদ্র নিষ্ফল আক্রোশে যেন বার বার তুষারাচ্ছন্ন দ্বীপটিকে কামড় দিচ্ছে। আকাশ ধূসর কিন্তু উজ্জ্বল।

বোটটা যেখানে তোলা আছে, সেখানে যাবার জন্যে সে উন্মত্তের মতো প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। যদি এ-দ্বীপে বন্দীই তাকে হতে হয়, তাহলে সে নিজের খুশিতেই হবে, প্রকৃতির অন্ধ শক্তির অত্যাচারে নয়। কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্বল এবং মাঝে মাঝে তুষারের বিরুদ্ধে সে যেন আর বুঝে উঠতে পারে না। তুষারে চাপা পড়ে খানিকক্ষণ সে যেন মড়ার মতো পড়ে থাকে। তবু একেবারে সব শেষ হবার আগেই সে আবার উঠে পড়ে যেন জ্বরের বিকারে বরফের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। ক্লান্ত হয়েও সে হার মানবে না। কোনো রকমে ঘরে ফিরে সে কফি আর 'বেকন' তৈরি করে। অনেক দিন এত বেশি কিছু সে রান্না করেনি। তারপর আবার সে তুষারের বিরুদ্ধে গিয়ে লাগে। তুষাররূপে এই যে শ্বেত পাশব শক্তি তার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে এর ওপর তাকে জয়ী হতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত সে নৌকোর কাছে গিয়ে পৌছলো। বরফ সরিয়ে দিয়ে বোটের পাশে গিয়ে বসলো। সামনে জোয়ারের সমুদ্র প্রায় তার পায়ের কাছ পর্যন্ত ঢেউ দিয়ে আসছে। এই অদ্ভুত জগতে সাগর তটের নুড়িগুলো আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সূর্যের আলো আর নেই। তুষারের বড়ো বড়ো টুকরো সমুদ্রের ঘনকৃষ্ণজল ছুঁতে না ছুঁতেই যেন ভোজবাজিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঢেউগুলো, কাঁকর-নুড়ি-বিছানো তটের ওপর দিয়ে কর্কশ গর্জন করতে করতে যেন ডাঙার বরফকে তাড়া করে আসছে। ঘনকৃষ্ণ ভিজে পাথরগুলো যেন নির্মমতার প্রতিমূর্তি।

রাত্রে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। তার মনে হলো বিশাল তুষারপুঞ্জ সমস্ত পৃথিবীময় যেন অবিরাম আঘাত করে চলেছে। তার ওপরে থেকে থেকে বাতাসের অদ্ভুত দমকা আওয়াজ, চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-বিকাশ আর ঝড়ের আওয়াজের চেয়েও ভারি বজ্রধ্বনি। ভোরে যখন অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এল, তখন ঝড়ের দাপট অনেকটা কমে এলেও বাতাস

সবেগে বয়ে চলেছে। বরফ তার দরজার মাথা পর্যন্ত জমে গেছে। এই তুষার-প্রাচীর খুঁড়ে শুধু অসীম ধৈর্যের জোরেই সে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল। কয়েক হাত উঁচু একটা বরফের ঢল এদিকে নেমে এসেছে, সেটা পার হবার পর দেখা গেল তুষার ফুট দুইয়ের বেশি গভীর নয়। কিন্তু তার দ্বীপের চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেছে। যেখানে কোনো পাহাড়ই ছিল না, সেখানে দুর্গম শাদা সব পর্বত-প্রমাণ বরফের স্তূপ খাড়া হয়ে উঠেছে। আগ্নেয়গিরির মতো সেগুলো ধুঁইয়ে উঠছে, তবে আগুন নয়, সে ধোঁয়া তুষার-কণার। নিজেকে তার অত্যন্ত অসুস্থ ও অত্যন্ত অবসন্ন মনে হলো।

তার নৌকোটা আর একটা ছোট তুষারের ঢলে জমে আছে। তা পরিষ্কার করবার ক্ষমতা আর তার নেই। অসহায়ভাবে সেদিকে সে চেয়ে রইলো, হাত থেকে তার কোদালটা গেল খসে। এবার সব কিছু ভুলে যাবার জন্যে সে তুষারের মধ্যে বসে পড়ল। সেই তুষারেও সমুদ্র-কল্লোল যেন প্রতিধ্বনিত।

শেষ পর্যন্ত আবার তার কিসে যেন সাড় ফিরে এল। অতিকষ্টে সে ঘরে ফিরে গেল। বোধশক্তি তার প্রায় নেই বললেই হয়, তবু কয়লার আগুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে, বরফে অবশ শরীরের একটা দিক সে কতকটা তাতিয়ে নিলে। তারপর খানিকটা দুধ গরম করে খেয়ে সে আগুনটা ভালো করে জ্বালিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করলে।

বাতাসের বেগ থেমে গেছে। আবার রাত হয়েছে নাকি? গভীর স্তব্ধতায় চিতাবাঘের সতর্ক সঞ্চরণের মতো, অনন্ত তুষার ঝরে পড়ার শব্দ যেন সে শুনতে পাচ্ছে। বজ্রধ্বনি ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। ক্ষণে ক্ষণে আকাশ রক্তিম বিদ্যুৎ-শিখায় বিদীর্ণ। মূর্ছাহতের মতো সে বিছানায় শুয়ে রইলো। জড়-প্রকৃতি! জড়-প্রকৃতি! তার মন নীরবে এই শব্দই উচ্চারণ করে চলেছে। জড় প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হবার সাধ্য কারুর

নেই। কতক্ষণ যে এভাবে চলল সে জানে না। একবার প্রেতমূর্তির মতো বেরিয়ে সে তার চিহ্নহীন দ্বীপে একটি শাদা পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠল। আকাশে তপ্তসূর্য। মনে মনে সে বললে, "বসন্ত এসেছে, এসেছে নতুন পাতার সময়।" এই শুভ্র অচেনা দ্বীপের ওপর, চারদিকের নিষ্প্রাণ বিস্তৃত সমুদ্রের ওপর সে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইল। যেন দূরে কোথায় একটা পালের আভাস দেখা যাচ্ছে, সে কল্পনা করবার ভান করলে, কারণ সে ভালো করেই জানে, এ সমুদ্রে কোনো পাল আর দেখা দেবে না।

সে চেয়ে থাকতে-থাকতেই আকাশ হঠাৎ আশ্চর্য ভাবে ছায়ায় ঢেকে গিয়ে হিমশীতল হয়ে গেল। বহুদূর থেকে যেন ক্ষুধিত বজ্রের অতৃপ্ত গর্জন শোনা যাচ্ছে। তার আর বুঝতে বাকি নেই, সমুদ্রের ওপর দিয়ে তুষার-পুঞ্জ গড়িয়ে আসার এই হলো সঙ্কেতধ্বনি। ফিরে দাঁড়াতেই সমস্ত শরীরে সেই তুষারের নিশ্বাস-স্পর্শ যেন সে পেল।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কাঠের ঘোড়ায় বাজিমাত

এক ছিলো মেয়ে। দেখতে সে ভালো, জীবনের আরম্ভে সব রকম স্থবিধে তার ছিলো, কিন্তু ছিলো না কপাল। ভালোবেসে বিয়ে করে-ছিলো, সে-ভালোবাসা যেন ধুলো হয়ে ঝরে পড়লো। মোটাসোটা ছেলেপুলে হলো, কিন্তু তার মনে হতো তাকে যেন এ-সব জোর করে গছিয়ে দেয়া হয়েছে, আপন সন্তানকে ভালোবাসতে পারলো না। ছেলেমেয়েরা তার দিকে এমনভাবে তাকাতো, যেন তাকে দোষ দিচ্ছে। সে দোষ ঢাকবার জন্য তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে পড়তো ; কিন্তু কী ঢাকতে হবে, কোথায় তার দোষ তা কি কেউ জানে ? তবু, ছেলেমেয়েরা কাছে এলেই তার বুকের ভিতরটা যেন জমে শক্ত হয়ে যেতো। এতে তার খারাপ লাগতো ; সন্তানের জন্য আরো স্নেহ, আরো উদ্বেগ তার ব্যবহারে প্রকাশ পেতো ; দেখে মনে হতো যেন সত্যি সে তাদের কতই ভালো-বাসে। সে ছাড়া আর-কেউ জানতো না যে তার বুকের মধ্যে ছোট্ট শক্ত একটু জায়গা যেখানে কোনো ভালোবাসার অনুভূতি নেই—কারো জন্যেই নেই। অন্যেরা বলাবলি করতো—'এমন মা দেখা যায় না। সন্তানের জন্য পাগল!' শুধু সে নিজে জানতো, আর তার ছেলে-মেয়েরা জানতো যে কথাটা ঠিক নয়। পরস্পরের চোখে ঐ কথাই পড়তো তারা।

একটি ছেলে আর ছোট্ট দুটি মেয়ে। বাড়িটি মনোরম, বাগান আছে, চাকরবাকররা সভ্য ; পড়শিদের চাইতে তারা যে অনেকটা উঁচু দরের এটা মনে-মনে অনুভব না-করে তারা পারতো না।

তারা থাকতো কেতাদুরস্ত চালে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে উদ্বেগের কামাই নেই। টাকার টানাটানি লেগেই আছে। মা-র অল্প-স্বল্প রোজগার ছিলো, বাবারও অল্প-স্বল্প রোজগার ছিলো; কিন্তু সমাজে যে-চালে চলতে হতো, তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যথেষ্টের কাছাকাছিও নয়। বাবা শহরে কোন একটা আপিসে যান। সেখানে উন্নতির আশা ছিলো, কিন্তু সে-আশায় বারে-বারে ছাই পড়লো। টাকা নেই—ভাবতে যেন হাড় গুঁড়িয়ে যায়। অথচ চাল বজায় রাখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মা ভাবলেন, 'দেখা যাক আমি কিছু সুবিধে করতে পারি কিনা।' কিন্তু কী ক'রে শুরু করতে হবে তা কি তিনি জানেন। অনেক মাথা ঘামালেন, এট-ওটা নিয়ে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনোটাই তাঁর কপালে লাগলো না। এই ব্যর্থতা তাঁর মুখে গভীর রেখা ফেললো। বাচ্চারা বড়ো হয়ে উঠেছে, তাদের স্কুলে পাঠাতে হবে। আরো টাকা চাই, আরো টাকা চাই। কিন্তু কী করে হবে? বাবার চেহারাটি ভারি চমৎকার, মেজাজ বাদশাহি, কিন্তু তিনি যে কখনো কিছু করে উঠতে পারবেন, এমন তো মনে হয় না। আর মা-রও সেই দশা, যদিও নিজের উপর আস্থা তাঁর গভীর। এদিকে মা-রও বাদশাহি মেজাজ।

কাজে-কাজেই সমস্ত বাড়ি ভরে যেন এই না-বলা কথা হানা দিয়ে বেড়াতে লাগলো—আরো টাকা চাই! আরো টাকা চাই! বাচ্চারা সব সময় তা শুনতে পেতো, কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলতো না। শুনতো ক্রিসমাসের সময় যখন ঝকঝকে দামি-দামি খেলনায় তাদের ঘর ভরে যেতো। চিকচিকে হালফ্যাশানের কাঠের দোলনা-ঘোড়ার পিছন থেকে, ফিটফাট খেলাঘরের পিছন থেকে হঠাৎ ফিশফিশ করে কে যেন বলতো—'টাকা চাই! আরো টাকা চাই!' আর ছেলে-মেয়েরা খেলা থামিয়ে চুপ করে শুনতো; এ ওর চোখে তাকিয়ে দেখতো, ওরাও শুনেছে কিনা। আর প্রত্যেকেই অন্য দু'জনের চোখে দেখতে পেতো

যে ওরা শুনেছে। 'আরো টাকা চাই! আরো টাকা চাই! আরো টাকা চাই!'

দোলন-লাগা ঘোড়ার স্প্রিঙের ভিতর থেকেও যেন সেই কথা বেরিয়ে আসতো ; মনে হতো কাঠের মাথাটি বাঁকিয়ে ঘোড়াটিও তা শুনছে। নতুন ঠেলাগাড়িতে চড়া, মিটমিটে চোখে তাকিয়ে থাকা মস্ত লালচে পুতুলটি যে তা শুনছে তা তার দিকে তাকালে স্পষ্টই বোঝা যায়—তাই সে জেনে-শুনে তো তার চোখের পাতা আরো বেশি করে মিটমিট করছে। টেডি ভালুকের বদলে যে-বোকাসোকা কুকুরটি এবার এসেছে, তাকে দেখতে অমন অসম্ভব বোকা কেন ? সে-ও তো শুনেছে, সমস্ত বাড়ি ভরে সেই ফিশফিশ আওয়াজ শুনেছে—আরো টাকা! আরো টাকা!

অথচ কথাটি কেউ কখনো মুখে আনতো না। সেই ফিশফিশ আওয়াজ তো সব সময়ই শোনা যাচ্ছে—বলে আর কী হবে। আমরা তো সব সময়ই নিশ্বাস নিচ্ছি, নিশ্বাস ফেলছি, কিন্তু মুখে কি কেউ কখনো বলি—আমরা নিশ্বাস নিচ্ছি ?

বড়ো ছেলে পল একদিন বললে, 'মা, আমাদের কেন নিজেদের গাড়ি নেই ? আমরা কেন বেরোবার সময় মামার গাড়িতে চড়ি, নয় তো ট্যাক্সি ডাকি ?'

'আমরা যে গরিব, তাই।'

'কেন ? আমরা গরিব কেন ?'

মা তিক্তস্বরে বললেন, 'কেন ? তোমার বাবার লাক্ নেই—তাই বোধ হয়।'

পল একটু চুপ করে রইলো। তারপর ঈষৎ ভীতভাবে জিগগেস করলে, 'মা, লাক্ মানেই কি টাকা ?'

'না, ঠিক তা নয়। যার জোরে তোমার টাকা হয়, তার নামই লাক্।'

'ও, তাই !' পল একটু অস্পষ্টভাবে বললে, 'আমি ভাবতুম, অস্কার মামা যখন বলেন, filthy lucker, তার মানেই টাকা।'

'Filthy lucre মানে টাকা বই কি। কথাটা lucre, luck নয়।'

'ও, বুঝেছি। তাহলে লাক্ কাকে বলে মা ?'

'লাক্ মানে ভাগ্য। ভাগ্য যদি থাকে তাহলেই টাকা হবে। সেইজন্যেই তো ধনী হয়ে জন্মানোর চাইতে ভাগ্যবান হয়ে জন্মানো ভালো। আজ তুমি ধনী আছো, কাল গরিব হতে পারো। কিন্তু ভাগ্যবান যদি হও তাহলে কেবলি তোমার আরো বেশি টাকা হবে।'

'ও, তাই বুঝি ? তাহলে বাবা—বাবা বুঝি ভাগ্যবান নন ?'

'না—ভাগ্য তাঁর খুবই মন্দ, বলতে হবে,' অত্যন্ত তিক্তস্বরে মা বললেন। পল অনিশ্চিত চোখে মাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। একটু পরে জিগগেস করলো, 'কেন ?'

'তা কি আমি জানি। কেন একজনের ভাগ্য থাকে, আর একজনের থাকে না, তা কেউ বলতে পারে না।'

'পারে না বুঝি ? কেউ পারে না ? কেউ না ?'

'ঈশ্বর হয়তো পারেন। কিন্তু তিনি তো কিছু বলেন না।'

'তাঁর বলা উচিত। আর তুমি, মা—তোমারও ভাগ্য নেই ?'

'আমার স্বামীর কপাল মন্দ হলে আমার কপাল ভালো হয় কী করে ?'

'তাই বুঝি ? কিন্তু এমনিতে তোমার নিজের—তোমার কপাল যদি ভালো হয় ?'

'বিয়ের আগে তাই ভাবতুম। কিন্তু এখন দেখছি আমার কপাল খুবই মন্দ।'

'কেন ?'

'মানে—থাক এ-কথা। আমার ভাগ্য ভালোই হয়তো—কে জানে।'

পল মা-র দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইলো, শেষের কথাটা সত্যি কিনা।

কিন্তু না—মা-র মুখের কাছে কয়েকটি ছোটো-ছোটো রেখা তাকে ব'লে দিলে যে তিনি তার কাছ থেকে কী যেন লুকোতে চাচ্ছেন।

পল বেশ দৃঢ়স্বরে বললে, 'সে যাই হোক, আমি কিন্তু বেশ ভাগ্যবান।'

মা হঠাৎ হেসে ফেলে বললে, 'কেন রে?'

পল মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কেন যে সে কথাটা বলেছিলো তা সে জানেও না।

সে লজ্জা কাটিয়ে জোর করে বললে, 'ঈশ্বর আমাকে বলেছেন।'

'আহা—তাই যেন হয়।' মা আবার হেসে ফেললেন, কিন্তু এবারের হাসি একটু নীরস।

'সত্যি বলেছেন, মা।'

'চমৎকার!' স্বামীর মুখের একটা বুলি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। পল বুঝতে পারলো যে মা তার কথা বিশ্বাস করলেন না; সে অত জোর দিয়ে যে-কথা বললে সেটাকে উড়িয়েই দিলেন। এতে তার কোথায় একটু রাগ হলো, মনে হলো, যেমন করে হোক মা-কে বিশ্বাস করাতেই হবে।

নিজের মনে কী ভাবতে ভাবতে সে চলে গেলো, ভাগ্যের রহস্য তাকে সন্ধান করতে হবে। সে ছেলেমানুষ, ভাগ্যের সে কী জানে? আপন ভাবনায় সে নিবিষ্ট, অন্যদের লক্ষ্যও করে না—চুপে-চুপে চোরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন নিজেরই মধ্যে ভাগ্যকে খুঁজে ফিরছে। ভাগ্য সে চায়, ভাগ্য সে চায়, ভাগ্য সে চায়। তার ছোটো বোন দুটি যখন বসে-বসে পুতুল নিয়ে খেলা করে, সে তার কাঠের ঘোড়ায় চেপে পাগলের মতো শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তার উদ্দামতা দেখে মেয়ে দুটি কেমন একটু অস্বস্তির ভাবে তার দিকে তাকায়। ঘোড়াটা যেন খেপে গিয়ে ছুটছে, পলের ঢেউ-তোলা কালো চুল উড়ছে, তার চোখে এক অদ্ভুত আলো চিকচিক করছে। বোনেদের সাহস হয় না তার সঙ্গে কোনো কথা বলে

পাগলা ঘোড়দৌড় শেষ করে সে নেমে দাঁড়ায়। ঘোড়ার হেঁট-করা মুখের দিকে চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কাঠের ঘোড়ার মুখটা লাল, একটুখানি খোলা, তার বড়ো-বড়ো চোখ কাচের মতো চকচকে।

মনে-মনে তার টগবগে ঘোড়াকে সে হুকুম করে, 'চলো! নিয়ে চলো আমাকে ভাগ্যের কাছে। নিয়ে চলো।'

বলে অস্কার-মামার দেয়া চাবুকটি ঘোড়ার ঘাড়ে শপাশপ মারে। সে জানে যে ঘোড়াটা তাকে ভাগ্যের কাছে নিয়ে যেতে পারে—সে যদি জোর করতে পারে তাহলেই হয়। আবার চড়ে বসে। আবার চালায় তার দুরন্ত দৌড়। পৌঁছবে, সেখানে পৌঁছবে সে। সে জানে সে পৌঁছবে।

নার্স একদিন বললে, 'পল, করছো কী! ঘোড়াটা ভেঙে যাবে!'

তার বড়ো বোন জোন বললে, 'ঐ-রকম করেই তো সব সময় চালায়! ভারি খারাপ লাগে!'

পল কিছু বললে না, তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালো শুধু। নার্স তাকে আর ঘাঁটালো না। পলের হাব-ভাব সে আর বুঝে উঠতে পারে না। আর এমনিও, ছেলেটা তার শাসনের বাইরে বেড়ে উঠছে।

একদিন তার পাগলা ঘোড়দৌড়ের মধ্যে মা অস্কার-মামাকে নিয়ে ঘরে এসে উপস্থিত। তাঁদের দেখতে পেয়েও সে কিছু বললে না।

'কী হে, বাচ্চা জকি! তোমার ঘোড়া বাজি মাত করবে তো?' মামা বললেন।

মা বললেন, 'এত বড়ো হলে পল, এখনো কাঠের ঘোড়া চালাও? তুমি তো আর ছোটোটি নেই।'

পলের বড়ো-বড়ো চোখ থেকে একটি নীল আভা ছড়িয়ে পড়লো। যখন সে পুরোদমে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, তখন কারো সঙ্গেই সে কথা

বলে না। মা উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে-তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

হঠাৎ ঘোড়ার বেগ কমিয়ে দিয়ে সে নেমে পড়লো।

'সেখানে গিয়েছিলাম!' তার কথা যেন একটা উদ্ধত ঘোষণা, তার চোখের নীল আভা তখনো উজ্জ্বল, লম্বা মজবুত পা দুটি ফাঁক করে সে দাঁড়িয়ে।

মা জিগগেস করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'যেখানে যেতে চেয়েছিলাম,' পলের চোখ যেন দপ করে জ্বলে উঠলো।

অস্কার-মামা বললেন, 'ঠিক! ঠিক! এই তো চাই! সেখানে না-যাওয়া পর্যন্ত থামবে না। কী-নাম তোমার ঘোড়ার?'

'ওর নাম হয়নি।'

'নাম ছাড়াই দিব্যি চলে যাচ্ছে তো?'

'আসলে ওর অনেকগুলো নাম কিনা। গেলো সপ্তাহে ওর নাম ছিলো সানসোভিনো।'

'সানসোভিনো? অ্যাস্কটে বাজি মাত করেছিলো। তুমি কী করে এ-নাম জানলে?'

জোন বললে, 'ও তো সব সময় ব্যাসেটের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের কথাই বলছে।'

বাচ্চা ভাগনেটি ঘোড়দৌড়ের সব টাটকা খবর রাখে দেখে মামা ভারি খুশি হলেন। ব্যাসেট বাড়ির ছোকরা মালি। যুদ্ধের সময় অস্কার ক্রেসওয়েলের আর্দালি ছিলো সে। বাঁ-পাটা তার জখম হয়; যুদ্ধের পরে ক্রেসওয়েল তাকে বোনের বাড়িতে চাকরি করিয়ে দিয়েছিলেন। ঘোড়দৌড়-মাঠের একটি ধারালো ফলা সে। ঘোড়দৌড় ব্যাসেটের জীবন, আর পলের জীবন ব্যাসেট।

অস্কার ক্রেসওয়েল ব্যাসেটের কাছ থেকে খবরটা বের করে নিলে।

'মাস্টার পল আমাকে এসে জিগগেস করে, আমিও না-বলে পারি না।'

ব্যাসেটের মুখ ভীষণ গম্ভীর ; ভাবটা এইরকম যেন ধর্মালোচনা করছে।

'কখনো কোনো ঘোড়ার উপর কিছু ধরে-টরে নাকি ?'

'কথাটা কী—সব কথা আমি ফাঁস করে দিতে চাই না—তবে খোকাবাবু খেলোয়াড় বটে—তুখোড় খেলোয়াড়। আপনি না হয় তার সঙ্গে কথা বলে দেখুন। এতে তার ভারি স্ফূর্তি। আজ্ঞে আমার দোষ ধরবেন না—তার বেশি বললে সব কথা ফাঁস করে দেয়া হবে।'

ব্যাসেটের মুখ গির্জের মতো গম্ভীর।

মামা ফিরে গেলেন ভাগনের কাছে, তাকে নিয়ে গাড়িতে বেড়াতে বেরুলেন।

'আচ্ছা পল বলো তো, কখনো তুমি কোনো ঘোড়ার উপর কিছু ধরেছো ?'

সুপুরুষ মামার দিকে পল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

'কেন, আমার ধরা কি উচিত নয় ?' সে পাল্টা প্রশ্ন করলো।

'তা নয়, মোটেও তা নয়! আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো আমাকে লিঙ্কনের দৌড়ের কয়েকটা ভালো টিপ দিতে পারবে।'

গাড়িটা গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে হ্যামশায়ারে অস্কার-মামার বাড়ির দিকে ছুটলো।

পল বললে, 'কাউকে বলবে না তো ?'

'কাউকে বলবো না।'

'তবে শোনো—ড্যাফোডিল।'

'ড্যাফোডিল ? ঠিক হলো না। মির্জা কী-দোষ করলো ?'

'তা তো জানি না, তবে ড্যাফোডিলই প্রথম আসবে। অন্য-কোনো ঘোড়ার খবর রাখি না।'

'ড্যাফোডিলই বলছো ?'

বলে মামা চুপ করে একটু ভাবলেন। ঘোড়াটি তেমন নামজাদা নয়।

'মামা!'

'বলো।'

'আর কাউকে বলবে না তো? ব্যাসেটের কাছে আমার প্রতিজ্ঞা আছে।'

'ধুত্তোর ব্যাসেট! এর সঙ্গে ব্যাসেটের সম্পর্ক কী?'

'ব্যাসেট আমার পার্টনার যে। প্রথম থেকেই ওর সঙ্গে আমার ভাগাভাগি কারবার। প্রথম পাঁচ শিলিং সে আমাকে ধার দিয়েছিলো—সেটা আমার লোকসান গেলো। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে আর আমি ছাড়া আর কেউ এ-কথা জানবে না—কিন্তু সেই যে তুমি একটা দশ শিলিংএর নোট দিয়েছিলে তাই দিয়ে আমি জিততে শুরু করি। সেই থেকে আমার মনে হলো যে তোমার কপাল ভালো। কিন্তু আর কেউ জানবে না তো?'

কাছাকাছি-বসানো বড়ো-বড়ো তীব্র চোখ মেলে পল মামার দিকে তাকালো। মামা কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসলেন, একটু নড়ে বসলেন।

'বেশ, বেশ! তোমার টিপ আর কাউকে বলবো না আমি। ড্যাফোডিল তো? আচ্ছা। তুমি ওর উপর কত ধরছো?'

'কুড়ি পাউণ্ড হাতে রেখে সবটাই ধরছি।'

মামা দেখলেন এ তো ভারি মজার কথা।

'ওহে তরুণ ঔপন্যাসিক, বলছ কি তুমি? কুড়ি পাউণ্ড হাতে রাখছো? তাহলে ধরছো কী?'

পল গম্ভীরভাবে বললে, 'তিন-শো পাউণ্ড। কিন্তু কথাটা আর-কাউকে বলো না, মামা। বলবে না তো?'

'ওহে উদীয়মান ন্যাট গোউল্ড—ভয় নেই তোমার, এ-কথা আমি কাউকে বলবো না। কিন্তু তিনশো পাউণ্ড কোথায় পাবে শুনি?'

'আমার টাকা ব্যাসেটের কাছেই থাকে। আমরা পার্টনার।'

'তোমরা পার্টনার? বটে? আর ব্যাসেট কত ধরছে, শুনি?'

'আমার চাইতে কমই ধরবে সে। বোধহয় দেড়শোর উপরে যাবে না।'

'দেড়শো পেনি?'

'পাউণ্ড,' পল একটু অবাক হয়ে মামার দিকে তাকালে। 'ব্যাসেট আমার চেয়ে হাতে রাখে বেশি।'

বিস্ময়ে কৌতুকে চুপ করে রইলেন অস্কার-মামা। এ নিয়ে তখনকার মতো আর-কিছু বললেন না, কিন্তু মনে-মনে স্থির করলেন লিঙ্কনের দৌড়ে ভাগনেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

'শোনো, পল। আমি মির্জার উপর কুড়ি পাউণ্ড ধরবো, আর তুমি যে ঘোড়া চাও তার উপর তোমাকে পাঁচ পাউণ্ড ধরে দেবো। কোন ঘোড়া তোমার পছন্দ?'

'ড্যাফোডিল।'

'না, না, ড্যাফোডিলের উপর পাঁচ পাউণ্ড নয়।'

'আমার নিজের টাকা হলে তাই ধরতাম।'

'বেশ! যা তোমার ইচ্ছে। ড্যাফোডিলের উপর তোমার পাঁচ আর আমার পাঁচ পাউণ্ড।'

পল এর আগে কখনো ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়নি, গিয়ে তার চোখের নীল আগুন আর নেবে না। শক্ত করে মুখ বুজে সে দেখতে লাগলো। তার ঠিক সামনে এক ফরাশি ভদ্রলোক লান্সলট ধরেছেন। পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে তিনি ফরাশি উচ্চারণে চীৎকার করছেন—'লাঁসলৎ! লাঁসলৎ!'

ড্যাফোডিল এলো প্রথম, তারপর লান্সলট, তারপর মির্জা। পলের মুখ টুকটুকে লাল, চোখে আগুনের হলকা, কিন্তু তার হাব-ভাব আশ্চর্য-রকম শান্ত। মামা তাকে চারটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট এনে দিলেন;

চারের দরে ঘোড়া জিতেছে। পলের চোখের সামনে নোটগুলি ধরে মামা বললেন, 'এ নিয়ে কী করি বলো তো?'

'ব্যাসেটের সঙ্গে কথা বলে দেখি। আমার বোধ হয় এখন পনেরো শো পাউণ্ড হলো, কুড়ি পাউণ্ড হাতে রেখেছি, আর এই কুড়ি।'

মামা তাকে ধীরভাবে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেন।

'শোনো পল, এই তোমার ব্যাসেটের আর পনেরো শো পাউণ্ডের গল্প— এ-সব কি সত্যি?'

'বাঃ, সত্যি বইকি। কিন্তু আর কাউকে বোলো না, মামা, আর কাউকে বোলো না।'

'না, আর কাউকে বলবো না, কিন্তু ব্যাসেটের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।'

'তুমি যদি ব্যাসেটের সঙ্গে আর আমার সঙ্গে পার্টনার হতে চাও, মামা, তা হতে পারো। আমরা তিন জনেই পার্টনার হবো। কিন্তু এটা তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আর কাউকে নেবে না, আমাদের তিন জনের বাইরে আর কাউকে নেবে না। কথা কী জানো? ব্যাসেট ভাগ্যবান আর আমিও ভাগ্যবান—আর তুমিও ভাগ্যবান, মামা— তোমার দেয়া দশ শিলিংএই তো আমি প্রথম জিতেছিলাম…'

একদিন বিকেলে অস্কার-মামা ব্যাসেটকে আর পলকে রিচমণ্ড পার্কে নিয়ে গেলেন, সেখানে কথাবার্তা হলো।

ব্যাসেট বললে, 'ব্যাপারটা এই রকম। মাস্টার পল আমার কাছে ঘোড়দৌড়ের গল্প শুনতে আসতো—সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে আমিও গল্প শোনাতাম। কিন্তু শুধু গল্প শুনেই চলতো না—আমি হারলাম না জিতলাম, সেটিও জানা চাই। আজ প্রায় এক বছর হলো আমি ব্লাশ অব ডন-এর উপর ওর হয়ে পাঁচ শিলিং ধরেছিলাম—সেটা খোওয়া গেলো। তারপর, আপনি ওকে যে দশ শিলিং দিয়েছিলেন, তাইতেই কপাল

ফিরলো। সেটা ধরেছিলাম সিংহলীজ-এর উপর। আর তার পর থেকে—আমরা আস্তে আস্তে বেশ লাভ করেই যাচ্ছি মোটের উপর—কী বলো, মাস্টার পল?'

পল বললে, 'যখন আমরা ঠিক জানতে পারি তখন আর কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু তা যখন পারি না তখনই লোকসান হয়।'

'কিন্তু তখন আমরা খুব সাবধানে চলি,' বললে ব্যাসেট।

'কিন্তু ঠিক জানতে পারো কখন?' একটু হেসে অস্কার-মামা জিগগেস করলেন।

গূঢ় গোপন কণ্ঠে ব্যাসেট বললে, 'ও-সব মাস্টার পলের কাণ্ড। যেন স্বর্গ থেকে কেউ ওকে বলে যায়। এই যেমন লিঙ্কনে ড্যাফোডিলের কথা। ওর আর নড়চড়ের জো নেই।'

অস্কার ক্রেসওয়েল জিগগেস করলেন, 'ড্যাফোডিলের উপর তুমি কিছু ধরেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও কিছু করে নিয়েছি।'

'আর আমার এই ভাগনেটি?'

ব্যাসেট পলের দিকে তাকিয়ে গোঁয়ারের মতো চুপ করে রইলো।

পল বললে, 'আমার বারো শো পাউণ্ড হয়েছে, না ব্যাসেট? মামাকে আমি তো বলেছিলাম যে ব্যাসেটের উপর তিন শো পাউণ্ড ধরছি।'

'হ্যাঁ ঠিক,' ব্যাসেট মাথা নেড়ে সায় দিলে।

মামা জিগগেস করলেন, 'টাকাটা কোথায়?'

'আজ্ঞে আমি সেটা সাবধানে তালাবন্ধ করে রাখি। মাস্টার পল চাইলে এক মিনিটে এনে দেবো।'

'কী এনে দেবে? পনেরো শো পাউণ্ড?'

'পনেরো শো কুড়ি পাউণ্ড—না, চল্লিশ। সেদিন মাঠে আরো কুড়ি হলো।'

'বলছো কী হে! এ তো অবাক কাণ্ড!'

'আজ্ঞে কোনো দোষ ধরবেন না—কিন্তু মাস্টার পল যদি আপনাকে পার্টনার হতে বলেন, তা হলে হওয়াই ভালো।'

ক্রেসওয়েল একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'টাকাটা আমি দেখবো।'

গাড়ি ঘুরিয়ে তারা বাড়ি ফিরে এলো। আর ব্যাসেট তার ঘর থেকে সত্যিই পনেরো শো পাউণ্ডের নোট নিয়ে এলো। কুড়ি পাউণ্ড টার্ফ কমিশনে জো গ্রী-র কাছে জমা আছে।

'দেখছো তো মামা, আমি যখন ঠিক জানতে পারি তখন আর কোনো কথাই থাকে না। তখন আমাদের যত আছে সব ঢেলে দিই। তাই না, ব্যাসেট?'

'হ্যাঁ, তা বইকি।'

মামা হেসে বললেন, 'কিন্তু কখন তুমি ঠিক জানতে পারো, বলো তো?'

পল বললে, 'এক-এক সময় তা পারি। এক-এক সময় এমন করে জানি যে কোনো সন্দেহ আর থাকে না। কখনো আবার খানিকটা জানতে পারি, খানিকটা পারি না, আবার কখনো একেবারে কিছুই জানতে পারি না। তাই না, ব্যাসেট? তখন আমরা খুব সাবধানে চলি, কারণ তখন আমাদের লোকসানের পালা।'

'ও, তাই! আচ্ছা, যখন তুমি ঠিক জানতে পারো, যেমন ড্যাফোডিলের বেলায় জেনেছিলে, তখন তুমি কী করে বোঝো যে এতে ভুল হবে না?'

পল একটু কেমন-কেমন করে বললে, 'কী যেন, তা জানি না। তবে এটা জানি যে এতে আর ভুল নেই।'

ব্যাসেট আবার বললে, 'স্বর্গ থেকে কেউ এসে যেন বলে যায়।'

মামা বললেন, 'তাই বটে!'

মুখে যাই বলুন, পার্টনার তিনি হলেন। লেজরের দৌড়ের সময় লাইভলি

স্পার্ক সম্বন্ধে পল 'ঠিক' জানতে পারলো—অথচ ও-ঘোড়ার বিশেষ নাম-ডাক নেই। পল হাজার পাউণ্ড না ধরে ছাড়লোই না। ব্যাসেট পাঁচ শো ধরলো, অস্কার ক্রেসওয়েল দুশো। লাইভলি স্পার্ক প্রথমে এলো, এক টাকায় দশ টাকা দিলো সে। পল এখন দশ হাজার পাউণ্ডের মালিক।

'দেখলে তো,' পল বললে, 'আমি ওর সম্বন্ধে ঠিক জেনেছিলাম।'

অস্কার ক্রেসওয়েলও দু হাজার পাউণ্ড ঝোঁটিয়ে আনলেন।

'পল! ব্যাপারটা আমার বড়ো ভালো লাগছে না।'

'ভালো না-লাগবার কিছু নেই, মামা। হয়তো এর পরে অনেকদিন পর্যন্ত আর ঠিক জানতে পারবো না।'

'কিন্তু তুমি এত টাকা দিয়ে কী করবে?'

'বা রে, আমি তো মা-র কথা ভেবেই আরম্ভ করেছিলাম। মা বললেন তাঁর ভাগ্য নেই, বাবার কিনা কপাল মন্দ, তাই মা-রও কপাল মন্দ। আমি ভাবলাম যে আমার যদি কপাল ভালো হয়, তাহলে হয়তো বাড়িতে আর ফিশফিশানি হবে না।'

'কিসের ফিশফিশানি?'

'আমাদের বাড়ির। বিশ্রী লাগে বাড়িটা—সব সময় ফিশফিশ, ফিশফিশ।'

'বাড়িটা ফিশফিশ করে কিছু বলে নাকি? তার মানে?'

পল হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললে, 'মানে—মানে—কী যেন, আমি জানিনে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে টাকার টানাটানি লেগেই আছে, তা তুমি জানো মামা।'

'জানি রে, জানি।'

'লোকেরা মা-র কাছে বিল পাঠায় তা তো জানো?'

'তাও জানি।'

'তখন বাড়িটা ফিশফিশ আওয়াজে ভরে যায়—কারা যেন পিছন থেকে

ঠাট্টা করে হাসছে। বিশ্রী লাগে, ভীষণ খারাপ লাগে। আমি ভাবলুম আমার যদি কপাল ভালো হয়—'
'তাহলে তুমি এটা থামাতে পারো,' মামা তার কথা শেষ করলেন।
পল কিছু বললে না, বড়ো-বড়ো নীল চোখ মেলে মামার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে চোখ থেকে যেন একটা হিংস্র হিম আগুন ঠিকরে পড়ছে।
মামা বললেন, 'বেশ! তাহলে এ-টাকা নিয়ে কী করবো আমরা?'
পল বললে, 'আমার যে কপাল ভালো, মা-র তা জেনে কাজ নেই।'
'কেন রে?'
'মা আমায় বকবেন।'
'না, না, বকবেন কেন?'
পল গা মোচড়াতে-মোচড়াতে বললে, 'না, না, মা-র জেনে কাজ নেই।'
'বেশ তাহলে। তাকে না-জানিয়েই ব্যবস্থা করতে হবে।'
ব্যবস্থা সহজেই হলো। মামার কথামতো পল তাঁর হাতে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিলে। তিনি সেটা দিলেন বাড়ির উকিলকে। উকিল পলের মা-কে চিঠি লিখে জানালেন যে কোনো আত্মীয় তাঁর হাতে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিয়েছেন—টাকাটা মা-কে পাঁচ কিস্তিতে দেয়া হবে। আগামী জন্মদিন থেকে শুরু করে পাঁচ বছর প্রত্যেক জন্মদিনে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পাবেন।
অস্কার-মামা বললেন, 'প্রত্যেক জন্মদিনে এক হাজার পাউণ্ড উপহার! মন্দ না। তবে পাঁচ বছর পরে এখনকার চেয়েও বেশি দুঃখে না পড়ে, তাহলেই হয়।'
পলের মা-র জন্মদিন নভেম্বর মাসে। সম্প্রতি বাড়িটার 'ফিশফিশানি' অত্যন্ত বেশি বেড়ে গিয়েছিলো; এত যে তার কপাল ভালো, তবু পলের আর সহ্য হয় না। হাজার পাউণ্ডের খবর নিয়ে চিঠি যখন আসবে মা তখন কেমন করেন, তা দেখবার জন্য পল মনে-মনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

নিমন্ত্রিত কেউ না থাকলে পল আজকাল তার মা-বাবার সঙ্গেই খায়, নার্সের রাজত্ব সে ছাড়িয়ে এসেছে। মা প্রায় রোজই শহরে যান। কাপড়-চোপড়ের ডিজাইনে তাঁর যে একটু হাত আছে সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করে এক বন্ধুর স্টুডিওতে তিনি গোপনে কাজ নিয়েছিলেন। বন্ধুটি এক মস্ত কাপড়চোপড়ের দোকানের প্রধান 'আর্টিস্ট'। খবর-কাগজের বিজ্ঞাপনের জন্য রেশমে, চুমকিতে, জানোয়ারের চামড়ায় সজ্জিত নারী-দেহ আঁকা তার কাজ। মেয়েটির বয়স অল্প, কিন্তু বছরে অনেক হাজার পাউণ্ড তার রোজগার অথচ পলের মা-র কয়েক শো পাউণ্ডের বেশি কিছুতেই হয় না। এতেও তিনি মনে-মনে ভারি অখুশি। যে-কোনো বিষয়ে একেবারে পয়লা নম্বর হওয়া তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না—কাপড়ের বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকাতেও না।

জন্মদিনের সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে তিনি নিচে নামলেন। তিনি যখন চিঠিপত্র পড়ছেন, পল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। উকিলের চিঠিটি তার চেনা। মা যখন সেটি পড়ছেন, তাঁর মুখ আরো শক্ত হয়ে গেলো, আরো ভাবলেশহীন। তারপর তাঁর ঠোঁটের কাছটায় একটা কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ফুটে উঠলো। অন্যান্য চিঠিপত্রের তলায় চিঠিটি তিনি লুকিয়ে ফেললেন—সে-বিষয়ে একটি কথা বললেন না।

পল জিগগেস করলে, 'মা, তোমার জন্মদিনে ডাকে কিছু ভালো জিনিস আসেনি?'

'এসেছে—নেহাৎ মন্দ না,' অন্যমনস্কভাবে মা জবাব দিলেন। আর কিছু না বলে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

বিকেলে এলেন অস্কার মামা। এসে বললেন যে পলের মা উকিলের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন যে পুরো পাচ হাজার একসঙ্গে পেলে তাঁর ভালো হয়। কেননা তাঁর দেনা বিস্তর।

পল জিগগেস করলে, 'তুমি কী বলো মামা?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'তাহলে মা টাকা নিয়েই নিন। আমাদের আরো হবে।'

মামা বললেন, 'বাপু হে, হাতে একটা পাখি, আর ঝোপে দুটো! ভেবে দ্যাখো।'

'তা আর কী হয়েছে। আমি আবার "ঠিক" জানতে পারবো—হয় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল, নয় লিঙ্কনশায়ার, নয় ডার্বি। একটা-না-একটা জানবোই।'

অস্কার-মামা চুক্তি সই করলেন; পলের মা একসঙ্গে পাঁচ হাজার পেলেন। তারপর ভারি অদ্ভুত এক কাণ্ড হলো। বাড়ির চাপা-চাপা ভূতুড়ে আওয়াজগুলো হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেলো—বসন্তের সন্ধ্যায় ব্যাঙের কনসার্টের মতো। বাড়িতে নতুন আসবাব এসেছে, পলের জন্য একটি মাস্টার এসেছেন। সামনের শরতে সত্যি-সত্যি ঈটনে যাচ্ছে, তার বাবাও সেখানে পড়েছেন। শীতকালে আসছে ঝুড়ি-ঝুড়ি ফুল: পলের মা যে-বিলাসিতায় অভ্যস্ত, তার পূর্ণ বিকাশ যেন এতদিনে হলো। তবু বাড়ির মধ্যে সেই চাপা আওয়াজ, সেই ফিশফিশানি, মিমোসা পাতা আর বাদামগুচ্ছের পিছন থেকে, রামধনু-রঙিন রাশি-রাশি কুশানের তলা থেকে, যেন একটা উচ্ছ্বাসের মত্ততায় গলা ছেড়ে চীৎকার করতে লাগলো, 'চাই! চাই! আরো চাই! আরো টাকা চাই! চা—ই! টাকা চাই! এখনি চাই, এক্ষুনি চাই, আরো, আরো চাই! আরো! আরো!'

পল ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো।

মাস্টারের কাছে সে লাটিন গ্রীক পড়ছে, কিন্তু তার আসল নিবিড় মুহূর্তগুলো কাটছে ব্যাসেটের সঙ্গে। গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল হয়ে গেছে, সে 'ঠিক' জানেনি। হেরেছে এক শো পাউণ্ড। গ্রীষ্মকাল আসছে, লিঙ্কনের কথা ভেবে তার যন্ত্রণার শেষ নেই। কিন্তু লিঙ্কনের বেলায় সে 'জানলো' না, পঞ্চাশ পাউণ্ড খোওয়ালো। সে কেমন অদ্ভুত হয়ে গেলো, চোখ

পাগলের মতো, তার ভিতরে একটা বিস্ফোরণ যেন হলো বলে। অস্কার-মামা বললেন, 'থাক পল, এ নিয়ে আর ভেবো না।' কিন্তু মামার কথা যেন সে শুনতেই পেলো না। বার বার বললে, 'ডার্বি আমাকে জানতেই হবে, ডার্বি আমাকে জানতেই হবে।' তার বড়ো-বড়ো নীল চোখে যেন পাগলামির আগুন লেগেছে।

মা লক্ষ্য করলেন যে ছেলে যেন কী নিয়ে বড়ো বেশি উত্তেজিত। তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ভারি হয়ে এলো, ছেলের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে বললেন, 'পল, একবার সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে এসো না। এখুনি তো যাওয়া ভালো—দেরি করে কী লাভ ?'

ছেলে তার উদ্দাম নীল চোখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'ডার্বির আগে আমি যেতে পারবো না। না, পারবো না।'

'কেন ?' ছেলের বিরোধিতায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এলো, 'কেন পারবে না ? তুমি যদি ডার্বির দৌড় দেখতেই চাও, ওখান থেকেও তোমার অস্কার-মামার সঙ্গে গিয়ে দেখতে পারো। এখানে বসে থেকে কী হবে। তাছাড়া ঘোড়দৌড় নিয়ে তোমার এত মাতামাতি আমার ভালো লাগে না। ভালো নয় লক্ষণ। আমার বাপের বাড়ির সকলেই জুয়াড়ি—তাতে কত যে ক্ষতি হয়েছে তা বড়ো-না-হলে বুঝবে না, কিন্তু এটুকু জেনে রাখো যে ক্ষতি হয়েছে। ব্যাসেটকে দেখছি ছাড়িয়েই দিতে হবে—আর তুমি যদি আর একটু সামলে না চলো তাহলে অস্কার-মামাকেও বলে দেবো তোমার কাছে আর রেসের গল্প না করতে। সমুদ্রের ধারে যাও, এ-সব ভুলে যাও। শরীরের কী-হাল হয়েছে দেখছো না।'

'তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, মা, কিন্তু ডার্বির আগে এখান থেকে আমাকে যেতে বোলো না।'

'কোত্থেকে যেতে বলবো না ? এই বাড়ি থেকে ?'

'হ্যাঁ।'

'পাগলা ছেলে, এ-বাড়ির উপর তোর আবার মায়া পড়লো কবে থেকে ? বাড়িটা তোর ভালো লাগে তাও তো জানতাম না।'

পল চুপ করে মা-র দিকে তাকিয়ে রইলো। গোপনের মধ্যেও গোপন কথা আছে তার; এমন কথা আছে যা সে অস্কার-মামাকে বলেনি, ব্যাসেটকেও না।

মা মনস্থির করতে না পেরে বিরস মুখে একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশ। ডার্বির আগে যেতে না চাও যেয়ো না। কিন্তু অমন করে শরীর খারাপ করলে চলবে না। ঘোড়দৌড় নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করবে না তো ?'

পল অত্যন্ত সহজ ভাবে বললে, 'না, না। ও নিয়ে বেশি ভাববোই না আমি। তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, মা। আমি যদি তুমি হতাম, আমি কিন্তু দুশ্চিন্তা করতাম না।'

'আমি যদি তুমি হতাম আর তুমি যদি আমি হতে! তাহলে আমরা কী করতাম বলো তো ?'

'কিন্তু দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই মা—কেমন তো ?'

মা ক্লান্তভাবে বললেন, 'দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই জানতে পারলে তো খুশিই হই।'

'কিন্তু তাই যে! কারণ তো নেই-ই। তুমি তো জানো যে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই—জানো না, মা ? না জানলেও জানা উচিত তোমার।' পল জোর করে বলতে লাগলো।

'উচিত বুঝি ? আচ্ছা, ভেবে দেখবো।'

পলের পরম গোপন কথাটি তার নামহীন কাঠের ঘোড়া। নার্সের শাসন, গাভার্নেসের শাসন থেকে মুক্তি পাবার পর সে বাড়ির উপরের তলায়, তার শোবার ঘরে কাঠের ঘোড়াটিকে নিয়ে গিয়েছিলো। মা বলেছিলেন, 'তুমি এত বড়ো হলে, এখন আর কাঠের ঘোড়া দিয়ে কী করবে ?'

'জানো মা ওকে আমার খুব ভালো লাগে। যতদিন না আমার আসল ঘোড়া হয়, ততদিন যে-কোনোরকম একটা জানোয়ার কাছাকাছি থাকা তো ভালোই।'

ছেলের অদ্ভুত কথা শুনে মা একটু হেসেছিলেন। 'ওর সঙ্গে তোর খুব ভাব বুঝি?'

'হ্যাঁ মা, ও খুব ভালো, আর ওর জন্য আমার একটুও একা-একা লাগে না।'

তখন থেকে ঘোড়াটি পলের শোবার ঘরে আশ্রয় পেয়েছে। তেমন চকচকে ঝকঝকে সে আর নেই, তার ভাবখানা এই রকম যেন ঠিক ছোটবার মুখে কেউ তাকে থামিয়ে দিয়েছে।

ডার্বি যত কাছে এলো, পলের তীব্র প্রখর ভাব ততই বাড়তে লাগলো। কোনো কথাই যেন তার কানে যায় না, অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছে, তার চোখ যেন অন্য-কারো চোখ। তার কথা ভেবে হঠাৎ মাঝে-মাঝে তার মা-র ভারি ভয় হতো; মাঝে-মাঝে খানিকক্ষণ ছেলের জন্য তাঁর এমন দুশ্চিন্তা হতো যেন ব্যথায় বুক ভেঙে যাবে। ইচ্ছে হতো তক্ষুনি ছুটে তার কাছে যায়—ভালো আছে তো সে?

ডার্বির দু রাত্রি আগে তিনি মস্ত একটা পার্টিতে শহরে গেছেন, হঠাৎ সেই দুশ্চিন্তার ঢেউ তাঁর মনে এসে লাগলো। তাঁর ছেলে, তাঁর প্রথম সন্তান—ভালো আছে তো? তাঁর হৃৎপিণ্ড কেউ যেন আঁকড়ে ধরেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। প্রাণপণে এই দুর্ভাবনার সঙ্গে তিনি যুঝলেন, কেননা সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁর বিশ্বাস ছিলো প্রবল। কিন্তু পারলেন না, হার মানতে হলো। নাচ থেকে উঠে নিচে নেমে এলেন টেলিফোন করতে। এত রাত্রে টেলিফোন পেয়ে বাচ্চাদের গাভার্নেস তো অবাক।

'মিস উইলমট, বাচ্চারা সব ভালো আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো আছে সবাই।'

'মাস্টার পল ? সে ভালো আছে ?'

'সে তো অনেকক্ষণ শুতে গেছে। বেশ ভালোই তো তাকে দেখলাম। একবার উপরে গিয়ে দেখে আসবো ?'

'না, থাক,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা বললেন। 'থাক। ঠিক আছে। জেগে বসে থেকো না। আমরা শিগগিরই বাড়ি ফিরছি।' ছেলের নিভৃত সময়টায় কেউ তাকে বিরক্ত করে তা তাঁর ইচ্ছা নয়।

'আচ্ছা,' বলে গাভার্নেস টেলিফোন রেখে দিলে।

পলের মা-বাবা যখন গাড়ি করে বাড়ি ফিরলেন তখন রাত প্রায় একটা। চারদিক সব চুপচাপ। মা নিজের ঘরে গিয়ে গায়ের শাদা ফার-কোটটি খুলে ফেললেন। দাসীকে বলে রেখেছিলেন সে যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে। নিচে শোনা গেল স্বামী হুইস্কির সঙ্গে সোডা মেশাচ্ছেন।

বুকে তাঁর অদ্ভুত অসহ্য ভার। পা টিপে-টিপে তিনি উপরে ছেলের ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। নিঃশব্দে পার হলেন উপরের বারাণ্ডা। একটা চাপা আওয়াজ না ? কিসের ?

তাঁর দেহের পেশীগুলো যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন। অদ্ভুত ভারি একটা শব্দ, যেমন ভারি তেমনি চাপা। তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন আর চলে না। একটা শব্দহীন স্বর—প্রবল, গতিশীল। যেন মস্ত একটা-কিছু তীব্র অথচ নিঃশব্দ গতিতে ছুটছে। কী ? কী ? হে ভগবান, কিসের শব্দ ? কিসের শব্দ তা কি তিনি জানেন না ? কিসের শব্দ তা তো তিনি জানেন। তিনি জানেন। অথচ ঠিক চেনা যাচ্ছে না। না, বুঝতে পারছেন না তো ! এদিকে ওটা চলেছে তো চলেইছে, যেন দুরন্ত একটা পাগলামি ছাড়া পেয়েছে।

ভয়ে দুশ্চিন্তায় জমে গিয়ে তিনি আস্তে দরজার হাতল ঘোরালেন।

অন্ধকার ঘর। তবু তিনি দেখতে পেলেন, শুনতে পেলেন, জানলার কাছে ফাঁকা জায়গাটায় কী-একটা জিনিস যাচ্ছে আর আসছে,

আসছে আর যাচ্ছে। ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ স্যুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। সবুজ পাজামা পরে তাঁর ছেলে কাঠের ঘোড়ায় চেপে বসেছে, পাগলের মতো ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। আলোর ঝলক হঠাৎ তার উপরে পড়লো—কাঠের ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় সে চলে যাচ্ছে! আলোর ঝলক হঠাৎ মা-র উপর পড়লো, ফর্সা-সোনালি, পরনে পাৎলা-সবুজ আর স্ফটিক রঙে মেশানো কাপড়, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে।

'পল!' তিনি বলে উঠলেন, 'পল! তুমি করছো কী?'

'মালাবার!' প্রবল বিকৃত স্বরে পল চীৎকার করে উঠলো, 'মালাবার!' পলের চোখ একটি অচেতন উন্মত্ত মুহূর্তে মা-র চোখের উপর পড়ে জ্বলে উঠলো। তারপর ঘোড়ার দুর্দান্ত দৌড় যেই থামলো, সঙ্গে-সঙ্গে সে সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেলো, আর তার মা উৎপীড়িত মাতৃত্বের আকস্মিক বন্যায় আচ্ছন্ন হয়ে ছুটে গেলেন ছেলেকে তুলে ধরতে।

কিন্তু পলের চৈতন্য নেই। অচৈতন্য হয়ে সে পড়ে পড়ে দুরন্ত জ্বরে জ্বলতে লাগলো। বিছানায় ছটফট করতে-করতে সে কেবলই বকছে। মা তার পাশে বসে আছেন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে।

'মালাবার! মালাবার! ব্যাসেট, ব্যাসেট, আমি জেনেছি! মালাবার!'

এই বলে পল অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে, আর মাঝে মাঝে চেষ্টা করছে তার প্রেরণার উৎস সেই কাঠের ঘোড়ার উপর চেপে বসতে।

মা-র হৃৎপিণ্ড জমে তুষার হয়ে গেছে। তারই মধ্যে তিনি জিগগেস করলেন, 'কী বলছে ও? মালাবার কী?'

বাবা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'জানি না।'

মা তার ভাইকে জিগগেস করলেন, 'ও মালাবার-মালাবার বলছে কেন? মালাবার কী?'

অস্কার জবাব দিলেন, 'মালাবার একটা ঘোড়া। ডার্বিতে দৌড়বে।'

অস্কার ক্রেসওয়েল ব্যাসেটকে কথাটা না-বলে পারলেন না। নিজেও মালাবারের উপর হাজার পাউণ্ড ধরলেন : পেলে চৌদ্দ গুণ পাবেন।

অসুখের তৃতীয় দিনটা সংকটময় হয়ে এলো : এইটে মোড় ফেরার সময়। পল তার লম্বা-লম্বা কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা বালিশের উপর রেখে অবিশ্রান্ত ছটফট করছে। সে ঘুমোচ্ছেও না, তার জ্ঞানও ফিরে আসছে না, তার চোখ দুটো নীল পাথরের মতো। মা বসে আছেন তার কাছে, মনে হচ্ছে তাঁর হৃৎপিণ্ড আর নেই, যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিলো সেখানে একটা পাথর ভারি হয়ে বসেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় অস্কার ক্রেসওয়েল আর এলো না, কিন্তু ব্যাসেট খবর পাঠালো সে কি এক মিনিটের জন্য উপরে আসতে পারে? প্রথমটা পলের মা-র খুব রাগ হলো—খামকা এসে রোগীকে বিরক্ত করা! তারপর কী মনে করে রাজী হলেন। ও তো একরকমই আছে—হয়তো ব্যাসেট ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারবে।

বেঁটে মানুষটি, ছোট্ট একটু ব্রাউন রঙের গোঁফ, চোখা-চোখা ব্রাউন চোখ, পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে পলের মা-র উদ্দেশে তার কাল্পনিক টুপিতে হাত ঠেকালো, তারপর নিঃশব্দে বিছানার ধারে এসে চকচকে ছোটো-ছোটো চোখে অশান্ত মুমূর্ষু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

চুপে-চুপে সে ডাকলো,'মাস্টার পল! মাস্টার পল! তুমি ঠিক বলেছো—মালাবার বাজিমাত করেছে, সাফ বাজিমাত। তুমি যা বলেছিলে আমি তা-ই করেছি। সত্তর হাজার পাউণ্ডের কিছু বেশি তুমি জিতেছো; এখন তোমার সবসুদ্ধ আছে আশি হাজার পাউণ্ডেরও বেশি। মাস্টার পল, মালাবার ঠিক পয়লা এসেছিলো, ঠিক এসেছিলো।'

'মালাবার! মালাবার! আমি মালাবার বলেছিলাম তো? আমার কপাল খুব ভালো, না মা? আমি তো মালাবার বলেছিলাম, ঠিক বলেছিলাম! আশি হাজার পাউণ্ডেরও বেশি! আমি জানতুম—আমি যে

জানি তা আমি জানতুম! মালাবার ঠিক এসেছিলো। আমার ঘোড়া আমি ছুটিয়েই চলি, যতক্ষণ না ঠিক জানতে পারি ছুটিয়েই চলি। আর আমি যখন ঠিক জানতে পারি তখন তুমি যত ইচ্ছে ধরতে পারো, ব্যাসেট, যত ইচ্ছে ধরতে পারো। ব্যাসেট, তোমার যত আছে সব ধরেছিলো তো?'

'মাস্টার পল, আমি এক হাজার ধরেছিলাম।'

'মা, মা, তোমাকে আমি কথাটা কখনো বলিনি। আমার ঘোড়ায় চড়ে একবার যদি সেখানে পৌছতে পারি, তাহলে আর ভয় কী! তাহলে আমি জানতে পাই, একেবারে ঠিক জানতে পাই! মা, তোমাকে আমি কখনো বলিনি, কিন্তু আমার কপাল ভালো, আমি ভাগ্যবান!'

মা বললেন, 'না বাছা, কখনো বলোনি।'

ছেলেটা সেই রাত্রে মারা গেলো।

সে যখন মরে বিছানায় পড়ে আছে, তখনই তার মা শুনতে পেলেন তাঁর ভাই তাঁকে বলেছেন, 'হেস্টর, তোমার জমার খাতায় আশি হাজার পাউণ্ডেরও বেশি, আর তোমার খরচের খাতায়—ঐ ছেলে! আহা বেচারা! কিন্তু কে জানে—যেখানে ওকে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে বাজিমাত করতে হয় সেখান থেকে সরে পড়ে ও বোধ হয় ভালোই করলো।'

—বুদ্ধদেব বসু

সূর্য

ডাক্তারদের উপদেশ, 'ওঁকে সূর্যের আলোর দেশে নিয়ে যান।'

তার নিজের সূর্যের ওপর তেমন বিশ্বাস নেই। তবু সাগর পারে যখন তাকে রওনা করে দেওয়া হল তখন সে আপত্তি করলে না। সঙ্গে গেল তার ছেলেটি, তার মা ও একজন নার্স।

জাহাজ ছাড়ল মাঝ রাত্রে। তার আগে দুঘণ্টা তার স্বামী তার সঙ্গেই ছিল। ছেলেটিকে তখন শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, যাত্রীরা জাহাজে আসতে শুরু করেছে। গভীর অন্ধকার রাত্রি, হাড্‌সান্‌ নদীর জল সেই অন্ধকারে গাঢ় কালির মতো দুলছে। তার ওপর আলোর ছোট ছোট ধারা যেন ছিটিয়ে পড়েছে। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল: এই তো সমুদ্র! সবাই যা ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর। কত স্মৃতি যে এর মধ্যে মিশে আছে, কেউ জানে না। সেই মুহূর্তে সমুদ্র শাশ্বত কালের প্রলয় নাগের মতো একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল।

স্বামী তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, 'সত্যি, এই বিদায় নেওয়া ব্যাপারটা ভারি বিশ্রী, আমার এসব কখনো ভালো লাগে না।' স্বামীর কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা, উদ্বেগ এবং তারি সঙ্গে হতাশার আশার সুর।

মেয়েটি নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বললে, 'আমারও না।' তার মনে পড়ল, পরস্পরের প্রতি কি বিতৃষ্ণা নিয়েই না তারা ছাড়াছাড়ির জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। এই বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে তার মনটা বুঝি একটু নরম হয়েই এসেছিল, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষতটা তাতে শেষ পর্যন্ত আরও গভীর হয়েই উঠল।

তারা তাদের ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে চাইলে, বাপের চোখ সজল হয়েও

উঠল। কিন্তু চোখ একটু সজল হয়ে ওঠা না ওঠায় কিছু আসে যায় না। যাতে আসে যায় তা হল, বর্ষব্যাপী, জীবনব্যাপী বজ্রকঠিন অভ্যাসের ছন্দ—অন্তর্লীন শক্তির গভীর আবর্তন।

তাদের দুজনের জীবনে, শক্তির এই আবর্তন পরস্পরের বিরোধী। দুই বিভিন্ন ছন্দের যন্ত্রের মতো তারা তাই পরস্পরকে শুধু ধ্বংসই করেছে।

যারা জাহাজের যাত্রী নয়, খালাসীরা এবার চীৎকার করে তাদের ডাঙ্গায় নেমে যেতে বলছে, শোনা গেল।

মেয়েটি বললে, 'মরিস, এবার তুমি নেমে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, ওর এখন ডাঙ্গায় নামার পালা, আর আমার অকূলে পাড়ির।

জাহাজ ধীরে ধীরে কূল থেকে সরে যাচ্ছে, মরিস জেটির ওপর থেকে রুমাল ওড়াচ্ছে—জেটির মধ্য রাত্রের বিজনতায় সহস্রের মধ্যে একজন।

আলোর সার-বসানো বড় বড় থালার মতো খেয়া নৌকোগুলো তখনো হাড্‌সান্‌ নদীর ওপর দিয়ে পারাপার করছে। অন্ধকারের একটা কালো গহ্বর দেখা যাচ্ছে—ঐটেই বোধ হয় ল্যাকাওয়ান্না স্টেশন।

জাহাজ মন্থর ভাবে ভেসে চলেছে, হাড্‌সান্‌ যেন আর ফুরোয় না। অবশেষে তারা বাঁকটা ঘুরে গেল। ব্যাটারির নাতিপ্রচুর আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। 'লিবার্টি' যেন বদ্‌মেজাজে তার মশালটা তুলে ধরেছে। সাগরের ঢেউয়ের আভাস এবার পাওয়া যাচ্ছে।

আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুর মতো সমস্ত আটলান্টিকের ম্লান বিবর্ণ রূপ। তবু শেষ পর্যন্ত সে সূর্যের দেশে এসে পৌছল। এমন কি নীলতম সমুদ্রের ধারে একটা বাড়িও তার জুটল। সে বাড়িতে বিরাট বাগান, বাগান কেন দ্রাক্ষাকুঞ্জই তাকে বলা যায়। ধাপে ধাপে শুধু আঙ্গুর আর জলপাই-বীথি সমুদ্র-তীর পর্যন্ত নেমে গেছে। আর সে বাগানে কত নিরালা গোপন জায়গা। বিদীর্ণ মাটির গহ্বরে লেবু গাছের কুঞ্জ, কোথাও বা লুকানো সবুজ জলের কুণ্ড। হঠাৎ কোথাও বা

ছোট একটা গুহা থেকে একটা ঝরনা বেরিয়ে এসেছে। গ্রীকরা আসবার আগে এখানেই হয়তো আদিম 'সিকিউল'রা জলপান করত। প্রাচীন একটা কবরে ছাইরঙা একটা ছাগল ডাকছে। বাতাসে 'মিমোসা'র গন্ধ, আর দূরে আগ্নেয়গিরির চূড়ায় তুষার-পুঞ্জ।

সবই সে দেখল, একদিক দিয়ে এসবে মনটা কতকটা জুড়িয়ে যায়। তবু এ সবই বাইরের, সত্যই এসবের প্রতি তার কোনো টান নেই। সে যা ছিল এখনো তাই আছে—সেই জ্বালা, সেই ব্যর্থতা, সেই সত্যকার কিছু অনুভব করবার অক্ষমতা। ছেলেটির ওপরও সে বিরক্তি বোধ করে। তার জন্যেও তার মনের শান্তি যেন নষ্ট হয়। এই ছেলের দায়িত্বই তার অত্যন্ত কুৎসিত, অত্যন্ত দুঃসহ লাগে, যেন তার প্রত্যেক নিঃশ্বাসের জন্যেও তাকে দায়ী থাকতে হবে। এই দায় তার পক্ষেও যেমন যন্ত্রণা ছেলেটির পক্ষেও তাই। আর সবাইও এই এক কারণে উত্যক্ত হয়ে ওঠে।

মা একদিন বললেন, 'তোমার মনে আছে তো জুলিয়েট, ডাক্তার তোমায় সব কাপড়-চোপড় খুলে রোদে শুয়ে থাকতে বলেছেন। কই, ডাক্তারের কথা মতো কাজ করছ কই?'

জুলিয়েট ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'করবার মতো অবস্থা হলেই করব। তোমরা কি আমায় মেরে ফেলতে চাও?'

'তোমায় মেরে ফেলতে? মোটেই না, শুধু তোমার ভালো করতেই চাই।'

'দোহাই তোমাদের, আর আমার ভালো করে তোমাদের দরকার নেই।'

মা শেষ পর্যন্ত রাগে-দুঃখে তাকে ছেড়ে চলেই গেলেন।

সমুদ্র শাদা হয়ে গেল, তারপর আর তা দেখাই গেল না, শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! সূর্যের উদ্দেশে গড়া সেই বাড়ি হিমের মতো ঠাণ্ডা।

তার পর একদিন আবার সমুদ্রের শেষ প্রান্ত উদ্ভাসিত করে উঠল গলিত

উলঙ্গ সূর্য। বাড়িটা দক্ষিণ-পূর্ব-মুখী। জুলিয়েট বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সূর্য ওঠা দেখল। এমন সূর্যোদয় সে যেন কখনো দেখেনি। দিক্‌প্রান্তে সাগর সীমায় দাঁড়িয়ে উলঙ্গ সূর্য রাত্রিবাস ছেড়ে ফেলছে। এই দৃশ্য তার কাছে অপূর্ব। (!)

তাই গোপনে তার মনে নগ্নদেহে রৌদ্র-স্নানের বাসনা জেগে উঠল। অতি গোপনে সেই বাসনা সে মনে পোষণ করে রাখলে।

কিন্তু বাড়ি থেকে, মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে গিয়ে সূর্যকে সে অভিনন্দিত করতে চায়। তবে এদেশে লুকিয়ে কোথাও যাওয়া সহজ নয়। প্রতি জলপাই গাছের এখানে যেন চোখ আছে, মানুষের দৃষ্টি কোথাও এড়ান যায় না।

অবশেষে একটা জায়গা সে খুঁজে পেল। বড় বড় ফণীমনসা জাতের গাছে ঢাকা পাহাড়ের একটা খাঁজ, সমুদ্রের ওপর ঝুলে আছে। ফণী-মনসার এই সব ঝোপের ভেতর থেকে নীল আকাশ ছুঁয়ে একটা সরল, ঋজু 'সাইপ্রাস' উঠেছে, সমুদ্রের পাহারাদারের মতো। অথবা মনে হয়, সে যেন একটা বিরাট রূপালি দীপাধার, আলোর বদলে অন্ধকার যার শিখা—যেন পৃথিবীর প্রগাঢ় বেদনার উদ্ধত অঙ্গুলি-সঙ্কেত।

জুলিয়েট সেই দেবদারু তলায় বসে সব আবরণ খুলে ফেললে। তার চারদিকে বীভৎস ও অপরূপ ফণীমনসার কাঁটা-ঝোপের প্রাচীর। সেখানে বসে সে তার হৃদয় সূর্যের দিকে উন্মুক্ত করে দিলে। তবু বেদনার দীর্ঘশ্বাস একবার যেন পড়ল—এমন করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হওয়ার নিষ্ঠুরতার জন্যে বেদনা।

সূর্য সদর্পে নীলাকাশ পার হতে হতে অজস্র আলোর ধারায় তাকে স্নান করিয়ে গেল। সেই তার বুক, কোন দিন যা পূর্ণ বিকশিত হবে না বলে মনে হয়েছে, তার ওপর সমুদ্রের কোমল বাতাসের স্পর্শ সে অনুভব করলে। তবু সূর্যের অনুভূতি সেখানে এখনো যেন নেই।

পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই শুকিয়ে যাওয়া যেন তার নিয়তি। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই বুকের মধ্যে সূর্যকে যেন সে সত্যই অনুভব করতে পারছে মনে হল, প্রেমের চেয়েও তপ্ত সে অনুভূতি ; তার শিশুর হাতের আদর, প্রথম দুগ্ধ-সঞ্চারের অনুভূতির চেয়েও তীব্র। সত্যই তপ্ত রৌদ্রপায়ী দীর্ঘ শুভ্র দ্রাক্ষাফলের মতো এখন যেন তার রূপ। সম্পূর্ণ আবরণমুক্ত হয়ে সে সূর্যালোকে শুয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে আঙুলের ফাঁক দিয়ে কেন্দ্রীয় সূর্যকে দেখবার চেষ্টা করে, সেই নিটোল স্পন্দিত বহ্নিমণ্ডল, ক্ষণে ক্ষণে যার বিচ্ছুরিত জ্যোতি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মনে হয় নীল বহ্নিমুখ নিয়ে সূর্য যেন তার দিকে চেয়ে আছে, তার সর্বাঙ্গ যেন সে বেষ্টন করে ধরেছে।

চোখ বন্ধ করে সে শুয়ে থাকে। চোখের পাতার ভেতর দিয়ে রক্তাভ সূর্য-শিখা তবু দেখা যায়। এ যেন অসহ্য, চোখের ওপর সে কয়েকটা পাতা কুড়িয়ে ঢাকা দিয়ে দিলে। তার পর আবার শুয়ে রইল নিশ্চিন্ত ভাবে, সে যেন শুভ্র কোনো একটা ফল, সূর্যালোকে সোনার মতো যাকে পরিপক্ক হয়ে উঠতে হবে।

সূর্য তার দেহের মধ্যে অস্থি পর্যন্ত ভেদ করে প্রবেশ করছে সে টের পায়, শুধু অস্থি কেন, তার চিন্তায় পর্যন্ত যেন সূর্যের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ। হৃদয়ের গভীর সব আবেগ যেখানে তার জট পাকিয়ে গিয়েছিল, সূর্যের উত্তাপে সেখানে যেন সমস্ত জট খুলতে শুরু করে। যেখানে তার মনে চিন্তার ধারা রক্তের মতো জমাট বেঁধে গিয়েছিল, সেখানেও সূর্য যেন ধীরে ধীরে সব গলিয়ে দেয়। অন্তর, বাহির সমস্ত যেন তার তপ্ত হয়ে উঠছে। কি যে তার মধ্যে হচ্ছে তা বুঝতে পেরেই বিস্ময়ে সে যেন অভিভূত হয়ে থাকে। তার ক্লান্ত হিম-শীতল হৃদয় এত দিনে গলে যাচ্ছে, গলতে গলতে বাষ্পাকারে মিশে যাচ্ছে।

পোশাক পরবার পর আবার একবার শুয়ে পড়ে সে খানিকক্ষণ

'সাইপ্রাস' গাছটার মাথার দিকে চেয়ে থাকে। বাতাসে সরু লিক্‌লিকে ডগাটা এধার থেকে ওধারে দুলছে সে দেখতে পায়, আর টের পায় মহিমান্বিত সূর্য সগৌরবে আকাশ পার হয়ে চলেছে।

বাড়িতে যখন সে ফেরে তখন প্রখর সূর্যালোকে চোখ তার ধাঁধিয়ে গেছে, কেমন যেন সে প্রায়ান্ধ, বিহ্বল। তার এই অন্ধতা যেন তার কাছে একটা পরম ঐশ্বর্য ; তার এই তপ্ত গাঢ়, অর্ধসচেতন আচ্ছন্নতা যেন মহামূল্য সম্পদ।

'মা ! মা !' বলে তার ছেলেটি তার দিকে দৌড়ে আসে। তার গলায় পাখির মতো মা-কে পাবার একটা ব্যাকুলতা—মা-কে সে সব সময়ই পেতে চায়। এই প্রথম তার ডাকে জুলিয়েটের তন্দ্রাজড়িত হৃদয় বুঝি আপনা হতে ব্যাকুল আগ্রহে সাড়া দিয়ে ওঠে না। জুলিয়েট নিজেই অবাক হয়ে যায়। ছেলেকে সে কোলে তুলে নেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে হয়, শুধু একটা তুলতুলে এমন মাংসের ডেলা না হয়ে সূর্যের ছোঁয়া পেলে সে সত্যই সজীব ভাবে বেড়ে উঠতে পারত।

ছেলেটি হাত দিয়ে তার গলা আঁকড়ে ধরতে চায়, জুলিয়েটের সেটা মোটেই ভালো লাগে না। তার হাত থেকে গলাটা সে জোর করেই ছাড়িয়ে নেয়। কোনো স্পর্শই সে যেন এখন সহ্য করতে পারবে না। ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সে বলে, 'যাও, রোদ্দুরে গিয়ে খেলা কর।'

ছেলেটির সব পোশাক সে তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলে উলঙ্গ ভাবে তাকে রৌদ্র-তপ্ত বাগানে ছেড়ে দিয়ে আবার বলে, 'রোদে খেলা কর।'

ছেলেটি ভয় পেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে ওঠে। কিন্তু জুলিয়েট তা গ্রাহ্য করে না। তার সমস্ত শরীরে মধুর একটা তপ্ত অবসাদ, মন যেন তার সম্পূর্ণ নির্বিকার। লাল টালিগুলোর উপর দিয়ে সে একটা কমলা লেবু গড়িয়ে দেয়, নরম তুলতুলে পায়ে ছেলেটি টলতে টলতে সেটা

ধরতে ছুটে যায়। কমলা লেবুটা হাতে তুলে নিয়ে সে আবার সেটা ফেলে দেয়, তারপর মার দিকে চেয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে কাঁদবার উপক্রম করে। এমন করে উলঙ্গ করে দেওয়ার জন্যেই সে যেন ভয় পেয়েছে।
জুলিয়েট তাকে ডেকে বললে, 'নিয়ে এস তো কমলাটা, মা-মণিকে কমলাটা এনে দাও।' ছেলের এই ভয় পাওয়া সম্বন্ধে নিজের সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য টের পেয়ে সে সত্যই অবাক হয়ে যায়।
মনে মনে সে বলে, মাটির তলায় যে পোকা কখনো সূর্যের সাক্ষাৎ পায় না, তার মতো ওকে কিছুতেই বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। ও যেন কিছুতেই ওর বাপের মতো না হয়।

নিজের ছেলের দায় সারাক্ষণ তার মনে ভার হয়ে চেপে বসে থাকে, এ দায়িত্ব যেন একটা যন্ত্রনা; যেন তাকে জন্ম দিয়েছে বলেই তার সমস্ত জীবনের জন্যে তাকেই জবাবদিহি দিতে হবে। ছেলের একটু সর্দি হলেও তার মন যেন বিরূপ হয়ে ওঠে, মরমে মরে গিয়ে তার যেন বলতে ইচ্ছে করে: হায় কি সন্তানেরই মা তুমি হয়েছ।
এখন কিন্তু একটা পরিবর্তন তার মধ্যে আসছে। ছেলেটি সম্বন্ধে আর সেই উদ্বেগ তার মনে নেই, ছেলেটিরও তাতে ভালো বই মন্দ হচ্ছে না।
তার সত্তার মধ্যে এখন আর এক চিন্তার আলোড়ন চলছে, সে চিন্তা ভাস্বর সূর্যের, সূর্যের সঙ্গে তার মিলনের। তার সমস্ত জীবন এখন যেন একটা অনুষ্ঠান। ভোর হবার আগেই জেগে উঠে সে বিছানা থেকে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। কখন আকাশের ধূসরতা দূর হয়ে গিয়ে সোনালি রঙে দিকপ্রান্ত রঙীন হয়ে উঠবে তাই সে শুয়ে শুয়ে দেখে। পূর্বাচলে গলিত নগ্ন সূর্য যখন উদিত হয়, কোমল আকাশে তার নীলাভ

শুভ্র জ্যোতি সে বিকিরণ করে, তখন জুলিয়েটের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

তার ভাগ্য ভালো। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়, কখনো সকাল একটু মেঘলা হয়ে থাকে, কখনো সন্ধ্যা একটু ধূসর, তবু সূর্যহীন দিন তার যায় না। প্রায় সব দিনগুলিই শীতের রোদে উজ্জ্বল। ছোট ছোট বন্য ক্রোকাস্‌ ফুলে মাটি এখন ছেয়ে গেছে, চারদিকে বন্য নার্সিসাসের তারার মতো ফুলগুলি ঝোলে।

প্রতিদিন সেই পাহাড়ের ধারে ফনীমনসার ঝোপে 'সাইপ্রাস' গাছটির তলায় সে যায়। এখন সে অনেক চালাক হয়েছে। শুধু একটি ফিকে ধূসর চাদর গায়ে জড়িয়ে চটি পায়ে দিয়ে সে আজকাল সেখানে যায়, যাতে কোনো গোপন নিরালা কোণে এক মুহূর্তে সূর্যালোকে নগ্ন হয়ে সে দাঁড়াতে পারে। ধূসর চাদরের সুবিধা অনেক। একবার ঢাকা দিলেই এক মুহূর্তে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে অনায়াসে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়।

আকাশে সূর্যের অভিযান চলে, আর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেই বিশাল 'সাইপ্রাস' গাছের তলায় সে শুয়ে থাকে। তার দেহের প্রতিটি তন্তু দিয়ে সে যেন এখন সূর্যকে চিনে নিয়েছে। কোথাও এতটুকু হিমেল ছায়া আর তার মধ্যে নেই। আর তার হৃদয়—সেই উদ্বিগ্ন, বিড়ম্বিত হৃদয়, একেবারে যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে; বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই ফুলের মতো, যা সূর্যালোকে ঝরে প'ড়ে শুধু একটি পরিপক্ক বীজাধার ছাড়া আর কোনো চিহ্ন রেখে যায় না।

আকাশের অগ্নিবর্ষি শুভ্র শিখামণ্ডিত, গলিত নীল সূর্যকে সে জানে। সমস্ত পৃথিবীতে সে সূর্য আলো দেয়, কিন্তু নিরাবরণ হয়ে যখন সে শুয়ে থাকে, তখন মনে হয় সূর্যের সমস্ত জ্যোতি তারই উপর যেন কেন্দ্রীভূত।

সূর্যের উপলব্ধি তার জীবনে যত গভীর হয়ে উঠতে থাকে, যত এ বিশ্বাস তার মনে দৃঢ় হয়, যে, সূর্য ও তার অনন্ত কামনার মধ্য দিয়ে তাকে জানে, ততই সাধারণ মানুষের জগত থেকে নিজেকে সে কেমন বিচ্ছিন্ন বোধ করে। মানুষের উপর কেমন একটা ঘৃণাই তার মনে জাগে। তারা যেন মাটির তলার জগতের পোকার মতো, সূর্যের স্পর্শ তারা পায়নি, আদিম মৌলিক ধাতু তাদের মধ্যে নেই।

এমন কি যে সব চাষিরা প্রাচীন পাহাড়ি রাস্তা ধরে প্রতিদিন তাদের গাধাগুলি নিয়ে যাতায়াত করে, গায়ের রঙ তাদের সূর্যের আলোয় ঝলসানো হলেও তাদের অন্তর পর্যন্ত সূর্যের স্পর্শ যেন পৌঁছয়নি। খোলার নিচে নরম শামুকের দেহের মতো তাদের মর্মের মাঝখানে কোথায় যেন কোমল শাদা একটু ভয়ের কেন্দ্র এখনো আছে, যে কেন্দ্রে মানুষের আত্মা মৃত্যু-ভয়ে, জীবনের স্বাভাবিক বহ্নি-দীপ্তির ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। পরিপূর্ণ ভাবে বাইরে আসবার সাহস তার নেই, ভেতরে ভেতরে সব সময়ই সে সঙ্কুচিত। সব মানুষই এই রকম।

কি দরকার মানুষকে মানবার।

মানুষের সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য নিয়ে আজকাল আর সে, কে দেখল না দেখল, সে বিষয়ে সাবধান হওয়ার দরকার বোধ করে না। মারিয়ানা নামে তার যে পরিচারিকা গ্রামে তার জন্যে হাট বাজার করতে যায়, তাকে সে বলে দিয়েছে, যে, ডাক্তারের পরামর্শ মতো সে সূর্যস্নান করে। এইটুকু বলাই যথেষ্ট।

মারিয়ানার বয়স প্রায় ষাট। তবু সে এখনো সোজা হয়ে হাঁটে। লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় কোঁকড়ান শাদা চুল। কালো চোখ দেখলে মনে হয়, হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় তার দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, আর তার মুখে সেই হাসি, যা শুধু সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মায়। জীবনের বেদনাময় নিষ্ফলতা, অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়া তো আর কিছু নয়।

মারিয়ানা জুলিয়েটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, 'কোনো পোশাক না পরে রোদ পোয়ানো ভারি চমৎকার, না?' মারিয়ানার চোখে একটু ধূর্ত হাসির ঝিলিক। মারিয়ানা বৃহত্তর গ্রীসের মেয়ে। তার ইতিহাস সুদূরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সে আবার বলে, 'কিন্তু তার আগে নিজেরও সুন্দর হওয়া দরকার। নইলে সূর্য অপমানও বোধ করতে পারে, কেমন, তাই না?' মারিয়ানা অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠে—প্রাচীন যুগের মেয়েদের সেই দুর্বোধ হাসি।

'কে জানে আমি সুন্দর কিনা,' বলে জুলিয়েট।

কিন্তু সুন্দর হোক বা না হোক, সে মনে মনে জানে যে সূর্য তাকে গ্রহণ করেছে। তারপর আর কিছু ভাববার দরকার নেই।

কোনো কোনো দিন দুপুর বেলা, সূর্য যখন মাঝ-গগনে, সে পাহাড়ের ধার দিয়ে নিচের ঠাণ্ডা গভীর কোনো জলাশয়ের কাছে নেমে যায়, আর চিরন্তন ছায়ায় ঢাকা সেই লেবুগাছের পত্রাচ্ছাদিত সবুজ গোধূলি আলোর জগতে গায়ের আবরণ খুলে ফেলে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেয়। হঠাৎ তখন সে দেখতে পায় তার সমস্ত দেহ গোলাপি থেকে ক্রমেই সোনালি হয়ে উঠছে। সে যেন আর একজনের মতো, সে যেন সত্যই আর কেউ।

গ্রীক্‌দের কথা তার মনে পড়ে। রোদ না লাগা মাছের মতো শাদা গায়ের রঙ তারা অস্বাস্থ্যকর মনে করত।

গায়ে একটু জলপাই-তেল মেখে, সেই অন্ধকার লেবু গাছের বনে সে ঘুরে বেড়ায়, নিজের নাভিতে কখনো বা একটা লেবুফুল রেখে নিজের মনে-মনেই হাসে। হয়তো কখনো কোনো চাষীর চোখে সে পড়েও যেতে পারে। কিন্তু তাতে সে নিজে যত না ভয় পাক, তার চেয়ে সেই চাষীই যে বেশি ভয় পাবে, সে জানে। পোশাকে ঢাকা মানুষের বুকের ভেতর ভয়ের গোপন কেন্দ্রের কথা তার অজানা নয়। তার নিজের ছেলেটির

ভেতরও এই ভয় যে আছে সে জানে। সে জানে যে তার ছেলেও তাকে আর বিশ্বাস করে না, কারণ তার মুখে এখন সূর্যের উজ্জ্বলতা, তার হাসিতে রৌদ্রের ঝিলিক! আজকাল সে জোর করে প্রতিদিন ছেলে-টিকে রোদে নগ্ন ভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার ছোট্ট শরীরটি এর মধ্যেই গোলাপি হয়ে উঠেছে, গায়ের চামড়ায় সোনালি আভা লেগেছে, তারই ভেতর গাল দুটি পাকা পেয়ারার শাঁসের মতো লালচে। সোনালি ঘন চুলগুলি কপালের ওপর থেকে পেছন দিকে আঁচড়ানো। তার সুস্থ, সবল, গোলাপি, সোনালি ও নীলে মেশানো অপরূপ শ্রী দেখে চাকর-বাকরেরা মোহিত। তাদের কাছে সে স্বর্গের দেব-শিশু। কিন্তু মা তার দিকে চেয়ে হাসে, তাই মা-কে সে বিশ্বাস করে না। তার সেই বড় বড় নীল চোখের দৃষ্টিতে জুলিয়েট ভয়ের সেই কেন্দ্র দেখতে পায়। তার ধারণা কোনো পুরুষই এই ভয় থেকে মুক্ত নয়। জুলিয়েট এই ভয়ের নাম দিয়েছে সূর্যাতঙ্ক।

ছেলেটি পাখির মতো নানারকম শব্দ করতে করতে টলে টলে রোদের মধ্যে খেলা করে বেড়ায়, আর তাকে দেখে জুলিয়েটের মনে হয়, সে যেন সূর্যের কাছ থেকে খোলসের মধ্যে শামুকের মতো নিজেকে বন্ধ করে লুকিয়ে রাখছে। তাকে দেখলে তার বাপের কথা মনে পড়ে যায়। জুলিয়েট যদি তাকে এই খোলসের ভেতর থেকে বার করে আনতে পারতো! জীবনকে উদ্দাম ভাবে অভিনন্দিত করবার সাহস নিয়ে সে যদি বেরিয়ে আসতো।

জুলিয়েট ঠিক করলে এখন থেকে তাকে সে ফণীমনসার জঙ্গলে সেই 'সাইপ্রাস' গাছের তলায় নিয়ে যাবে। কাঁটাগুলোর জন্যে তাকে একটু সেখানে চোখে চোখে রাখা দরকার বটে। কিন্তু সেখানে তার খোলস থেকে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসতে পারবে। সভ্যতার ভ্রূকুটি-কুঞ্চনটুকু তার কপাল থেকে যাবে মিলিয়ে।

মাটিতে একটা কম্বল পেতে সে ছেলেটিকে বসিয়ে দেয়, তারপর নিজের চাদর খুলে ফেলে বসে বসে উর্ধ্ব আকাশে চেয়ে থাকে। একটা বাজ নীল শূন্যে উড়ছে। 'সাইপ্রাস' গাছের সরু ডগাটা নুয়ে আছে। ছেলেটি কম্বলের উপর পাথর নিয়ে খেলা করে। উঠে পড়ে যখন সে হাঁটবার চেষ্টা করে, তখন জুলিয়েটও উঠে বসে। ছেলেটি ফিরে তার দিকে তাকায়, তার গায়ের রঙ আর শাদা নেই, সোনালি গোলাপিতে মিশে তাকে সত্যই সুন্দর দেখায়।

'দেখো সোনামনি, গায়ে কাঁটা যেন না লাগে।'

ছোট্ট একটি দেবশিশুর মতো ছেলেটি আধো-আধো ভাষায় বলবার চেষ্টা করে 'কাঁটা!'

'হ্যাঁ, বিশ্রী কাঁটা।'

ছেলেটি এ-কথারও প্রতিধ্বনি করবার চেষ্টা করে। তারপর চটি পায়ে পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে প্রায় ফণীমনসার ঝোপের উপর পড়-পড় হয়। জুলিয়েট এক লাফে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। নিজের ক্ষিপ্রতায় নিজেই সে অবাক হয়ে যায়।

রোদ থাকলে প্রত্যেক দিনই সে ছেলেটিকে 'সাইপ্রাস' গাছের কাছে নিয়ে যায়। কোনো দিন মেঘলা করলে বাদলার হাওয়ায় জুলিয়েট না বেরুতে চাইলে, ছেলেটি বার বার 'সাইপ্রাস' গাছের কাছে যাবার জন্যে বায়না ধরে। 'সাইপ্রাস' গাছটির কাছে না যেতে পারলে তারও জুলিয়েটের মতো কষ্ট হয়।

এতো শুধু স্নান নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। তার গভীর অন্তরে কি যেন উন্মুক্ত, বিকশিত হয়ে তার চেতনা ও কামনার অতীত কোনো শক্তি যেন তাকে সূর্যের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে, তার ভেতর থেকে এক স্বতঃস্ফূর্ত রহস্য-ধারা প্রবাহিত।

তার চেতন যে সত্তা, তা যেন দ্বিতীয় একজন দর্শক মাত্র। তার গভীর দেহ

মন থেকে সূর্যের দিকে প্রবাহিত এই রহস্য-ধারাই যেন আসল জুলিয়েট। চিরদিন নিজের ওপর দখল তার ছিল। নিজে কি করছে সে সম্বন্ধে সব সময়ই সে সচেতন। নিজের শক্তির রাশ দৃঢ় মুষ্টিতে সে চিরদিনই ধরে রেখেছে। এখন সে যেন তার ভেতরে আর এক ধরনের শক্তি অনুভব করে। স্বতঃপ্রবাহিত সে শক্তি তার চেয়ে অনেক প্রবল। নিজের অতীত এই শক্তির কাছে সে যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ফেব্রুয়ারির শেষে হঠাৎ খুব গরম পড়ে গেল। একটু হাওয়া লাগতে না লাগতে গোলাপি তুষারের মতো, বাদাম গাছের ফুল ঝরে পড়ে। রেশমি খুদে খুদে 'অ্যানিমোন' আর লম্বা ডাঁটা-ওয়ালা 'অ্যাস্ফোডেলে'র কুঁড়ি চারদিকে ফুটে ওঠে। সমুদ্র অপরূপ নীল দেখায়।

জুলিয়েট আজকাল আর কোনো কিছুর জন্যেই ভাবে না। এখন বেশির ভাগ দিনই সে ছেলেটির সঙ্গে নিরাবরণ হয়ে রোদে রোদে কাটায়। এর বেশি তার কোনো কামনাও নেই। কখনো কখনো সে সমুদ্রে স্নান করতে যায়, কখনো বা দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাদে—লোক চক্ষুর অন্তরালে ঘুরে বেড়ায়। এক একদিন কোনো চাষীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়; গাধা নিয়ে যেতে যেতে সেও তাকে দেখে। কিন্তু জুলিয়েট ছেলেটির সঙ্গে এত সহজ শান্তভাবে চলা ফেরা করে, যে এ ব্যাপার নিয়ে আজকাল আর কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না। তা ছাড়া সূর্যালোকে দেহ ও মন নিরাময় হওয়ার কথা এর মধ্যেই স্থানীয় লোকদের মধ্যে বেশ প্রচার হয়ে গেছে।

ছেলেটির ও তার, দুজনের রঙই রোদে পুড়ে এখন বেশ গাঢ় সোনালি হয়ে উঠেছে। নিজের সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে জুলিয়েট নিজের মনেই বলে ওঠে, 'আমি আর একজন।'

ছেলেটিও যেন আর এক রকম হয়ে গেছে। তার মধ্যে কেমন একটা

অদ্ভুত, প্রশান্ত, সূর্য-গাঢ় তন্ময়তা। সে নিঃশব্দে নিজের মনেই খেলা করে ; জুলিয়েটের তার দিকে লক্ষ্য করবারও দরকার হয় না। একলা আছে কিনা আছে ছেলেটি যেন টেরও পায়না।

বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, নিথর গাঢ় নীল সমুদ্র। 'সাইপ্রাস' গাছটার শিকড়গুলো যেন কোনো শ্বাপদের থাবা। তারই কাছে বসে প্রখর রোদে ঝিমিয়ে পড়লেও তার মনে হয় তার হৃদয় যেন সজাগ, নতুন রস-সঞ্চারে তার বুক যেন পরিপূর্ণ। নিজের ভেতর কি যেন একটা চাঞ্চল্য সে অনুভব করছে, কি যেন একটা স্রোতাবেগ, যা তাকে জীবনের নতুন পথে উত্তীর্ণ করে দিতে চায়। তবু এ চাঞ্চল্য সম্বন্ধে সে সচেতন হতে চায় না। সভ্যতার বিরাট হৃদয়হীন যন্ত্র-জটিলতার কথা সে ভালো করেই জানে, জানে যে তা এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়।

ছেলেটি পাথুরে পথের রেখা ধরে একটা বিরাট ফণীমনসার আড়ালে কয়েক পা এগিয়ে গেছে। আজকাল সে হাঁটতে গিয়ে আর টলে না, নিজেকে নিজে অনায়াসে সামলাতে পারে। স্বর্ণাভ দেবশিশুর মতো ছেলেটি কতগুলি বন্য ফুল তুলে সারি সারি সাজিয়ে রাখছিল। হঠাৎ জুলিয়েট তার চীৎকার শুনতে পেল, 'মা, দেখ দেখ।' তার গলার স্বর কেমন একটু অদ্ভুত। জুলিয়েট একটু ঝুঁকে পড়ে সেদিকে চেয়ে আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর তারই হাত দুয়েক দূরে একটা সাপ মাথা তুলে দো-ফলা জিভ বার করে থেকে থেকে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করছে।

ছেলেটি সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'দেখেছ মা!'

'হ্যাঁ সোনামণি, ওটা একটা সাপ,'—জুলিয়েটের স্বর অত্যন্ত ধীর, গম্ভীর।

ছেলেটি মা-র দিকে তাকিয়ে রইল, বড় বড় তার নীল চোখে তখনো একটা দ্বিধার আভাষ—ভয় পাবে কি না। মায়ের চোখের

প্রশান্তিতেই শেষ পর্যন্ত সে আশ্বস্ত হয়—এ প্রশান্তি বুঝি সূর্য থেকে পাওয়া। ছেলেটি আধো-আধো ভাষায় বলে উঠল, 'সাপ ?'

'হ্যাঁ বাবা, সাপ ! ছুঁয়োনা যেন, তাহলে কামড়ে দিতে পারে।'

সাপটা তখন মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে তার সোনালি ধূসর দেহটা পাথরের উপর দিয়ে মসৃণ গতিতে টেনে নিয়ে একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ছেলেটি সেদিকে ফিরে খানিক নিঃশব্দে তাকে লক্ষ্য করে বললে, 'সাপ যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওকে যেতে দাও, ও একলা থাকতে চায়।'

সাপটা ফাটলের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ছেলেটি আবার ফিরে বললে, 'সাপ চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, চলে গেছে। মা-র কাছে একবার এসতো লক্ষ্মীটি।'

ছেলেটি এসে মা-র কোলের ওপর বসল। জুলিয়েট কোনো কথাই বললে না। কোনো উদ্বেগ আর তার নেই এইটুকুই শুধু সে জানে। সূর্যের অপরূপ শক্তিতে সমস্ত মন তার স্নিগ্ধ। অদ্ভুত কোনো যাদুর মতো সেই স্নিগ্ধতা যেন তার চারদিক ভরে আছে। সাপটাও যেন তার এবং তার সন্তানের মতো এই জায়গারই একটা অঙ্গ।

আর একদিন জলপাই-এর বাগানের পাথরের দেয়ালে একটি কালো সাপ সে দেখে।

'মারিয়ানা, আমি একটা কালো সাপ দেখেছি। এগুলো কি বিষাক্ত ?'

'না, কালো সাপের বিষ নেই। কিন্তু হলুদে সাপ একবার কামড়ালে আর রক্ষে নেই। তবে কালো সাপ দেখলেও আমার ভয় করে।'

জুলিয়েট এখনো ছেলেটিকে নিয়ে 'সাইপ্রাস' গাছটির কাছে যায়। তবে সেখানে বসবার আগে চারদিক সে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে। তারপর সূর্যের দিকে মুখ রেখে সে শুয়ে পড়ে। কোনো ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবতে চায় না। তার এই বাগানটির বাইরে,

বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবার গরজ তার নেই। কাউকে সে চিঠিও লিখতে চায় না। চিঠি লেখার ভার সে তার নার্সের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

মার্চ মাস। সূর্যের তেজ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। খুব গরমের সময় সে গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকে। কখনো কখনো সেই ঠাণ্ডা লেবু গাছের কুঞ্জে নেমে যায়। ছেলেটি দূরে দূরে তারই সঙ্গে দৌড়ে বেড়ায়। সে যেন বন্য কোনো প্রাণীর শাবক, প্রাণ-স্রোতের গভীরতায় নিমগ্ন।

একদিন পাহাড়ের একটি জলের কুণ্ডে স্নান করে, পাথরের একটি ধাপের ওপর বসে সে রোদ পোয়াচ্ছে, আর ছেলেটি নিচে হলুদ-বরণ 'অক্সালিস্' ফুলগুলির মাঝে আলো-ছায়ায় আল্পনা-কাটা বনে লেবু কুড়িয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, এমন সময় দূরে পাহাড়ের ধার থেকে মারিয়ানার ডাক শোনা গেল। মাথায় একটা কালো কাপড় বেঁধে মারিয়ানা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

জুলিয়েটকে নগ্ন দেহে উঠে দাঁড়াতে দেখে মারিয়ানা একবার বুঝি থমকে দাঁড়ালো, তারপর দ্রুত পায়ে পাহাড়ের পথে নেমে এসে খানিক-ক্ষণ নিঃশব্দে জুলিয়েটের সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে বললে, 'সত্যি তুমি কি সুন্দর! তোমার স্বামী এসেছে যে!'

'আমার স্বামী!' জুলিয়েট বলে উঠল।

বৃদ্ধা একটু যেন বিদ্রূপ করেই হেসে উঠে বললে, 'কেন, তোমার স্বামী কেউ নেই?'

'হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু কোথায় তিনি?'

মারিয়ানা পেছন ফিরে তাকিয়ে বললে, 'আমার সঙ্গেই তো আসছিল, তবে মাঝখানে পথ হারিয়ে ফেলেছে বোধ হয়।' আবার সে হেসে উঠল, সেই ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি।

জুলিয়েট একটু চিন্তিত ভাবে মারিয়ানার দিকে চেয়ে বললে, 'বেশ, আস্থন না তিনি।'

'আসবে এখানে? এখন?' মারিয়ানার চোখে চাপা বিদ্রূপের হাসি। তারপর আবার একটু মুখভঙ্গী করে সে বললে, 'বেশ, তোমার যেমন খুশি। তবে তাঁর পক্ষে এ একেবারে আজব দৃশ্য সন্দেহ নেই।' মারিয়ানা একটু হেসে উঠল। তার পর ছেলেটিকে দেখিয়ে বললে, 'কি স্থন্দর ওকে দেখাচ্ছে। ওকে দেখে বেচারা নিশ্চয়ই খুশি হবে। আমি তাহলে তাকে নিয়ে আসি।'

'হ্যাঁ নিয়ে এস,' বললে জুলিয়েট।

মারিয়ানা আবার পাহাড়ের রাস্তায় উঠে গেল। আঙুরের বাগানের ভেতর মরিস পথ খুঁজে না পেয়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীকদের সেই প্রাচীন জগতে, সেই উজ্জ্বল সূর্যালোকে তাকে যেন বড্ড খাপছাড়া মনে হচ্ছে।

মারিয়ানা তাকে ডেকে বললে, 'চল, তোমার স্ত্রী নিচে অপেক্ষা করছে।'

ঘাসের ভেতর দিয়ে বড় বড় পা ফেলে দ্রুতপদে মারিয়ানা তাকে পথ দেখিয়ে কিছু দুর নিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ উৎরাইয়ের পথের কাছে এসে নিচের লেবু গাছগুলোর দিকে দেখিয়ে বললে, 'এই পথ দিয়ে নেমে যাও।'

মরিসের বয়স চল্লিশ হবে। দাড়ি গোঁফ কামানো, একটু ফ্যাকাশে রঙ, খুব শান্ত আর সত্যই লাজুক। জীবনে নিজের কাজটা সে সযত্নে ভালো ভাবেই করে যায়, অসাধারণ কোনো সাফল্য যদিও সে অর্জন করেনি। তবে নিজের মনের কথা কাউকে বলবার পাত্র সে নয়। মারিয়ানা তাকে একবার দেখেই চিনেছে। মনে মনে বলেছে—মানুষটা ভালো বটে, তবে বেচারা সত্যিকারের পুরুষ নয়।

নিয়তির মতোই যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে মারিয়ানা বললে, 'ঐ তোমার স্ত্রী।'

মরিস নিতান্ত সাধারণ ভাবে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সাবধানে পাহাড়ের পথে নেমে গেল। মারিয়ানা দুষ্টুমির হাসির সঙ্গে মুখভঙ্গী করে বাড়ির দিকে ফিরল।

ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে নামতে নামতে মরিস একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ তার স্ত্রীর দেখা পেল। নিরাবরণ জুলিয়েট তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সারা দেহে তার সূর্যের দীপ্তি, প্রাণের উত্তাপ। ব্লটিং কাগজের ওপর কালির ফোঁটার মতো মরিস সেখানে এসে পড়ে তাকিয়েই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর অন্য পাশে চেয়ে একটু কেশে বললে, 'এই যে জুলি, বাঃ চমৎকার, চমৎকার।' মাঝে মাঝে তার দিকে চাইলেও মুখটা বেশির ভাগ অন্য দিকে ফিরিয়ে মরিস স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল। জুলিয়েটের সমস্ত শরীরে রেশমের মতো মসৃণ একটা দীপ্তি। কোনো আবরণ যে তার নেই, এ কথা মনেই যেন হয় না। সূর্যের গোলাপি সোনালি আভাই তার শরীরে যেন নতুন আবরণ দিয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে জুলিয়েট বললে, 'এই যে মরিস, তুমি এত শিগ্‌গির আসবে তা আমি ভাবিনি।'

মরিস উত্তরে বললে, 'হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসবার সুবিধে হয়ে গেল,' আবার সে একটু অপ্রস্তুত ভাবে কাশল।

পরস্পরের কয়েক হাত দূরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই নীরব। কিছুক্ষণ বাদে মরিসই বললে, 'বাঃ! কি বলে—এত চমৎকার! তোমায় কি বলে—চমৎকার দেখাচ্ছে। ছেলেটা কোথায়?'

ছেলেটি একদিকে ঘন গাছের ছায়ায় একগাদা লেবু জড়ো করছিল। তার ভীরু চাপা মন সত্যই কি যেন একটা আনন্দ শিহরণ অনুভব করল।

সে ডাক দিলে। কণ্ঠস্বরটা কিন্তু কেমন দুর্বল শোনালো।

বাপের ডাকে ছেলেটি ফিরে তাকাল। তার গোলগাল হাত দুটি থেকে কয়েকটা লেবু গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু কোনো রকম সাড়া সে দিল না।
'মনে হচ্ছে আমাদের ওর কাছেই যেতে হবে।' বলে জুলিয়েট ফিরে সেই দিকে এগিয়ে গেল। মরিস পেছনে যেতে যেতে জুলিয়েটের সুঠাম দেহের গতিভঙ্গী লক্ষ্য করে একদিকে যেমন মুগ্ধ, বিহ্বল, আর এক দিকে তেমনি যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলে। নিজেকে নিয়ে কি সে করবে? তার পোশাক, তার শহুরে ব্যবসাদারের মতোই বিবর্ণ কৃচ্ছ্র-সাধন-ক্লিষ্ট চেহারা, সবই যেন এখানে খাপছাড়া।
লেবু গাছগুলোর তলায় সমস্ত মাটি হলুদ বরণ 'অক্সালিস্' ফুলে ছেয়ে আছে। তারই ভেতর দিয়ে ছেলেটির কাছে এসে জুলিয়েট বললে, 'কেমন লাগছে? ভালোই, না?'
'হ্যাঁ, ভালো, ভালো, চমৎকার! কি গো বাপু, বাবাকে চিনতে পারছ?' নিচু হয়ে বসে মরিস হাত বাড়িয়ে দিলে।
ছেলেটি আধো-আধো ভাষায় বললে, 'লেবু! দুটো লেবু!'
মরিস বললে, 'দুটো লেবু—অনেক লেবু।'
ছেলেটি এসে মরিসের দুহাতে দুটো লেবু রেখে, ভালো করে দেখবার জন্যে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল।
মরিস বললে, 'দুটো লেবু! এস দেখি, বাবার কাছে এসে একবার বলো, এই যে বাবা।'
ছেলেটি বললে, 'বাবা চলে যাচ্ছে?'
'চলে যাচ্ছে? না না, আজকে নয়!' বলে মরিস ছেলেকে কোলে তুলে নিলে।
ছেলেটি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে বললে, 'বাবা কোট খুলে ফেল।'
'বেশ তাই হবে, বাবা কোট খুলে ফেলেছে,' বলে কোটটা খুলে সাবধানে

এক জায়গায় রেখে মরিস আবার ছেলেকে কোলে তুলে নিল। স্বামীর কোলে উলঙ্গ শিশুর দিকে জুলিয়েট একবার চাইলে। মরিসের গায়ে শুধু শার্ট। ছেলেটি তার টুপিটাও টেনে ফেলে দিয়েছে। কাঁচা-পাকা মেশানো মরিসের সযত্নে পাট করা চুলগুলো বিশেষ করে জুলিয়েটের চোখে পড়ল। এতটুকু এলোমেলো নয়, একটি চুলও এদিক ওদিক হয়নি। দেখলে একান্ত ভাবে কেবলই বদ্ধ ঘরের কথা মনে হয়। অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল। ছেলেটি বাপকে ভালোবাসে, তারই সঙ্গে কথা কয়ে চলেছে।

হঠাৎ জুলিয়েট বলে উঠল, 'তুমি কি করবে ঠিক করেছ ?'

মরিস আড়চোখে স্ত্রীকে একবার দেখে নিয়ে বললে, 'কি সম্বন্ধে জুলি ?'

'সব কিছু সম্বন্ধে ! এই ব্যাপার সম্বন্ধেও। আমি আর নিউ ইয়র্কের সেই ইস্ট ফর্টিসেভেন্‌থ রাস্তায় ফিরে যেতে পারব না।'

মরিস একটু ইতস্তত করে বললে, 'কি বলে—না, তা অবশ্য নয়—অন্তত এখন তো নয়ই।'

'কখনই নয়,' বললে জুলিয়েট। দুজনেই তার পর খানিকক্ষণ নীরব।

অবশেষে মরিস বললে, 'মানে—কি বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না।'

জুলিয়েট জিগগেস করলে, 'তোমার কি মনে হয় ? তুমি এখানে আসতে পার না ?'

একটু ইতস্তত করে মরিস বললে, 'হ্যাঁ, মাস খানেক আমি কোনো রকমে ব্যবস্থা করে থাকতে পারি।' আর একবার জুলিয়েটের দিকে সলজ্জভাবে তাকিয়ে সে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে।

জুলিয়েট স্বামীর দিকে তাকাল। তার সমস্ত বুক যেন একটা অসহিষ্ণুতার আবেগে কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে সে বললে, 'আমি ফিরে যেতে পারি না, এই সূর্যকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। তুমি যদি এখানে না আসতে পার—' জুলিয়েট কথাটা অসমাপ্তই রেখে দিলে।

মরিস আড়চোখে কয়েকবার স্ত্রীর দিকে তাকালে। বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে ক্রমশই সে যেন আরও মুগ্ধ হয়ে উঠছে।

অবশেষে মরিস বললে, 'না, এই তোমার পক্ষে ভালো। তোমায় অপরূপ লাগছে। তুমি ফিরে যেতে পারবে আমার মনে হয় না।'

তাদের নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটের কথা সে ভাবছিল। জুলিয়েটের সেখানে আর এক রূপ সে দেখেছে। সারাক্ষণ তার সেই মৌন বিবর্ণ রূপ মরিসকে যেন উৎপীড়িত করেছে। সে নিজে অত্যন্ত ভীরু শান্ত প্রকৃতির। ছেলেটি হবার পর থেকে জুলিয়েটের নীরব বিরুদ্ধতায় তাই সে গভীর ভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। জুলিয়েট নিজেই এ ব্যাপারে নিরুপায় বুঝে সে আরও বেশি ভয় পেয়েছে। মেয়েরা এই রকমই। তারা নিজেই নিজে-দের পর্যন্ত বিরোধী হয়ে ওঠে, আর তখন তা একেবারে দুঃসহ ভয়ঙ্কর! যে মেয়ের মন তার নিজের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ায়, তার সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা সত্যই ভয়ঙ্কর! জুলিয়েটের এই অনিচ্ছাকৃত বিরুদ্ধতার যাঁতাকলে সে যেন নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকেও জুলিয়েট নিষ্পেষিত করেছে, তার সঙ্গে তার সন্তানটিকেও। না, না, এ অবস্থার চেয়ে আর যা কিছু হয় হোক, তাই ভালো।

জুলিয়েট জিগগেস করলে, 'কিন্তু তোমার কি হবে?'

'আমি? ও, আমার কথা বলছ! আমি ব্যবসা চালাব, আর—কি বলে ছুটি-ছাটায় এখানে আসব—যতদিন অবশ্য, তুমি এখানে থাকতে চাও। তুমি যদ্দিন খুশি এখানে থাকো।' অনেকক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে মরিস আবার জুলিয়েটের দিকে তাকাল। তার চোখে অস্বস্তির সঙ্গে কেমন একটা কাতরতার আভাস।

'বরাবর থাকতে পারি?'

'হ্যাঁ—কি বলে, হ্যাঁ, যদি তুমি চাও। বরাবর মানে অবশ্য অনেক কাল। তারিখ ধরে তো দেওয়া যায় না।'

'আর যা খুশি আমি করতে পারি ?' জুলিয়েট সোজা মরিসের চোখের দিকে তাকাল—তার দৃষ্টিতে যেন দ্বন্দ্বের আহ্বান। মরিস জুলিয়েটের সমস্ত শরীরের নগ্ন নবার্জিত দীপ্তির সামনে কেমন যেন অসহায় বোধ করছে। কোনো রকমে উত্তর দিলে, 'কি বলে—তা পার বই কি ! তুমি নিজে খুশি থাকলেই হল, আর ছেলেটাও যেন অখুশি না হয়।'

আবার সে তেমনি কাতরভাবে জুলিয়েটের দিকে তাকাল। ছেলেটির কথাই সে ভাবছে, কিন্তু নিজেও যেন কিছু আশা রাখে।

জুলিয়েট উত্তর দিলে, 'না ওকে অখুশি আমি করব না।'

'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় তা তুমি করবে না।'

দুজনেই তার পর খানিকক্ষণ নীরব। গ্রাম থেকে দ্বিপ্রাহরিক ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। 'কিমোনো'টা প'রে চওড়া সবুজ কোমর-বন্ধটা জুলিয়েট বেঁধে নিলে। তারপর ছেলেটার গায়ে একটা ছোট নীল শার্ট পরিয়ে দিয়ে সবাই মিলে বাড়ির দিকে চলল।

খাবার টেবিলে বসে জুলিয়েট স্বামীকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল। মরিসের মুখে নগর-জীবনের পাণ্ডুরতা, তার কাঁচা-পাকা পাট করা চুল, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তার সংযম, খাবার টেবিলের আদব-কায়দা সম্বন্ধে তার সজাগ দৃষ্টি কিছুই তার দৃষ্টি এড়াল না। মরিস মাঝে মাঝে জুলিয়েটের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। ছেলেবেলা ধরা পড়ে যে পশুশাবককে আজীবন বন্দীদশায় কাটাতে হয়েছে, মরিসের সোনালি ধূসর চোখে যেন তারই মতো দৃষ্টি।

কফি খাবার জন্যে তারা বারান্দায় গেল। দূরে একটা বাদাম গাছের তলায় সবুজ গমের ক্ষেতের পাশে, মাটিতে কাপড় বিছিয়ে এক চাষী আর তার স্ত্রী খেতে বসেছে। সামনে তাদের মস্ত বড একটা রুটি আর গ্লাশে কালো মদ।

জুলিয়েট এমন ভাবে বসার ব্যবস্থা করলে যাতে স্বামীর পিঠ তাদের

দিকে পড়ে, কারণ বারান্দায় আসবা মাত্র সেই চাষীকে মুখ তুলে চাইতে সে দেখেছে।

এই চাষীকে দূর থেকে সে বেশ ভালো রকমই চেনে। চওড়া, একটু মোটা গোছের চেহারা, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, একসঙ্গে বড় বড় রুটির গ্রাস মুখে দিয়ে চিবানো তার অভ্যাস। তার স্ত্রী, দেখতে সুন্দর, গম্ভীর প্রকৃতির, কেমন যেন একটু কঠিন বলেই মনে হয়। কোন ছেলেপুলে তাদের নেই। জুলিয়েট তাদের সম্বন্ধে এই পর্যন্তই জেনেছে।

খাদের ওপারের জমিতে চাষীটি বেশির ভাগ একা-একাই কাজ করে। পরনে তার শাদা প্যাণ্ট, রঙীন শার্ট, আর একটা পুরানো টুপি। পোশাক তার সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাকে এবং তার স্ত্রীকে দেখলেই মনে হয় তাদের মধ্যে এমন একটি শান্ত আভিজাত্য আছে, যা শ্রেণীগত নয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

তার সজীবতাই হল তার প্রধান আকর্ষণ। মোটা ও চওড়া হলে কি হয়, এমন একটি অদ্ভুত প্রাণশক্তি তার মধ্যে আছে যার পরিচয় তার সমস্ত চলা ফেরায় পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম, রৌদ্র-স্নান করার সঙ্কল্প করার আগে একদিন খাদের ওপারে যাওয়ার পথে তার সঙ্গে জুলিয়েটের হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। জুলিয়েট তাকে দেখবার আগেই সে তাকে দেখছিল নিশ্চয়। জুলিয়েট মুখ তুলে তাকাতেই দেখেছে, সে টুপি খুলে সলজ্জ অথচ সগর্ব দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চওড়া রোদে পোড়া মুখ, ছাঁটা মেটে রঙের গোঁফ, চওড়া কপালের ওপর প্রায় গোঁফের মতোই পুরু মেটে রঙের ভুরু।

জুলিয়েট সেদিন প্রথম একটু চমকে গিয়ে তারপর বলেছিল, 'এখানে আমি বেড়াতে পারি তো?'

চাষী উত্তর দিয়েছিল, 'নিশ্চয়ই, এ জমিতে আপনি যেখানে খুশি

বেড়াতে পারেন।' যেমন ক্ষিপ্র তার চলাফেরা তেমনি তার কথা বলার ধরন।

জুলিয়েট সেদিন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সেই চাষীর লাজুক অথচ সজীব, উদার প্রকৃতির পরিচয়, তার সামান্য মাথা হেলাবার ভঙ্গী থেকেই যেন সে পেয়ে গেছে।

তার পর থেকে সে তাকে প্রতিদিনই দূর থেকে দেখেছে, দেখে বুঝেছে যে সে বেশির ভাগ একা-একা থাকতেই ভালোবাসে। তার স্ত্রী তাকে উগ্রভাবে ভালোবাসে। ঈর্ষা-প্রধান সে ভালোবাসা প্রায় ঘৃণার মতোই তীব্র। ঈর্ষার কারণ বোধ হয় এই যে নিজের সীমা তার সঙ্কীর্ণ, তার স্বামীর বিস্তৃতি সে সঙ্কীর্ণতার মাঝে আবদ্ধ থাকতে চায় না।

একদিন একদল চাষীর মাঝখানে এক গাছতলায় জুলিয়েট তাকে একটি শিশুর সঙ্গে সানন্দে নাচতে দেখেছে। তার স্ত্রীও বসে বসে দেখছিল—চোখে তার গভীর অপ্রসন্ন দৃষ্টি।

ক্রমে ক্রমে দূর থেকেই জুলিয়েট তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পরস্পরের সম্বন্ধে তারা সচেতন। কখন সে তার গাধাটি নিয়ে আসবে, জুলিয়েট তা জানে। জুলিয়েট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবা মাত্র সে ফিরে তাকায়। কিন্তু সম্ভাষণ কেউ তারা কাউকে করে না। তবু কোনো দিন সকালে সে ক্ষেতে কাজ করতে না এলে, জুলিয়েটের কেমন ফাঁকা ঠেকে।

দুই পারের দুই জমির মাঝখানের খাদে গরমের দিনের এক সকাল বেলায় জুলিয়েট নিরাবরণ হয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তার সামনে এসে পড়ে। তার গাধাটি পাশে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর সে নুয়ে পড়ে সবল হাতে গাধার পিঠে চাপাবার জন্যে কাঠের বোঝা তুলছে। পরিশ্রমে আরক্ত মুখ তোলবার সঙ্গে সঙ্গে সে জুলিয়েটকে দেখতে পায়—জুলিয়েট তখন পিছনে সরে যেতে ব্যস্ত। একটা শিখা

তার চোখে যেন খেলে গেল, আর একটা শিখা যেন জুলিয়েটের দেহের ওপর দিয়ে, তার সমস্ত অস্থি গলিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। কিন্তু জুলিয়েট নীরবে ঝোপগুলোর আড়ালে গিয়ে, যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই গেল ফিরে। ঝোপ, ঝাড় জঙ্গলের মধ্যে অমন নিঃশব্দে কি করে সে কাজ করে যায় তা ভেবে জুলিয়েট অবাক যেমন হয়েছে, তেমনি বিরক্তও হয়েছে একটু। বন্য প্রাণীদের মতো এই আশ্চর্য ক্ষমতা তার আছে।

তার পর থেকে নিজেরা স্বীকার করতে না চাইলেও তারা দুজনেই নিজেদের দেহে, পরস্পরের সম্বন্ধে সচেতনার একটা সুস্পষ্ট বেদনা অনুভব করেছে। তারা কিছুতেই তা প্রকাশ না করলেও সেই চাষীর স্ত্রী যেন আপনা থেকে সজাগ হয়ে উঠেছে।

আর জুলিয়েট ভেবেছে, কি তাতে ক্ষতি একবার যদি তার সঙ্গে আমার এক দণ্ডের দেখা হয়, যদি তার সন্তানের জননী আমি হই? এক পুরুষের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন, কেনই বা জড়িয়ে আমায় রাখতে হবে? এই কামনাময় মুহূর্তে বারেকের দেখা কেনই বা তার সঙ্গে হবে না। স্ফুলিঙ্গ তো আমাদের দুজনের মধ্যে জ্বলেই উঠেছে।

কিন্তু বাইরে কোনো প্রকাশই তার দেখা যায়নি। আজ এখন আবার জুলিয়েট তাকে দেখতে পেল। মাটিতে শাদা কাপড় বিছিয়ে তার কালো পোশাক পরা স্ত্রীর মুখোমুখি বসে সে মুখ তুলে মরিসের দিকে তাকিয়ে আছে। তার স্ত্রীও মুখ ফিরিয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল।

কেমন একটা বিরাগে জুলিয়েটের মন তিক্ত হয়ে উঠল। আবার মরিসের সন্তান তাকে বহন করতে হবে। স্বামীর চোখে সে ইঙ্গিত সে পেয়েছে, তার কথার জবাবে স্বামী যা বলছে তা থেকেও সে তা বুঝেছে।

'তুমিও কি পোশাক ছেড়ে সূর্যস্নান করবে?' জুলিয়েট জিগগেস করেছে।

'কেন—কি বলে—হ্যাঁ করব! এখানে যখন আছি তখন তা তো ভালোই লাগবে। জায়গাটা একেবারে নিরিবিলি, কি বল?'

মরিসের চোখে কেমন একটা দীপ্তি, তার কামনার কেমন একটা নিরাশ্বাস দুঃসাহসের ইঙ্গিত, তার দৃষ্টিতে। তার নিজের দিক দিয়ে বিচার করলে সেও মানুষ, পৃথিবীর সম্মুখীন হবার পৌরুষ তার সম্পূর্ণ নির্বাপিত নয়। হাস্যকর ভাবে হলেও সূর্যস্নান করবার সাহস সে রাখে।

কিন্তু স্থূল পৃথিবীর কলঙ্কস্পর্শ থেকে সে মুক্ত নয়, সেখানকার সমস্ত শৃঙ্খল, সমস্ত নীচ ভীরুতা তার সঙ্গে জড়িত। তার গায়ে যে ছাপ পড়েছে তা চরম উৎকর্ষের নয়।

জুলিয়েট এখন পরিপক্ক ফলের মতো সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। সমস্ত শরীরে তার সূর্যের সোনালি গোলাপি আভা, হৃদয় তার সদ্য ঝরে-পড়া পূর্ণবিকশিত গোলাপের মতো। সে চেয়েছিল—দুরন্ত যার রক্তস্রোত সেই লাজুক চাষী পুরুষের কাছে গিয়ে তার সন্তানের জননী হতে। কিন্তু তার মনের কামনাগুলি পাপড়ির মতো ঝরে গেছে। সেই রৌদ্রদগ্ধ মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস সে দেখেছে, দেখেছে বহ্নিশিখা তার নীল চোখে, আর তার উত্তরে, তার নিজের ভেতর থেকে আগুনের হল্‌কা ছুটে বেরিয়েছে। জুলিয়েটের কাছে সে আর এক সূর্যস্নানের মতোই হতে পারত, আর তাই জুলিয়েট চেয়েছিল।

কিন্তু তার পরের সন্তান মরিসেরই হবে। অমোঘ ঘটনা-শৃঙ্খলে তাই হতে বাধ্য।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

পলাতকা

ভেবেছিল এ বিয়ে অন্য পাঁচটা বিয়ের মতো হবে না। এ বিয়ে হবে একটা সত্যিকার অ্যাড্‌ভেঞ্চার! পাত্রটি এমন যে কিছু অসামান্য, তা নয়। বয়েসে ওর চাইতে বিশ বছর বড়। ছোটখাটো লোকটি—ইস্পাতের তারের মতো শক্ত প্যাঁচ-খাওয়া শরীর, বাদামিরঙা চোখ, মাথার চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে। অনেক বছর আগে নিতান্ত বালক বয়েসে এসেছিল হল্যাণ্ড থেকে—বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলে। পশ্চিম আমেরিকার সোনার খনি অঞ্চল থেকে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে, শেষ পর্যন্ত স্থিতি লাভ করেছে সুদূর দক্ষিণে, মেক্সিকোর অন্তস্তলে, সিয়েরা মাদ্রের অরণ্য সঙ্কুল প্রদেশে। আজকাল ও রূপোর খনির মালিক, অবস্থার বেশ একটু উন্নতি হয়েছে। বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত—সেই হল ওর জীবনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার। আসল মানুষটা এমন কিছু রোমাঞ্চকর নয়। সে যাই হোক, বহু বাধা-বিপদ অতিক্রম করেও লোকটা ঝিমিয়ে পড়েনি। ওকে দেখলেই মনে হয় ওর ভেতর একটা শক্তি যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যতটুকু করেছে আপন হাতে খেটে করেছে, বাইরের কারো সাহায্য নেয়নি। মোট কথা লেডারম্যান আলাদা ধাঁজেরই মানুষ, শ্রেণী গোত্রের বাইরের লোক।

স্বামীর ঘর করতে এসে মেয়েটি যখন স্বচক্ষে লেডারম্যানের কীর্তি-কলাপ দেখতে পেল—তখন মন ওর বেশ একটু দমে গিয়েছিল। যতদূর চোখ যায় সবুজ চূড়োওলা উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, আর তাদেরই মাঝখানে প্রাণস্পন্দহীন নির্জনতায় রূপোর খনি থেকে তোলা লালচে রঙের মাটির স্তূপ। এই মাটির স্তূপের কাছে নিরাবরণ কারখানার একটু নিচে

ওদের কাঁচা-গাঁথুনি একতলা বাড়ি, চারদিকে দেয়াল ঘেরা উঠোনের মাঝখানে একটি বাগান, চওড়া ঢাকা বারান্দার দুপাশে লতানে গাছের ঝোপ। এই দেয়ালে ঘেরা উঠানের মাঝখানে ফুলবাগানে দাঁড়িয়ে যদি তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, খনির আবর্জনার [illegible]লো মাথাটা; তার ঠিক পিছনে আকাশের গা ছুঁয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে মাটি থেকে ধাতু নিঙড়ে নেবার কলকারখানা। আর কিছু চোখে পড়ে না। অবশ্য সদরের প্রকাণ্ড কবাট দুটো প্রায় খোলাই থাকে। সেই দুয়োরটুকু পেরিয়ে গেলেই বাইরের বিস্তীর্ণ জগত, প্রাণীবিহীন অরণ্যবসনা পর্বত-শ্রেণী একটির পর একটি স্তরে স্তরে উঠে গেছে। কোথায় বা ওদের শুরু আর কোথায় বা শেষ কেউ জানে না। শরৎকালে পাহাড়গুলো সবুজ শস্যে ঢাকা, অন্যান্য ঋতুতে ওদের চেহারা লালচে, শুকনো, অবাস্তব!

ভাঙা ঝরঝরে একটা ফোর্ড এ লেডারম্যান কখনো কখনো ওকে কাছা-কাছি একটা স্থানীয় শহরে নিয়ে যায়। পাহাড়ের মাঝখানে ঘুপসি মেরে এই ছোট্ট শহরটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের জগত এর কোনো খবর রাখে না। কাঁচা ইঁটের তৈরি মস্ত উঁচু গির্জা—গোরস্তানের মতো নিস্তব্ধ, হাটে দাঁড়ালে হাঁপ ধরে। প্রথম যেদিন হাটে আসে সেদিনকার কথা ও ভুলতে পারেনি। মাংসের দোকানে আর শাকসবজির দোকানের মাঝরাস্তায় পড়ে ছিল একটা মরা কুকুর। পা দুটো টান করে পড়ে আছে তো আছেই, কেউ ফেলে দেবার নাম করে না। এ শহরটায় সব যেন মরে গেছে, নিঃঝুম-নিস্তব্ধ।

যেখানে যায় সবারই মুখে ওই এক কথা: রূপো, রূপো, রূপো। ফিস ফিস করে বলে, জোরগলায় বলার জো নেই। রূপোর বাজার মন্দা। যুদ্ধ এল আর দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। দাম আর চড়ে না। লেডারম্যানের খনির কাজ বন্ধ। ওরা কিন্তু এখনো ওদের সেই কাঁচা-

ইঁটের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি, কারখানার নিচে সেই যে ওদের দেয়ালঘেরা বাড়ি, উঠোনে যার মরাফুলের বাগান।

ওদের দুটি সন্তান—ছেলেটি বড়, মেয়েটি ছোট। মেয়েটির সেই ঝিমিয়ে পড়া অভিভূত ভাবটা দূর হতে না হতেই ছেলের বয়স প্রায় দশ হতে চলেছে। ওর নিজের বয়স তেত্রিশের কোঠায়। বাড়ন্ত গড়ন, শরীরে একটু মেদের আভাস দেখা দিয়েছে। ওর বেঁটে-খাটো, শক্তসমর্থ স্বামী তেপ্পান্নয় পা দিয়েছে। কিন্তু তা হলে কি হয়। ইস্পাতের তারের মতো শক্ত প্যাঁচ দেওয়া শরীরে এখনো ওর অটুট শক্তি। আজকাল ওর তেজও খানিকটা কমে গেছে মনে হয়। স্ত্রীকে ও আগেকার মতো তেমন করে আর পায় না, তা ছাড়া রূপোর বাজারও মন্দা।

লেডারম্যান লোকটার নীতিজ্ঞান খুব প্রখর। স্বামী হিসেবেও ওর কোনো দোষ দেখতে পাওয়া যায় না, বরঞ্চ খানিকটা স্ত্রৈণ বলাও চলে। প্রথম দেখার সেই উজ্জ্বল লগ্নটি ও এখনো ভুলতে পারেনি। কিন্তু মনে মনে ও এখনো কুমার। নির্বান্ধব অবস্থায় একলা মানুষ বৃহৎ জগতের মাঝখানে ছিটকে পড়েছিল সেই দশ বছর বয়েসে। বিয়ে যখন করল তখন ওর বয়স চল্লিশের ওপর, ইতিমধ্যে অবস্থারও খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তা হলে কি হয়, কুমার স্বভাবটা তখন ওর চরিত্রের অন্তস্থলে প্রবেশ করেছে। ওর কারখানা যেমন ওর নিজ হাতে গড়া সৃষ্টি, তেমনি ওর স্ত্রীটিও যেন উপার্জিত সম্পত্তি বিশেষ। তফাত এইমাত্র যে এ সম্পত্তিটি আরো নিকট—আরো অন্তরঙ্গ!

স্ত্রীকে ও কেবল ভালোবাসে বললে যথেষ্ট বলা হয় না—তাকে দেখে ও আশ্চর্য হয়ে যায়। তার শরীর, তার দেহভঙ্গিমার প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখে দেখে ওর বিস্ময়ের অন্ত নেই। লেডারম্যানের চোখে এখনো ওর স্ত্রী সেই বার্কলেবাসিনী ক্যালিফোর্নিয়ান মেয়ে থেকে গেছে; সেই যাকে প্রথম দেখে ওর চোখ ঝলসে গিয়েছিল। ও যেন—আরব দেশীয় শেখ—স্ত্রীকে

ও বহুমূল্য সম্পত্তির মতো চিহুয়াহুয়ার গিরিদুর্গে কড়া পাহারায় রেখেছে। সে যেন ওর রূপোর খনি, প্রাণ ধরে চোখের আড়াল করতে পারে না। একি কম কথা!

এক দেহ ছাড়া আর সব বিষয়ে এই তেত্রিশ বছর বয়েসে ও এখনো সেই বার্কলেবাসিনী মেয়েটিই থেকে গেছে। আশ্চর্য বলতে হবে বিয়ের পর থেকে ওর মন একটুও বাড়তে পারেনি। দেহ ও মন—এই দুটো দিক থেকেই, ওর স্বামী ওর কাছে কখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। লেডারম্যানের প্রৌঢ় বয়সের অপরিমিত মোহ না স্পর্শ করেছে ওর দেহকে, না করেছে মনকে। আশ্চর্য বলতে হবে, বিয়ের পর ওর মন একটুও বাড়তে পারেনি, যেখানে ছিল ঠিক সেই জায়গায় থেমে গেছে। স্বামী হিসাবে লেডারম্যান ওর কাছে অবাস্তব, কেবল নীতির থেকে ও স্বামীর অনুগত, সেখানে ও হার মেনেছে প্রভুর কাছে দাসীর মতো।

এইভাবে কেটে গেল বছরের পর বছর ওদের সেই রোদে ঝলমল উঠোন ঘেরা বাড়িতে, সেই রূপোর কারখানার পায়ের তলায়। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা—ওর স্বামীর ধাত নয়। রূপোর বাজারে মার খেয়ে ও লেগে গেল পশুপালনের কাজে। ওদের বাড়ি থেকে বিশমাইল দূরে তৈরি করল শূয়োর পালবার খোঁয়াড়, বাজারে ছাড়তে লাগল নাদুস-নুদুস জাতশূয়োর। এদিকে জন্তুজানোয়ারের প্রতি ওর ঘৃণার অন্ত নেই। পশুপালনের শারীরি দিকটা ওর কাছে কদর্য মনে হয়। আসলে লোকটা ভালোবাসে কাজ—কোনো কিছু একটা গড়ে তোলা। ওর বিয়ে ওর ছেলে মেয়ে—সব যেন ওর ব্যবসার মতো লেডারম্যান আপন হাতে গড়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে মুনাফাটা অবশ্য হৃদয়গত—তবু মুনাফা তো বটে!

ধীরে ধীরে মেয়েটির স্নায়ুতে টান পড়তে লাগল। ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে—এই কারাগার থেকে মুক্তি পেতে হবে। তিনমাসের জন্য ওর

স্বামী ওকে বেড়াতে নিয়ে গেল এল্‌পাসো। হলোই বা মেক্সিকোর প্রতিবেশী তবু এলপাসো ইউনাইটেড্‌ স্টেটসে তো বটে।
কিন্তু সেখানেও মুক্তি নেই, স্বামী যেন ওকে যাদু করেছে। তিন মাস দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। ফিরে এল সেই পুরানো মানুষ, পুরানো সেই কাঁচা-গাঁথুনি বাড়িতে। একঘেয়ে পাহাড়ের সারির দিকে তাকালে মন যেন খাঁ খাঁ করে—কী বিরাট শূন্যতা চারদিকে—অনাবিষ্কৃত অজানার মতো শূন্য। সময় কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েকে পড়ায়, কখনো বা মেক্সিকান চাকর-বাকরের কাজকর্ম তদারক করে। কালে ভদ্রে লেডারম্যান অতিথি সঙ্গে করে আনে বাড়িতে—বেশির ভাগ অতিথিই স্পানীয় অথবা মেক্সিকান, কদাচিৎ আসে ওদের আপন জাতের মানুষ।
স্বজাতিকে অতিথি হিসেবে পেলে ওর স্বামী যতটা না খুশি হয় তার চাইতে অনেক বেশি ভোগে অশান্তিতে। বলা বাহুল্য অশান্তিটা ওর স্ত্রীকে নিয়েই। স্ত্রী যেন ওর রূপোর খনির গোপন একটি স্তর; ও ছাড়া আর কেউ এই গুপ্তধনটির কথা পাছে জেনে ফেলে সেজন্য ওর আশঙ্কার অন্ত নেই। এই শ্রেণীর অতিথিরা বেশির ভাগই যুবক—খনির ইঞ্জিনিয়ার। ওদের দিকে অতি সহজেই মেয়েটির মন আকৃষ্ট হত; ওর স্বামীর মনও যে আকৃষ্ট না হত তা নয়। কিন্তু তা হলে কি হয়—স্ত্রী যে ওর নয়নের মণি। অপর কেউ তার দিকে নজর দিলেই ওর ভয় হয় যেন বহুমূল্য খনিটা লুঠতরাজ হয়ে গেল, যেন ওর এই গুপ্তধনটির রহস্য আর ঢাকা থাকল না।
এই যুবক অতিথিদের একজন সবার প্রথম মেয়েটির মাথায় এ খেয়ালটা ঢোকায়। সেদিন ওরা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল বাইরের বিস্তীর্ণ জগতের দিকে। বর্ষার শেষ—সেপ্টেম্বর মাস, চিরপুরাতন অচল অটল গিরিশ্রেণী—সবুজ। পাহাড়ের কোথাও জনপদের চিহ্ন নেই,

পাদদেশে পরিত্যক্ত খনি, বন্ধ কারখানা আর গোটাকয়েক খনির মজুরদের কুঁড়ে ঘর।

যুবকটি বললে, 'খাঁ খাঁ করছে পাহাড়গুলো—পাহাড়ের পেছনে যে কি আছে, আমার ভারি জানতে ইচ্ছে হয়।'

লেডারম্যান বললে, 'কি আবার থাকবে, পাহাড়ের পর পাহাড়। পাহাড় ডিঙিয়ে যাও তো সোনোরা হয়ে পৌছুবে সমুদ্রের ধারে। এপাশে মরুভূমি, ওপাশে আবার নতুন পাহাড়, নতুন পর্বত।'

'তা তো বুঝলাম, পাহাড়ে-পর্বতে কারা থাকে সেইটে জানতে ইচ্ছে হয়। নিশ্চয় আশ্চর্য অদ্ভুত কিছুর বাস ওখানে। দেখে দেখে মনে হয় এই পাহাড়ের দেশটা যেন আমাদের পরিচিত জগত থেকে আলাদা—যেন পৃথিবী ছেড়ে চাঁদের দেশে এসেছি।'

'এসব পাহাড়-পর্বতে শিকার করতে চাও তো শিকার পাবে বিস্তর। আর পাবে রেড ইণ্ডিয়ান—তাদের তুমি সৃষ্টিছাড়া বলতে চাও তো বলতে পারো অবশ্য।'

'এরা জংলী রেড ইণ্ডিয়ান না কি?'

'দস্তুরমত জংলী—'

'কিন্তু ক্ষতি তো কিছু করেনা?'

'তা বলি কেমন করে। ওদের মধ্যে কোনো কোনো জাত আছে বিদেশী লোককে ধারে কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত দেয় না। আর প্রচারক তো দেখবা মাত্র খুন করে। যে দেশে মিশনারিদের পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ সে-দেশে আর কারু মাথা সেঁধুবার জো নেই।'

'এদেশের গভর্নমেণ্ট কিছু বলে না।'

'বলে লাভ? নাগালের এত বাইরে এরা থাকে যে গভর্নমেণ্ট বড়ো একটা এদের ঘাঁটায় না। ভীষণ ধূর্ত জাত। গোলমালের কোনো সম্ভাবনা দেখলেই দল বেঁধে আসে চিহুয়াহুয়ায় দরবার করতে। এইটুকুতেই

গভর্নমেণ্ট খুশি থাকে।' 'ওরা কি তবে একেবারে সেই বুনো অবস্থায় থেকে গেছে, ওদের সেই বর্বর-প্রথা বা ধর্ম, একটুও বদলায়নি?'

'কিছুমাত্র না। তীর ধনুক ছাড়া অন্য অস্ত্র ব্যবহার করে না। শহরের বড রাস্তায় মাঝে মাঝে ওদের দেখেছি, অদ্ভুত ধরনের ফুলের কাজ করা টুপি মাথায়—এক হাতে ধনুক, শীতের দিনেও কেবল একটা পিরান গায়ে, খালি পায়ে হন হন করে হেঁটে চলেছে।'

'যাই বলুন, কিন্তু পাহাড়ের কোলে লুকোনো ওদের ওই নিভৃত গ্রামগুলো আমার কাছে খুব রহস্যময় ঠেকে।'

'রহস্য আবার কোথায়? জংলীরা জংলীই—অসভ্য জাতদের জীবন সর্বত্র ওই একই রকম, নীচু স্তরের নোংরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন জীব। তা বলে সেয়ানা কিছু কম নয়। পেটের ধান্দায় সারাজীবন গতর খাটায়।'

'কিন্তু কতদিনের পুরানো ওদের ধর্ম, কত প্রাচীন ওদের সংস্কার। রহস্যময় বই কি!'

'ব্রতসংস্কারের কথা জানিনা। যত সব বর্বর ব্যাপার, হৈ-হুল্লোড়, অশ্লীল কুৎসিত সব কাণ্ড। ওদের জীবনে আমি তো আশ্চর্য কিছু খুঁজে পাইনা। লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্কে থাকবার পর আর কোথাও চমকে দেবার মতো কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্কে তো সকলেই থাকে।' যুবকটি এমনভাবে কথাটা বললে যেন ওটা বৃত্তিবিশেষ।

এই অজানা রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে জানবার আবছা অথচ অদম্য একটা ইচ্ছা মেয়েটিকে পেয়ে বসল। অল্পবয়সী মেয়েদের মতো ওর মনের মধ্যেও যেন রূপকথা বাসা বাঁধল। ওর মনে মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস হল যে অদৃষ্ট একদিন ওকে নির্ঘাত নিয়ে যাবে পাহাড়ের ভেতরকার সেই গোপন মায়াপুরীতে, সময় যেখানে একটা জায়গায় এসে থমকে গেছে,

যেখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবন যাত্রার গোপন রহস্যগুলো ওর অপেক্ষায় বসে আছে।

কাউকে কথাটা প্রকাশ করল না। যুবকটি চলে যাচ্ছে, লেডারম্যানও সঙ্গে যাচ্ছে টোরিওন অবধি। কী একটা কাজ আছে সেখানে। কিছুদিন টোরিওনে থাকার কথা। যাবার আগে অবধি ও কোনো একটা ছুতোয় স্বামীকে দিয়ে কেবল রেড ইণ্ডিয়ানদের গল্প করিয়ে নিয়েছে। মুক্ত স্বাধীন নাভাজোদের মতো কোন কোন জাত এখনো পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়ায়, সোনেরার ইয়াকুইদের কথা, চিহুয়াহুয়ার বিভিন্ন উপত্যকার বিভিন্ন দলের কথা—সব তন্ন তন্ন করে জেনে নিয়েছে।

দক্ষিণের অতি উচ্চ উপত্যকায় চিলচুই নামে একটা জাত আছে, রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে তারা হল সবার সেরা জাত। কিম্বদন্তী এই যে রেড ইণ্ডিয়ানদের সর্বপ্রাচীন রাজবংশের অধস্তন পুরুষেরা এই জাতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ওদের অতিবৃদ্ধ পুরোহিতেরা এখনো নাকি তাদের প্রাচীন ধর্মব্যবস্থা বজায় রেখেছে—মায় নরবলি দেওয়া শুদ্ধু। কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ নতুন তথ্য আবিষ্কারের নেশায় চিলচুই অঞ্চল ঘুরে ফিরে এসেছে। খিদেয় পথের কষ্টে শীর্ণ ক্লান্ত হাবাতের মতো চেহারা, সঙ্গে এনেছে অসভ্যদের অদ্ভুত সব পূজোর সামগ্রী। নিরন্ন নিরানন্দ মরুর মতো ওদের বস্তি—সেখানে অসাধারণ কিছু খুঁজে পায়নি। লেডারম্যান যদিচ এসব কথা বলতো নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে, তবু এটা স্পষ্টই বোঝা যেত, অসভ্যদের রোমাঞ্চকর জীবন সম্বন্ধে ওর নিজের কৌতূহল কিছু কম ছিল না।

'কতদূরে ওদের বসতি ?' স্ত্রী জিগগেস করে।

'ঘোড়ায় চড়ে তিনদিনের রাস্তা। কুচিটি ঘুরে পাহাড়ের ওপরকার একটা ছোট হ্রদের পাশ কাটিয়ে যেতে হয়।'

ওর স্বামী ও যুবকটি চলে গেলে পর ও মনে মনে ওর অদ্ভুত ফন্দীগুলো

আঁটতে লাগল। কিছুদিন আগের থেকে ও ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস করেছে। একঘেয়ে জীবন থেকে একটু মুক্তি পাবার জন্য ক্রমাগত ওর স্বামীর কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে এই সুবিধাটি আদায় করেছে। প্রায়ই যেত স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে। অরাজক বর্বর দেশ, কোথায় কি বিপদ ঘটে, এই ভয়ে ওকে একা বেরুতে দেবার হুকুম ছিল না।

ওর নিজের চড়ার জন্য একটি আলাদা ঘোড়া ছিল। প্রায়ই স্বপ্ন দেখতো ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই আগেকার মতো মুক্ত স্বাধীন একটি মেয়ে।

ওর নয় বছর বয়সের মেয়ে পাঁচমাইল দূরের ছোট্ট একটি স্পানিয় শহরের ততোধিক ছোট্ট একটি কনভেণ্টে ভর্তি হয়েছে। খনির সম্পদের মূল্য কমবার সঙ্গে সঙ্গে এই শহরটিও জনবিরল হয়ে পড়েছে।

বাড়ির চাকর ম্যানুয়েলকে ডেকে কর্ত্রী বললেন, 'ছাখো ম্যানুয়েল, আমি যাচ্ছি কনভেণ্টে, মার্গারিটাকে দেখেও আসবো সেই সঙ্গে কতকগুলো জিনিসও দিয়ে আসবো। আজ রাত্তিরটা বোধহয় কনভেণ্টেই থাকবো। তুমি ব্রেডির দেখাশুনো কোরো! দেখো আমি না আসা অবধি সব যেন ঠিকমতো চলে।'

'কর্তার ঘোড়ায় চড়ে আমি সঙ্গে যাবো না জুয়ান যাবে?' চাকর জিগগেস করল।

'কাউকেই যেতে হবে না। আমি একাই যাবো।'

আপত্তির ভাব করে ছোকরা-চাকর কর্ত্রীর দিকে তাকালো—অসম্ভব, একা যাবে কি করে।

শান্ত অথচ কঠিন সুরে প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিয়ে দিয়ে কর্ত্রী কেবল বললেন, 'হ্যাঁ, আমি একাই যাবো।' এই স্পর্ধার কাছে ভৃত্যের মাথা আপনা থেকেই নিচু হয়ে গেল।

বিভিন্ন ঠোঙায় শুকনো রসদগুলো ও যখন গুছিয়ে রাখছে—ছেলে জিগগেস করল, 'হ্যাঁ মা তুমি একা যাবে কেন?'

'কেন যাবোনা। সারা জীবন এই একভাবে কাটল, দুদণ্ড ছেড়ে দিবি না তোরা?' আচমকা এই শক্ত কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে। ছেলেটিও ম্যানুয়েলের মতো চুপ করে সরে গেল।

একটুও ইতস্তত না করে বেরিয়ে পড়ল ওর তেজী ঘোড়ায় চড়ে। পরনে হাতে বোনা মোটা কাপড়ের তৈরি ব্রীচেস, ওপরে তার রাইডিং স্কার্ট, শাদা ব্লাউসের ওপর রক্তের মতো লাল নেকটাই,মাথায় কালো ফেল্টের টুপি। জিনের ভেতরকার থলেতে রসদপত্র বাঁধা, পানীয় জল ভর্তি টিন, জিনের পেছনে বাঁধা দিশী কম্বল। দূরের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ও বেরিয়ে পড়ল। ম্যানুয়েল ও ছোট ছেলেটি সদরদরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাত নেড়ে ওদের বিদায় সম্ভাষণ করতে ও ভুলে গেল।

মাইল খানেক যাবার পর ও ডানহাতি একটা জঙ্গলের পথ ধরল। পথ এঁকে বেঁকে গেছে আর একটি উপত্যকার মধ্যে—কোথাও গভীর খাদ, প্রকাণ্ড বনস্পতির পাশ দিয়ে আর একটি জনহীন খনির মজুরদের বস্তির ভিতর দিয়ে পথ গেছে এঁকেবেঁকে। শরৎকালের আরম্ভ—বস্তির লোক যে নদীর জল খেতো সে নদী এখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ঘোড়া থেকে নেমে ও এক আঁজলা জল খেয়ে নিল, ঘোড়াকেও ছেড়ে দিল জল খেতে।

দূরে উৎরাই-এর উপর গাছের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি রেড ইণ্ডিয়ান দেখা গেল। ওরাও ওকে দেখেছে, কেবল দেখেছে নয় চোখে-চোখে রেখেছে। ও দেখল তিনটি লোক দুটি মেয়ে একটি বালক—ওর ধারে কাছে যাতে না আসতে হয় সেজন্য অনেকখানি দূর দিয়ে ঘুরপথে যাচ্ছে। ওর মনে কোনো ভয়-ভাবনা নেই। চারিদকের নীরবতা ভেদ করে ও উপত্যকার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল, রূপোর খনি, মজুরদের বস্তি সব

পেরিয়ে। এখনো চলনসই রকমের একটা পথের চিহ্ন এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে টুকরো টুকরো পাথরের উপর দিয়ে। এ-পথটা ওর পরিচিত, দু-একবার স্বামীর সঙ্গে এপথে সে এসেছে ও। কিন্তু ওই পর্যন্ত, ও জানে এখন এই পথ ছাড়িয়ে ওকে দক্ষিণের দিকে যেতে হবে।

আশ্চর্য বলতে হবে ওর মনে লেশমাত্র শঙ্কা নেই। ভয়ের দেশ পেরিয়ে চলেছে; চারদিকে একটা থমথমে স্তব্ধতা। পাহাড়ের সুগভীর খাদগুলো দেখলে বুকের ভেতর যেন টিপটিপ করে। দূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝাপসা ভাবে দেখা দিয়ে সরে যায় অসভ্য লোক দুটো-একটা, চোখে তাদের ক্রূর সন্দেহের আভাস। প্রকাণ্ড মাছের মতো নিঃশব্দচারী শকুনি ও চিল কখনো বা দূর আকাশে গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছে। কোথায় বোধ হয় কোনো জন্তু মরেছে, কিংবা হয়তো উড়ছে নিঃসঙ্গ কোনো খোঁয়াড়ের অথবা দূরের কোনো বস্তির ওপর।

ও যত ওপরে উঠছে ততই গাছগুলো যেন আকারে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। পথ এঁকে বেঁকে চলেছে কাঁটাগাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে। ঝোপের ওপর নীলমনি লতা আবার কখনো লালচে রঙের ছোট ফুলওয়ালা লতা গা এলিয়ে আছে। কিছু পরে আর ফুল চোখে পড়ে না। ইতিমধ্যে ও পাইন গাছের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

পাহাড়ের চূড়ো থেকে ও নাবতে নাবতে দেখলে সামনে আর একটি জনহীন বসতিহীন শব্দহীন উপত্যকা। ততক্ষণে বেলা দুপুর পেরিয়ে গেছে। ঘোড়া আপনা থেকেই একটা ছোট্ট পাহাড়ে ঝর্নার দিকে পথ নিল। মেয়েটিও নেবে পড়ল দুপুরের খাওয়া সেরে নেবার জন্য। বসে বসে তাকিয়ে রইল প্রাণহীন স্পন্দহীন উপত্যকার দিকে, সূঁচলো পাহাড়ের চূড়োর দিকে। দক্ষিণের দিকে পাহাড় উঁচুতে উঠেছে। উপরে কেবল পাথর আর পাইন। দুপুরে রোদ্দুরে আরাম করে ও ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করল, কাছাকাছি ঘোড়াটা লতাগুল্ম চিবোতে লাগল।

এই নীরব নির্জনতায় ওর একটুও ভয় নেই। বরঞ্চ ভালোই লাগছে এই নিঃসঙ্গতা—এ যেন প্রচণ্ড তৃষ্ণার পর এক আঁজলা সুশীতল জল। ওর মনের গভীরে একটা কী যেন উল্লাস ওকে ঝিমিয়ে পড়তে দিচ্ছেনা। আবার ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে চলল। রাত্রে ঘন ঝোপের মধ্যে নদীর কিনারায় একটা ঢালু জমিতে ও শুয়ে পড়ল। পথে যেতে যেতে গোরু ভেড়া ওর চোখে পড়েছে, অনেকগুলি পায়ে-চলা পথও দেখেছে। কাছেই বোধ হয় পশু-পালনের খোঁয়াড় হবে। দূর থেকে শব্দ আসছে বনবেড়ালের ডাকের, কাতর কান্নার মতো তীক্ষ্ণ স্বর। ডাক শুনে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করে উঠছে। ও কিন্তু ঝোপের আড়ালে ওর ছোট্ট গুহাটির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে নির্ভয়ে বসে রইল। ওর সেই উল্লাস যেন উপচে পড়ছে, ওর মন ভেসে চলেছে একটা হালকা খুশির ওপর ভর করে।

ভোর হবার আগে কী প্রচণ্ড শীত। কম্বল মুড়ি দিয়ে ও তাকিয়ে রইল তারার দিকে। কানে আসছে ঘোড়ার কাঁদুনির শব্দ। ওর মনে হল ও যেন আর বেঁচে নেই। যেন পরপারে চলে গেছে। ও যেন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে শুনছে ওর ভেতরকার.মানুষটি ধ্বসে পড়া প্রকাণ্ড পাথরের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেই তো ওর মৃত্যুর শব্দ। কে জানে। হয়তো শব্দটা এল পৃথিবীর গর্ভ থেকে ; সেখানে কী যেন একটা ভীষণ ওলটপালট ঘটে গেল রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারে।

প্রথম আলো উঁকি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ল। শীতে গা হাত পা অবশ হয়ে গেছে। আবার আগুন ধরালো। ঝটপট খাওয়া সেরে নিল, ঘোড়াকে দিল কয়েকটা খোলের টুকরো। তার পর আবার যাত্রা শুরু। লোকজন এড়িয়ে চলল। ওর সঙ্গেও কারুর দেখা হলো না। ওকেও যেন সবাই এড়িয়ে চলছে। কিছুদূর গেলে পর চোখে পড়ল কুচিটি গ্রাম—বাড়িগুলোর দেয়াল কালো, ছাদও কালো-রঙা। ছেড়ে-চলে-যাওয়া

খনির ধারে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর যেন পিঠোপিঠি বসে আছে। চারদিকের আবহাওয়ায় একটা স্তব্ধ বিপদের ছোঁওয়া লেগেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের ফিকে সবুজ দেহ লম্বা রেখা টেনে চলে গেছে, তার ওপারে পাইন শ্রেণীর ঘন সবুজ, তারও ওপর নিরাবরণ ধূসর পাথরের সার আকাশ ভেদ করে উঠেছে। কেউ যেন কশাঘাত করে পাথরের পিঠের চামড়া তুলে দিয়েছে। এরই মধ্যে জমাট বরফের রেখা দেখা দিয়েছে, পাহাড়ের চূড়ার ওপর বরফের স্তূপ।

ওর গন্তব্যস্থানের যত কাছাকাছি ও এগোচ্ছে ততই ও কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগল—একটা অনিশ্চয়তা ওকে যেন পেয়ে বসেছে। ছোটো হ্রদটি পেরিয়ে এসেছে। হ্রদের ধারে গাছের সার; পাতা শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে। গাছের গুঁড়িগুলো ধবধবে শাদা ও মসৃণ—ঠিক যেন মেয়েদের নিটোল হাতের মতো। কী চমৎকার দৃশ্য—এ যদি ক্যালিফোর্নিয়ায় হত তো ও এর সৌন্দর্য দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। এখানে ওর চোখ চেয়ে দেখছে, মনও বলছে জায়গাটা রমণীয়, কিন্তু ভেতর থেকে ও কেমন যেন উৎসাহ পাচ্ছে না। দু রাত খোলা জায়গায় ঘুমিয়ে আসন্ন রাত্রির আশঙ্কায় ও যেন পূর্ব থেকেই ক্লান্ত, শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছে কেনই বা যাচ্ছে তা যেন ও জানে না। ঘোড়াও নির্জীব ভাবে মন্থর গতিতে এগোতে লাগল সেই পাহাড়ের বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে, পাথরের কুচি বিছানো চলা পথের ভেতর দিয়ে। সমস্ত আবহাওয়ায় যেন একটা স্তব্ধ নিষেধ মূর্তিমান। ওর স্বকীয় ইচ্ছা বলে কিছু একটা যদি থাকত তাহলে ও নিশ্চয় প্রতিবেশী গ্রামের দিকে ফিরে যেত। সেখানে হয়তো রাত্রির একটা আশ্রয় মিলত, হয়তো সেখানকার লোকেরা ওকে পৌঁছে দিত ওর স্বামীর কাছে।

ওর ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছে। ঘোড়া চলছে ছোট পাহাড়ে নদীর জল ভেঙে ছপ ছপ শব্দ করে। মোড় ঘুরল উপত্যকার দিকে, মাথার ওপর

বিরাট বনস্পতির জঙ্গল। ইতিমধ্যে ও প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছে। উঁচু স্তরের হালকা হাওয়া. তার ওপর এই দুই দিন ব্যাপী ক্লান্তিতে ওর মাথাটাও হালকা হয়ে গেছে। ভাবনা চিন্তা করবার আর ক্ষমতা নেই। জঙ্গলের মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের প্রাচীর—পথের দুই দিকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। যেন ওকে টিপে পিষে মেরে ফেলতে চায়। দেখে দেখে ওর দম আটকে আসে। ঘোড়া আপন মনে চলেছে তো চলেইছে। এই দমবন্ধ করা সংকীর্ণ রাস্তায় এগিয়ে চলা ছাড়া গতি নেই।

হঠাৎ ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। সামনে কালো কালো কম্বল পরা তিনটি মূর্তি।

গম্ভীর চাপা গলায় সম্ভাষণ এল : 'আডিয়োস !'

মেয়েটি তার স্পষ্ট আমেরিকান উচ্চারণে প্রত্যুত্তর দিল, 'আডিয়োস।'

স্পানিশ ভাষায় প্রশ্ন হল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

কালো কম্বলপরা লোকগুলো কাছে ঘেঁষে এল, তাকিয়ে দেখতে লাগল ওর দিকে।

কাটা কাটা উচ্চারণে ও নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'এই সামনের দিকে।' ওর কাছে এ-লোকগুলি নেটিভ ছাড়া কিছু নয়। কালো কালো মুখ, শক্ত সমর্থ চেহারা, গায়ে কালো কম্বল, মাথায় বেতের টুপি। ওর স্বামীর খনির মজুরদের মতোই চেহারা, কেবল একটি জায়গায় তফাৎ। এদের মাথায় সোজা সোজা লম্বা কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে আছে। চুল দেখে ওর কেমন বিচ্ছিরি লাগল—তবে এ লোকগুলোই সেই অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ান। যাদের দেখবার জন্য ওর এতদূর আসা।

যে-লোকটি এ পর্যন্ত কথা বলছিল সে আবার শুধোল, 'কোথা থেকে আসছো ?' ওই একটি লোকই কথা বলছে—বয়সে যুবক, উজ্জ্বল কালো বড়ো বড়ো চোখ তীক্ষ্ণ তীর্যক দৃষ্টিতে পরোক্ষে মেয়েটিকে দেখছে। শ্যামবর্ণ মুখের ওপর নরম গোঁফের রেখা, থুৎনির ওপর একগুচ্ছ দাড়ি

গজিয়েছে—মাত্র গুটিকয়েক চুল। মাথার লম্বা চুল অবিন্যস্ত ভাবে কাঁধের ওপর এলিয়ে আছে—কালো কুচকুচে জীবন্ত সাপের মতো। ময়লা রঙ ভেদ করে গায়ের ময়লা দেখা দিচ্ছে। লোকটা বেশ কিছু দিন স্নান করেনি।

অপর দুটি সঙ্গীর ওই একই রকম চেহারা, শক্ত সমর্থ দেখতে, মুখে রা নেই। এরা বয়সে যুবকটির চাইতে বড। একটির মুখে সরু গোঁফের রেখা—দাড়ি নেই। আর একটির গাল পরিষ্কার মসৃণ, কেবল থুৎনির সীমান্তে কালো কালো কয়েকটি চুল।

প্রশ্নটা এড়িয়ে ও জবাব দিল, 'আমি আসছি অনেক দূরের দেশ থেকে।' ওরা তিন জন চুপ।

আবার সেই একই ভাবে যুবক রেড ইণ্ডিয়ানটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় থাক ?'

ও জিজ্ঞাসাটা গায়ে না মেখে বলল, 'থাকি উত্তর দিকে।'

আবার কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। দুজন সঙ্গীকে নিচু গলায় যুবকটি নিজেদের ভাষায় কি যেন বলল।

সামনের সংকীর্ণ পথের দিকে ইঙ্গিত করে যুবক বেশ একটু কঠিন সুরে হঠাৎ জিগগেস করল, 'কোথায় যেতে চাও—এই রাস্তায় ?' এ যেন প্রশ্ন নয় দাবী।

মেয়েটি তেমনি অল্প কথায় বলল, 'যাচ্ছি চিলচুই ইণ্ডিয়ানদের গাঁয়ে।'

যুবকটি ওর দিকে তাকালে, কালো চোখে তীক্ষ্ণ অমানুষিক দৃষ্টি। সূর্যাস্তের আলোয় দেখল মেয়েটির মুখ—শান্ত পরিপুষ্ট লাবণ্যময় মুখে অভয়ের মৃদু হাসি। ডাগর চোখের কোনায় শ্রান্তির নীল রেখা, দৃষ্টিতে খানিকটা ছেলেমানুষি নির্ভীকতা, খানিকটা আবার নারীত্বের দর্প। খানিক পরে আবার চোখের উপর ধ্যানীবুদ্ধের নির্লিপ্ততা ঘনিয়ে আসে।

'তুমি কি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ?' রেড ইণ্ডিয়ান জিগগেস করল।

'হ্যাঁ, আমি সম্ভ্রান্ত মেয়ে,' ও নির্বিকার ভাবে জবাব দিল।
'পরিবারে কেউ আছে ?'
'স্বামী আর দুটি সন্তান—এক ছেলে এক মেয়ে।'
রেড ইণ্ডিয়ান যুবকটি ওর কথা নিচু গলায় ভাষান্তর করে বলল। ওদের ভাষা যেন মাটির তলা থেকে উদ্গত ঝরনার জলের শব্দ। হাবভাব দেখে মনে হল ওরা যেন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।
'তোমার স্বামী কোথায় ?'
ও হালকা সুরে জবাব দিল, 'কে জানে ? এক হপ্তার জন্যে বেরিয়ে গেছে কাজে ।'
কালো কালো চোখগুলো ওকে যেন পরখ করে দেখছে। দীর্ঘ দুটি দিনের পুঞ্জীভূত ক্লান্তি সত্ত্বেও ওর মুখে অদ্ভুত হাসি। ওর এই অভিযানের গব ওর নারীত্বের তেজ আর এই পাগলামোর মোহ সব যেন মিশে গেছে ওই হাসিতে।
'এখন তাহলে কি করতে চাও তুমি ?'
'বলেইছি তো আমি যেতে চাই চিলচুই ইণ্ডিয়ানদের গাঁয়ে, দেখতে চাই ওদের বস্তি, জানতে চাই ওদের দেবদেবীকে।'
মুখ ঘুরিয়ে যুবকটি ঝটপট ওর কথাগুলো অনুবাদ করে বলতেই ওর সঙ্গীরা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওদের কাজকরা টুপির তলা থেকে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক দুটি অদ্ভুত তির্যক ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বজ্রগম্ভীর গলায় ওরা যুবকটিকে কি যেন বলল।
যুবকটি তখনও ইতস্তত করছে। এবার মেয়েটির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ। চলো যাই, কালকের আগে কিন্তু পৌছানো যাবে না। রাত্রিটা এখানেই কোথাও কাটাতে হবে।'
মেয়েটি বললে, 'বেশ তো। বাইরে শোওয়া আমার অভ্যাস আছে।'
আর কালক্ষেপ না করে ওরা চলতে আরম্ভ করল, জোর কদমে সেই

পাথরকুচির রাস্তা দিয়ে। যুবকটি ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে—অপর দুজন ছুটছে ঠিক ঘোড়ার পেছনে। এই পিছুওয়ালাদের মধ্যে একজন মোটা একটা গাছের ডাল কেটে নিয়েছে। ঘোড়াটার গতি একটু কমলেই ও লোকটা পেছন দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে প্রহার করতে লাগল। ঘোড়া আচমকা মার খেয়ে লাফিয়ে উঠল, সেই সঙ্গে আরোহিনীকে শক্ত জিনের ওপর বেশ একটু ঝাঁকুনি খেতে হল। একে মেয়ে, পথশ্রান্ত—এ ব্যাপারটায় ওর মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হল।

রাগে মুখ ঘুরিয়ে ও-লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'খবর্দার, ওরকম কোরোনা বলছি!' ওর চোখের ওপর চোখ পড়াতে মেয়েটির শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। কালো চোখ দুটো যেন জ্বলছে—ওকে দেখছে কঠিন ভাবে, ওর ওই শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী নারীদেহ ও-চোখের কাছে কিছু যেন নয়। যে কোনো পুরুষ যে কোনো মেয়ের দিকে যেভাবে তাকায় এ দৃষ্টি তা থেকে আলাদা। ও যেন লোকটার কাছে অচেনা অজানা কিম্ভূতকিমাকার জীব বিশেষ—দুর্জ্ঞেয় বলেই শত্রু। জিনে বসে এই দুটো চোখের দৃষ্টির কথা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হতে লাগল ও যেন মরে গেছে, যেন ও এ-জগতে আর নেই। আবার ঘোড়ার পিঠে লাঠির বাড়ি পড়ল, আবার সেই হাড়ভাঙা ঝাঁকুনি।

প্রভুত্বগর্বী শ্বেতাঙ্গিনীর সমস্ত রাগ যেন ফেটে পড়ল। রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে ও যুবকটির দিকে চোখ বাঁকিয়ে বলল, 'ও লোকটা ফের যেন আমার ঘোড়া না ছোঁয়, ওকে বলে দাও।'

চোখাচোখি হতে দেখল এর দৃষ্টিও সমান দুর্জ্ঞেয়। কালো মণির ওপর ঝিলিক খেলে যায়, সাপের চোখের মতো ক্রূর কুটিল দৃষ্টি। পেছনের দুটি লোককে ও নিচু গলায় কি যেন বলল। লাঠি হাতে লোকটা বক্তার দিকে না তাকিয়ে কথা শুনল, তারপর একটা অদ্ভুত শব্দ করে ভীষণ জোরে ঘোড়ার পিঠে মারল লাঠির বাড়ি। লাফিয়ে উঠে ঘোড়া চলল

এগিয়ে, পাথরের কুচি ইতস্তত ছিটকে পড়ল, অতি কষ্টে মেয়েটি জিন আঁকড়ে কোনো মতে বসে রইল। কি বিশ্রী ঝাঁকুনি!

রাগে ওর মাথা গরম হয়ে গেছে, চোখ লাল। কান থেকে সমস্ত রক্ত উঠে যেন চোখে চলে গেছে। শক্ত হাতে ও রাশ টেনে ধরল। কিন্তু ঘোড়া ঘুরোবার আগেই যুবক রেড ইণ্ডিয়ানটি ঘোড়ার গলার নিচে থেকে রাশ ছিনিয়ে নিল। লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সামনের দিকে আবার দৌড়ুতে শুরু করল।

আর ওর শক্তি নেই—সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। অসহ্য রাগ—সেই সঙ্গে একটা অস্ফুট আনন্দ শিহরণে ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল। ওর যেন আর অস্তিত্ব নেই।

সূর্য অস্তোন্মুখ। হলুদরঙা আলোর বন্যা এসে নিচের উপত্যকার শেষ গাছগুলো ধুয়ে দিয়েছে। উজ্জ্বল হলুদ রঙ লেগেছে পাইন গাছের পায়ের কাছে। পাইনের কালো পাতার রাশি মচমচ করে উঠছে, শিরদেশ সূর্যাস্তের আভায় সমুজ্জ্বল। এই জ্যোতির্ময় রাজ্যের ভেতর দিয়ে যুবক রেড ইণ্ডিয়ান ঘোড়ার রাশ ধরে অবিশ্রাম ছুটে চলেছে। গতির বেগে ওর কালো কম্বলটা ইতস্তত নড়ছে, কালো পা দুটো সূর্যের আলোয় অরুণ। মাথায় সেই ফুলের কাজ করা খড়ের টুপির ওপর পালক দুলছে, নিচে ঘন কালো চুলের ঢেউ। মাঝে মাঝে ঘোড়াকে উদ্দেশ করে নিচু স্বরে কি একটা ডাক দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে সেই লোকটি ঘোড়ার পিঠে প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিচ্ছে।

সূর্যের সেই বিচিত্র আভা ঝাপসা হয়ে আসে, সমস্ত জগত জুড়ে অন্ধকার নামে, একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। আকাশে এক ফালি চাঁদের ম্লান আলো পশ্চিমের শেষ-রশ্মির সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। পাহাড়ের খাদ থেকে ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার যেন গুহা থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসে। অদূরে জলস্রোতের শব্দ। ওর সমস্ত শরীর জুড়ে একটা

দারুণ অবসাদ, ঠাণ্ডা হাওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিমশীতল। কখন যে দিনের আলো নিভে গেল আর চাঁদ উঠল আকাশে তা ও দেখতেও পায়নি। ঘোড়ায় চড়ে চলেছে একটা ঘোরের মাথায়।

কয়েক ঘণ্টা ওরা চাঁদের আলোয় পথ চলল। হঠাৎ চলা থামল—ফিস্ফিস্ করে তিনজনে কি যেন কথা হল। যুবকটি বলল, 'এখানেই আজ আমরা রাত কাটাবো।'

ভেবেছিল লোকটা ওকে নামতে সাহায্য করবে। সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাড়িয়ে রইল, ঘোড়ার রাশ ধরে। ও জিন থেকে প্রায় যেন পড়ে গেল—এত ক্লান্ত।

ওরা প্রকাণ্ড একটা শিলাখণ্ডের নিচে একটা গুহা বেছে নিয়েছে। এখনো সে জায়গা থেকে একটু উত্তাপ আসছে। একজন পাইনের ডালপালা কাটতে লাগল, আর একজন ডালপালা দিয়ে বেড়া বাঁধল আশ্রয়ের জন্য, শোবার জন্য পাতল পাতার বিছানা। তৃতীয় লোকটি ইতিমধ্যে আগুন জ্বেলে রুটি সেঁকতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সবাই কাজ করছে চুপচাপ—কারো মুখে কথাটি নেই। মেয়েটি কেবল জল খেল। ওর খেতে ইচ্ছে নেই। হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারলে বাঁচে। জিগগেস করল, 'কোথায় শোবো ?'

যুবকটি বেড়ার একটা ধার দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। সেখানে হামা দিয়ে ঢুকে ও শক্ত হয়ে পড়ে রইল। ওর কপালে কি ঘটবে সে নিয়ে ওর একটুও ভাবনা নেই। ও এত ক্লান্ত যে সব চিন্তা ভাবনার বাইরে চলে গেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ও দেখতে পাচ্ছে ওরা তিনজন আগুনের চারধারে উঁচু হয়ে বসেছে, কালো কালো আঙুল দিয়ে আগুনেপোড়া রুটির টুকরো ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে, শুকনো লাউ-খোলের কমণ্ডলুতে আছে পানীয় জল। নিচু গলায় দু-একটি কথা হচ্ছে তারপর আবার সব চুপচাপ। ওর জিন ও জিনের নিচেকার থলে আগুনের অনতিদূরে পড়ে আছে

কেউ ছোঁয়নি, খোলেনি। ওর জিনিসপত্রের ওপর এদের কোনো লোভ নেই। বসে আছে আগুনের ধারে, মাথার টুপি খোলেনি—খেয়ে চলেছে যন্ত্রের মতো—জন্তুর মতো। কালো কম্বল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অনাবৃত পা—যেন জন্তুর মতো থাবা গেড়ে বসেছে। আর দেখা যায়—লেঙোটের মতো একফালি ময়লা কাপড়, এ ছাড়া ওদের পরনে আর কিছু নেই। মেয়েটি সম্বন্ধে ওদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ; ও যেন শিকার করা হরিণের মাংসের একটা তাল—বাড়ি নিয়ে যাবার পথে গুহার ভেতর ঝুলিয়ে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পর ওরা আগুন নিবিয়ে দিয়ে বেড়ার অপর ধারে শুতে গেল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে চাঁদের আবছা আলোয় কালো কালো চেহারা। একটা প্রতীয়মান ভয়ে ওর বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে—এবার ওরা কি ওকে আক্রমণ করবে।

কই না! ওকে যেন ওরা ভুলেই গেছে। ঘোড়ার পেছনের দুটো পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে ওর লাফানোর শব্দ কানে আসছে। তারপব সব চুপচাপ, পাহাড়ের মতো—মৃত্যুর মতো হিমশীতল স্তব্ধতা। ওর অবচেতনা যেন শীতে অবসাদে অসাড়। ঘুমে জাগরণে দীর্ঘ রাত্রি কেটে গেল। আধো জাগ্রত তন্দ্রায় মনে হচ্ছিল এ সুচির রাত্রি আর বুঝি শেষ হবে না, মনে হচ্ছিল জীবনলোক থেকে চিরকালের জন্য ও যেন চলে গেছে মৃত্যুর পরপারে।

২

একটু উসখুসানি, চকমকি ঠোকার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল কুকুর যেমন এক টুকরো হাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তেমনি উপুড় হয়ে একটি লোক আগুনে ফুঁ দিচ্ছে। ও বুঝল ভোর হয়ে আসছে।

আগে মনে হচ্ছিল রাত বুঝি কাটছে না—এখন মনে হল রাত বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।

আগুন বেশ যখন ধরে গেছে তখন ও পাতার বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এল—ওর মনে তখন একটি মাত্র ইচ্ছা—এক পেয়ালা কফি। লোকগুলো ফের রুটি সেঁকতে শুরু করেছে।

'কফি তৈরি করা যায় না?' মেয়েটি শুধোল।

যুবকটি ওর দিকে একটু যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল। মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমরা কফি খাই না। তা ছাড়া হাতে সময়ও নেই।' আর দুটি লোক মাটির ওপর থেবড়ে বসেছে। পাণ্ডুর আলোয় ওদের চোখে একটা অস্বাভাবিক অমানুষিক দীপ্তি—সে চোখে ঘৃণার আভাসও নেই, আছে একটা কঠিন ক্রূর দূরত্বের আভাস। ওরা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। ওদের চোখে ও যেন মেয়েমানুষই নয়। যেন ওর ফর্সা রঙের তলায় ওর নারীত্ব ঢাকা পড়ে গেছে। ও যেন একটা অতিকায় জীববিশেষ—একটা প্রকাণ্ড মেয়ে উই। ওদের চোখে ও আর কিছু নয়।

সূর্য ওঠবার আগেই ওকে ঘোড়ায় চাপতে হল। হিমেল হাওয়া ভেদ করে ওরা উৎরাই পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। সূর্য ওঠার পর চারদিক গরম হয়ে উঠল। লতাগুল্মহীন পাথরের ওপর সূর্যের তীব্র আলো পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। মনে হতে লাগল ওরা পৃথিবীর ওপর উঠে চলেছে। অনেক দূরে আকাশের গায়ে বরফের ক্ষতচিহ্ন।

সকালবেলা চলতে চলতে ওরা এমন একটা জায়গায় পৌছুল যেখানে ঘোড়া চলবার রাস্তা নেই। ওরা কিছুক্ষণ কাত-হয়ে-পড়া একটি শিলা-খণ্ডের কাছে বসে বিশ্রাম করল। এই পাথরটা যেন শিলীভূত কোনো বিরাট পশুর স্তন—উজ্জ্বল মসৃণ। পাথরের টুকরোটি পেরিয়ে ওদের যেতে হবে। পথ আর কিছু নেই—বাঁকাচোরা একটি ফাটল। ওর মনে হল ও যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হামাগুড়ি দিয়ে চলছে ফাটল থেকে গর্ত, গর্ত

থেকে ফাটল—সতর্ক সাবধানে শিলাখণ্ড অতিক্রম করে। সামনে পেছনে দুটি রেডইণ্ডিয়ান আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে সোজা হয়ে। ওদের পায়ে বিনুনি করা চামড়ার চটি—পিছলে পড়ার ভয় নেই—ওর পায়ে ভারী রাইডিং বুট্ সোজা হয়ে চলবার জো নেই।

চলছে হামা দিয়ে অতি কষ্টে আর ভাবছে কেন এত কষ্ট করে দীর্ঘ শিলাপথ ভেঙে চলা! গা ছেড়ে দিলেই তো সব হাঙ্গামা মিটে যায়। পায়ের নিচে ওর বিস্তীর্ণ পৃথিবী।

ওরা শেষ পর্যন্ত একটা নিরাপদ জায়গায় পৌছুবার পর মেয়েটি একবার পেছন ফিরে দেখল তৃতীয় রেডইণ্ডিয়ানটি আসছে—পিঠে ওর জিন আর থলের বোঝা বয়ে। সমস্ত বোঝাটা কপালের ওপর একটা চওড়া শক্ত ফিতে দিয়ে বাধা। হাতে ওর নিজের টুপি, একটুও ইতস্তত না করে স্থির পদক্ষেপে ফাটলের পথ বেয়ে আসছে—পাহাড়ের লৌহ বর্মের একটা সূক্ষ্ম রেখা ধরে যেন এগিয়ে আসছে।

ঢালু পথ এবার নিচের দিকে নেমে গেছে। ওদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। একজন কদম চালে দৌড়ে এগিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পথ এঁকেবেঁকে নিচের দিকে নেমেছে। আকাশের মধ্যাহ্নের খর-দীপ্তিতে দেখা গেল নিচের উপত্যকা, দুধারে তার উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর—যেন পাহাড চিরে এই উপত্যকাটির জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। সবুজ উপত্যকা, একধারে বয়ে গেছে নদী তার কিছু দূরে নিচু চ্যাপটা ধরনের ঘরবাড়ি—গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মতো উজ্জ্বল। তিন হাজার ফুট ওপর থেকে দেখাচ্ছে ছোট খাটো ছবির মতো একটি গ্রাম। নদীর ওপর সাঁকো, মাঠের চারধারে বাড়িঘর, গাছপালা, মেষচারণের মাঠ, হলুদরঙা ভুট্টার খেত, ছাগল ও ভেড়ার পাল, নদীর দিকটায় বেড়া বাঁধা —পাহাড়ের উপর সব দেখাচ্ছে ছোটোখাটো ছবির মতো—রূপকথার

রাজ্যের মতো। কেবল একটি জিনিস দেখে ওর ভয় হচ্ছে। বাড়ি-গুলো শাদা ঝকঝকে স্ফটিকের মতো, রূপোর মতো নির্মমভাবে উজ্জ্বল।

পাহাড়ের পাঁচিলের ভেতরকার স্বল্পপরিসর পথ এঁকেবেঁকে গেছে পার্বত্য নদীর ধারাকে অনুসরণ করে। প্রথমে কেবল শিলাখণ্ডের ছড়া-ছড়ি তারপর পাইনের বন, তারপর আবার রূপোলি অ্যাসপেন। শরৎকালের নানা রঙবেরঙের ফুলের ছড়াছড়ি—লাল, শাদা, হলদে। এত ক্লান্ত, ও যেন আর চলতে পারছেনা—মাঝে মাঝে বসে বিশ্রাম করে নিচ্ছে। নানা বর্ণের বিচিত্র ফুলগুলি ও যেন ঝাপ্‌সাভাবে দেখছে অস্পষ্ট ছায়ার মতো। এ যেন মৃত্যুলোক থেকে দেখা।

অনেকক্ষণ চলবার পর এল শ্যামলরঙা মেষচারণের মাঠ, থাকে-থাকে নেবে গেছে, মাঝে মাঝে অ্যাসপেন ও পাইন গাছের সারি। একটি অর্ধউলঙ্গ মেষপালক, মাথায় টুপি, পরনে সামান্য একফালি কাপড়—বাদামিরঙা ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। গাছের ছায়ায় ওরা বসে অপেক্ষা করতে লাগল—ও আর সেই যুবক রেডইণ্ডিয়ানটি। অপর দুজনা ইতিমধ্যে এগিয়ে গেছে।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনজন লোক আসছে—পরনে লাল, কমলা, হলদে ও কালো রঙের সুদৃশ্য কম্বল, মাথায় বর্ণাঢ্য পালকের টুপি। ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তার শাদা চুল ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি ফিতের সাহায্যে বিনুনি করা। কমলা হলুদ রঙের কম্বলে কালো সুতোর কাজ—মনে হচ্ছে যেন চিতাবাঘের চামড়া পরেছে। অপর দুজনের চুলে পাক ধরেনি বটে কিন্তু বয়স হয়েছে বেশ। ওদের কম্বল ডোরাকাটা, মাথার টুপিতে তেমন কারুকার্য নেই।

যুবক রেডইণ্ডিয়ান মৃদু স্বরে কয়েকটা কথা বলল। এই তিনজন নবাগত মুখ ঘুরিয়ে মাথা হেঁট করে কথা শুনল—কিছু জবাব দিলনা, একবার

তাকালও না বক্তা অথবা মেয়েটির দিকে। কেবল মন দিয়ে কথা শুনল। বেশ খানিকক্ষণ পরে ওরা মেয়েটির দিকে তাকাল।

ওদের মধ্যে যে বয়োবৃদ্ধ—দলপতি কিম্বা পুরোহিত কিম্বা কিছু একটা হবে—তার মুখের রঙ কালো ব্রোঞ্জের মতো। মুখের চামড়া কুঞ্চিত, বয়সের রেখায় সমাকীর্ণ, চারদিকে গুটিকয়েক শাদা চুল এখনো অবশিষ্ট আছে। কাঁধের ওপর ভেড়ার লোমের ফিতে দিয়ে বাঁধা দীর্ঘ বিনুনি ঝুলছে। এগুলি এমন কিছু নয়, ওর চেহারার বৈশিষ্ট্য হল ওর দুটি কালো চোখ। যার দিকে তাকায় তার অন্তরে প্রবেশ করে ওর দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে আছে দুঃসাহসিক দানবীয় শক্তি—দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। তীক্ষ্ণ কালো চোখের দৃষ্টিতে ও অনেকক্ষণ শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখল—কি দেখল কে জানে। মেয়েটি খুব চেষ্টা করল ওর চোখে চোখে তাকাবার—মনে মনে সংকল্প করল যেন হার না মানতে হয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মানুষ যে ভাবে মানুষের দিকে তাকায় এই দৃষ্টিতে তার কোনো চিহ্ন নেই। মেয়েটির চোখে যে আপত্তি বা বাধা দেবার ভাব ফুটে উঠেছে, সে সমস্ত অতিক্রম করে ওর দৃষ্টি যে কোন গভীরে পৌছুল কেউ জানে না। এই বৃদ্ধের কাছ থেকে মানুষিক ব্যবহার প্রত্যাশা করা ব্যর্থ হবে, সে কথা ও স্পষ্ট বুঝতে পারল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ যুবকটিকে উদ্দেশ করে কি যেন দু এক কথা বলল। যুবকটি স্পানিশ ভাষায় বলল, 'উনি জিগগেস করছেন, তুমি এখানে কিসের সন্ধানে এসেছ ?'

'আমি ? কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তো আসিনি। এমনিই এসেছি দেখতে।'

ওর এই কথাগুলো অনুবাদ করে বলা হলে পর বৃদ্ধ আর একবার সেই স্থিরদৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাল, আবার নিচু গলায় যুবকটিকে কি যেন বলল।

'উনি জিগগেস করছেন, তুমি তোমার আপনার লোকজন ছেড়ে এসেছ

কেন? তুমি কি চিলচুই দেশে বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের ঈশ্বরকে আমদানি করতে চাও?'

ওর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে, ও বোকার মতো জবাব দিল, 'না, আমি নিজেই শ্বেতাঙ্গদের ঈশ্বর ছেড়ে চলে এসেছি। আমি এসেছি চিলচুইদের দেবতার সন্ধানে।'

এ কথাগুলো অনুবাদ করে বলার পর সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। তার পর আবার বৃদ্ধ কথা বলল—ওর কণ্ঠস্বরে যেন ক্লান্তির আভাস।

প্রশ্ন এল: 'নিজেদের ঈশ্বরকে ওর ভালো লাগে না বলেই কি শ্বেতাঙ্গিনী চিলচুইদের দেবতার সন্ধানে এসেছে?'

'হ্যাঁ—শ্বেতাঙ্গদের ঈশ্বর আর আমার ভালো লাগে না।'

ও ভাবল এই রকম জবাবটাই ওরা প্রত্যাশা করে। বলল, 'আমি চিলচুইদের দেবতার পূজো করতে চাই।'

ও বুঝতে পারল ওর এই জবাবের অনুবাদ শোনানো হলে পর স্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্তের জন্য এই দুজন রেডইণ্ডিয়ানদের মুখে বিজয়ীর পুলক বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। তারপর চারজন চার জোড়া কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল—সে দৃষ্টিতে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন অথচ কঠিন লিপ্সার ভাব। এ দৃষ্টিতে কোনো শারীরিক মোহের চিহ্নমাত্র নেই, যে-ভাবটা প্রকাশ পেল সে ওর বোঝার বাইরে। অনাবিল, স্বচ্ছ অথচ কঠিন একটা ধর্মান্ধ দৃষ্টি। ভয় ভাবনা ওর মন থেকে সরে গেছে, ও এখন বিস্ময়ে সব কিছু কেবল দেখছে, অনুভব করছে না। তা না হলে ভয়ে ওর সমস্ত শরীর হিম হয়ে যেত।

বৃদ্ধের দল নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করল, তারপর দুজন চলে গেল—মেয়েটির সঙ্গে রইল যুবকটি আর ওদের দলের বৃদ্ধ দলপতি। এবার বৃদ্ধটি ওর দিকে একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাল।

যুবকটি বলল, 'উনি জিগগেস করছেন, তুমি কি খুব ক্লান্ত?'

'খুব।'

'ওরা গ্রাম থেকে ডুলি আনতে গেছে,' যুবক বলল। ডুলি এলে পর দেখা গেল রোঁয়া বের করা পশমের তৈরি দোলনা বিশেষ—একটা বাঁশের নিচে ঝোলানো। দুজন লম্বাচুলো-রেডইণ্ডিয়ান কাঁধে এই দোলনা ঝুলিয়ে নিয়ে এল। কম্বলের দোলনা মাটিতে নামানো হল, মেয়েটি তার ওপর বসল। বাহকেরা আবার ডুলি কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল। দুলতে দুলতে চলছে আর ওর মনে হচ্ছে ওকে কেউ যেন বস্তায় পুরে নিয়ে যাচ্ছে। চলল অ্যাসপেন-বীথির ভেতর দিয়ে। আগে আগে সেই বৃদ্ধ দলপতি—তার গায়ের সেই চিতাবাঘের মতো কম্বল সূর্যের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

ওরা উপত্যকা ছাড়িয়ে বেরুল—সামনেই ভুট্টার ক্ষেত—পাকা পাকা হলুদ রঙা ভুট্টার শীষ বাতাসে দুলছে। সমতল জায়গা থেকে এ জায়গা অনেক উঁচু, তাই ভুট্টার গাছগুলো তেমন বাড়তে পারেনি। পায়ে চলা মসৃণ রাস্তাটা চলে গেছে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। ওর ঠিক সামনে ও দেখতে পাচ্ছে বৃদ্ধ দলপতি এগিয়ে চলেছে—ঋজু দেহ, গায়ে আগুন-রঙা কম্বল কালো কালো ডোরা কাটা, ক্ষিপ্রগতি, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা চলেছে। ওর বাহকেরা পিছনে পিছনে তালে তালে পা ফেলে চলেছে, কালো কালো লম্বা চুল নদীর ঢেউয়ের মতো ওদের আদুড় গায়ের ওপর দুলছে।

ভুট্টার ক্ষেত পেরিয়ে ডুলি দাঁড়াল প্রকাণ্ড উঁচু একটা দেয়ালের সামনে—কাঁচা ইঁটের গাঁথুনি, মাটি দিয়ে লেপা। কাঠের দরজা খোলা—সেই দরজার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে দেখে দুধারে ছোট ছোট বাগান, ফুল ও ফলের গাছে ভরা। প্রত্যেকটি বাগানের চারধারে নালা—সেই নালা

দিয়ে ক্রমাগত জল বয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক বাগিচার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট ছোট্ট ধব্‌ধবে শাদা রঙের বাড়ি, জানালা নেই—দুয়ার ভেজানো। সব নিয়ে জায়গাটা ছোট খাটো পায়ে চলা পথে ভর্তি, সরু সরু জলের ধারা চলে গেছে, মাঝে মাঝে ছোট্ট সেতু—এক বাগান থেকে অন্য বাগানে যাবার জন্য।

ওরা যে-পথে এগিয়ে চলেছে সে-পথটাই সবচেয়ে চওড়া; দুধারে লতাগুল্ম ও ঘাস, বহুদিনকার পুরাতন পায়ে চলার পথ। ঘোড়ার ক্ষুর অথবা গাড়ির চাকায় এপথ কোনো কালে বিক্ষত হয়নি। যেতে যেতে পথে পড়ল একটি স্রোতস্বিনী—কলকল শব্দে স্ফটিক-স্বচ্ছ জল ছুটে চলেছে। একটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি সেতু দিয়ে ওরা নদী পেরিয়ে গেল। চারদিক নিঃঝুম—জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। রাস্তা চলেছে প্রকাণ্ড বনস্পতির সারের তলা দিয়ে—হঠাৎ পথ বিলীন হল চারকোনা একটা মাঠের মধ্যে। গ্রামের ঠিক মাঝখানে এই জায়গা।

মাঠটা প্রস্থে কম, দৈর্ঘ্যে বেশি। দুটো দিকে লম্বা দু-সারি নিচু ঢালু ছাত-ওয়ালা শাদা রঙের বাড়ি পর পর চলে গেছে। সবার শেষ বাড়িটা তিনতলা। দুটো দিকেই এই দুটি তেতলা বাড়ি; পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্যই যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি বাড়ির দেয়াল ধব্‌ধবে শাদা। তেতলা বাড়ি দুটোর পিছন দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঠের তক্তার বেড়া। এই বেড়া-দেওয়া জায়গায় ফুল-ফলের বাগান ও ছোট আকারের কয়েকটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

জনপ্রাণী নেই। ওরা নিঃশব্দে দুধারের দু-সারি বাড়ির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠানের মতো মাঠ, যেমন শক্ত তেমনি মসৃণ। এ মাঠে কোনো ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই। কত শত সহস্র বছর ধরে কত শত সহস্র পায়ের স্পর্শ লেগে এই মাঠের এমন চেহারা

হয়েছে! জানলাবিহীন বাড়িগুলোর সদর-দরজা সব এই মাঠের মুখোমুখি। প্রত্যেকটি দরজা বন্ধ। চৌকাঠের কাছে জ্বালানি কাঠ পড়ে আছে, একটি মাটির উনুন থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে অথচ কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। বৃদ্ধ সোজা এগিয়ে চলল শেষ প্রান্তে তেতলা বাড়িটার দিকে। অদ্ভুত বাড়িটা, ছেলেখেলার ইঁটের বাড়ি যেমন হয় তেমনি—দোতলা একতলার চাইতে ছোট, আর তেতলা ততোধিক ছোট। সিঁড়িটা বাইরের দিক থেকে সোজা দোতলার ছাদ অবধি উঠেছে। এই সিঁড়ির কাছে বাহকেরা ডুলি মাটির উপর নামিয়ে রাখল। যুবকটি স্পানিশ ভাষায় বলল, 'এই সিঁড়ি দিয়ে তোমায় উঠতে হবে।' পাথরের তৈরি সিঁড়ি দিয়ে ও দোতলার ছাদের উপর উঠল। মাটির বাড়ি, মাটির ছাদ, দোতালার ঘরের চারদিকে বারান্দার মতো ঘুরে গেছে। পেছন দিকে আবার দোতলা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানে। ওরা এই পেছনের বাগানে গেল।

এ পর্যন্ত কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। এবার দুটি লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। এদের মাথায় কোনো টুপি নেই—লম্বা বিনুনি করা চুল, এক অদ্ভুত ধরনের শাদা কুর্তা পরনে—কুর্তার ঝুলটা গলিয়ে দিয়েছে লেঙোটের মধ্যে। সবাই মিলে একযোগে বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে লাগল। বাগানে লাল ও শাদা ফুলের ছড়াছড়ি। দরজার কড়া না নেড়েই ওরা ঢুকল একটা লম্বা নিচু ছাদওয়ালা ঘরে।

ভেতরে অন্ধকার; ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেকগুলো লোক সেখানে উপস্থিত, মুখ দেখা যাচ্ছে না, কেবল ওদের শাদা কুর্তা-গুলো অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

দেয়াল ঘেঁষে একটা বিরাট কাঠের গুঁড়ি বহু দিনের ব্যবহারে চিক্কণ—তারই উপর ওরা বসে আছে। এই একটি আসবাব ছাড়া সমস্ত ঘরটা শূন্য বোধ হচ্ছে। না তো? ঘরের এক প্রান্তে অন্ধকারে খাটের মতন কী একটা

যেন, আর তারই উপর কে যেন কম্বল কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওর সঙ্গে যে এসেছে, ডোরাকাটা কম্বল গায়ে সেই বৃদ্ধ দলপতি এবার টুপি, কম্বল ও পায়ের চটি খুলে ফেলল। সেগুলি একপাশে রেখে খাটের কাছে এগিয়ে গেল, ফিস ফিস করে কী যেন কথা বলল। খানিকক্ষণ কেটে গেল কোনো জবাব নেই। তারপর দেখা গেল একটি আদ্দিকালের বুড়ো, অন্ধকারে মুখটা তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, বরফের মতো শাদা চুল, আস্তে আস্তে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল। যেন প্রেতলোক থেকে সত্ত উঠে এসেছে, চোখ খোলা অথচ কিছু যেন ওর চোখে পড়ছে না। সবাই নিঃস্তব্ধ।

দলপতি আবার কথা বলল। এবার যুবক রেডইণ্ডিয়ান মেয়েটির হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেল। ওর সেই ঘোড়ায় চড়ার সাজ—কালো বুট, হ্যাট, ওর জামার ওপর সেই লাল টাই—সব মিলে ওকে কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছে। সেই কাঁথা-কম্বল মুড়ি দেওয়া আদ্দিকালের বুড়োর সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। বুড়ো এবার কনুইয়ের ওপর শক্ত করে ভর দিয়ে অনেকটা উঠে বসেছে। ওর চোখে সেই প্রেত-লোকের দূরত্ব, শাদা চুল এলোমেলো হয়ে কাঁধে উড়ছে, নির্বিকার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে কোন সুদূরের দিকে ওর মন চলে গেছে, সে দেশের সঙ্গে এ পৃথিবীর যেন কোনো সম্বন্ধ নেই। ঝুঁকে পড়ে এবার সে মেয়েটিকে দেখতে লাগল।

ওর মুখের রঙ কালো কাঁচের মতো—উজ্জ্বল ও মসৃণ। থুৎনির কাছে এদিক ওদিক দুটো-চারটে কোঁকড়া চুল অবিশ্বাস্য রকম শাদা। এই কালো কাঁচের মতো ঝকঝকে মসৃণ মুখের চারদিক বেড় দিয়ে আছে শাদা চুলের রাশি, বেণী বেঁধে সে চুল নিয়ন্ত্রিত করা হয়নি—এলোমেলো অবিন্যস্ত। দু ফোঁটা পাউডারের চিহ্নের মতো দুটি ভুরুর নিচ থেকে এই বুড়োর দুটি কালো চোখ মেয়েটিকে দেখতে লাগলো। এ যেন সেই

সুদূর প্রেতলোকের দৃষ্টি—ওর মধ্যে যেন এমন কিছু দেখছে যা আর কেউ কখনো দেখেনি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে বুড়ো যেন অন্ধকারে অনির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ করে দু-একটি কথা বলল—গম্ভীর স্বর যেন কোন গভীর থেকে উদ্গত হচ্ছে। 'উনি বলছেন, তুমি কি চিলচুইএর দেবতাকে মন প্রাণ নিবেদন করতে পারবে।' যুবকটি অনুবাদ করে বলল। মেয়েটি যন্ত্রের মতো জবাব দিল, 'ওকে বলো—হ্যাঁ পারবো।' আবার সব চুপ। আবার বুড়ো রেড ইণ্ডিয়ানটির কথা হাওয়ায় ভেসে এল। ঘর থেকে একটি লোক গেল বেরিয়ে। কেবল খোলা দরজা থেকে একটু আবছা আলো এসে ঘরের অন্ধকারটিকে যেন নিবিড়তর করে দিয়েছে। যুগযুগান্তের স্তব্ধতা ঘন হয়ে জমেছে এই অন্ধকার কুঠরিতে।

মেয়েটি এবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চারজন শুক্লকেশ বৃদ্ধ সেই কাঠের গুঁড়ির আসনে দুয়ারের দিকে মুখ করে বসে আছে। আর দুটি জোয়ান লোক প্রহরীর মতো দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে। সবারি লম্বা চুল, সবারি পরনে শাদা রঙের কুর্তা লেঙোটের মধ্যে গুটানো। কালো কালো বিশাল পা-গুলো নগ্ন। অনাদি কালের স্তব্ধতা যেন এই ছোট্ট কুঠরিতে জমাট হয়ে আছে।

যে লোকটি বেরিয়ে গিয়েছিল সে শাদা ও কালো রঙের কতগুলি কাপড়চোপড় নিয়ে ফিরে এল। যুবক রেডইণ্ডিয়ানটি সেগুলি নিয়ে মেয়েটির সামনে ধরে বলল—

'তোমার এই কাপড় ছেড়ে এগুলি পরতে হবে।'

'পুরুষেরা যদি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তা হলে…'

'কেউ কিছু করবে না।' যুবকটি শান্তভাবে বলল।

'না, পুরুষেরা যতক্ষণ এ ঘরে আছে…'

যুবকটি দুজন প্রহরীর দিকে তাকাল। তারা চট করে এগিয়ে এসে

আচমকা ওর হাতদুটো চেপে ধরল; আঘাত লাগল না বটে কিন্তু শক্ত বাঁধন এড়িয়ে যাবার জো নেই। তারপর দুটি বৃদ্ধ এসে অদ্ভুত কৌশলে ওর বুটের চামড়া পরিষ্কার কেটে খুলে ফেলল—ওর কাপড়-জামা এমনভাবে কাটল যে সেগুলি ওর গা থেকে যেন খসে খসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর নিরাবরণ শুভ্র দেহ প্রকাশ পেল। খাঠ থেকে সেই বুড়ো কি যেন বলতে ওরা মেয়েটিকে ঘুরিয়ে দিল ওর দিকে যাতে বুড়ো দেখতে পায়। আবার বুড়ো কি একটা কথা বলাতে যুবকটি ক্ষিপ্রহাতে ওর সোনালি চুল থেকে পিন ও চিরুনি খুলে নিল। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ওর কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আবার বুড়ো কি যেন বলল। এবার ওকে নিয়ে যাওয়া হল একেবারে খাটের পাশে। পলিত কেশ বৃদ্ধ, কালো কাঁচের মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল ওর গায়ের চামড়া—ও কাছে আসলে পর বৃদ্ধ থুতু দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে নিল, তার পর খুব হালকাভাবে প্রথমে ছুঁলো ওর স্তন, তার পর ওর পেট, তার পরে ওর পিঠ। আঙুলটা ওর শরীরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে যাচ্ছে আর ও শিউরে উঠছে বারে বারে, যেন মৃত্যুর স্পর্শ ওর গায়ে লাগছে।

ও নিজের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছে—একটু আক্ষেপও হচ্ছে এই ভেবে যে এই নির্লজ্জ উলঙ্গ অবস্থা ও যেন কত সহজে মেনে নিল। ওর মনের মধ্যে সব চেয়ে বেশি করে জাগছে একটা আক্ষেপ, ভাবছে অবাক হয়ে, ওর নগ্নতায় ওরা কেউ লজ্জা পাচ্ছে না কেন। বয়ো-বৃদ্ধদের মুখের ভাব অদ্ভুত—একটা গভীর দুঃখ, অজানা বেদনায় ওরা যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে। যুবকটির মুখে একটা অদ্ভুত উল্লাসের ভাব! ওদের এভাবে দেখে ওর নিজের চিত্তের চাঞ্চল্য অদৃশ্য হয়ে গেছে—নিজেকে যেন ও আর নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে না, যেন ওর এই দেহটা ওর আপনার নয়।

ওরা এবার ওকে নতুন কাপড পরিয়ে দিল—একটা লম্বা সুতির জামা, হাঁটু অবধি ঝুল আর একটা নীল রঙের মোটা পশমের চাদর, লাল ও সবুজ রঙের ফুল তোলা। চাদরটা ঝুলিয়ে দিল ওর কাঁধের ওপর, কোমরের কাছে চাদরটা শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল লাল ও কালো পশমের বিনুনি করা ফিতে দিয়ে।

এভাবে কাপড়চোপড় পরিয়ে ওকে খালি পায়েই বেড়া দেওয়া বাগানের ভেতর একটি ছোট্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। যুবকটি বলল, ও যা চায় তাই ওকে দেওয়া হবে। ও চাইল একটু স্নানের জল। যুবকটি একটি কলসী করে জল নিয়ে এল, আর আনল একটা লম্বাটে ধরনের কাঠের তৈরি ঘটি। তারপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল। ছোট্ট ঘরের ভেতর ও বন্দী। বাইরের দরজাটা লম্বা লম্বা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি, তক্তার মাঝে মাঝে যে ফাঁক আছে তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাগানে লাল ফুল ফুটে আছে, একটি পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর তেতলা বাড়ির ছাদ থেকে ঢাকের গুরুগুরু একটানা শব্দ শোনা গেল। এ ডাকটা ওর কাছে রহস্যময়, অপার্থিব। তারপর কানে এল উঁচু গলায় কে যেন অদ্ভুত ভাষায় আজান দেবার মতো করে ডাকছে। সুদূর অশরীরী কণ্ঠ থেকে যেন কী একটা বাণী উদ্গত হচ্ছে। পরলোকের পার থেকে এই কথাগুলো যেন ওর কানে ভেসে আসছে।

ও ভারি ক্লান্ত। চামড়া দিয়ে মোড়া একটা খাটের ওপর ও গা এলিয়ে দিল। গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিল গাঢ় নীল রঙের সেই পশমী চাদর। চোখ জড়িয়ে আসছে, ঘুম ছাড়া আর কিছুর কথা ও ভাবতে পারছে না।

ও যখন ঘুম থেকে উঠল তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জেগে দেখে যুবক রেডইণ্ডিয়ানটি ঝুড়িতে করে খাবার নিয়ে এসেছে—রুটি, গলা ভাতের মতো কি যেন একটা খাবার, ওপরে কয়েক টুকরো

মাংস ভাসছে, মধুর উপাদান দিয়ে তৈরি একটা পানীয় আর কিছু তাজা ফল। আর, সঙ্গে এনেছে লাল ও হলুদরঙা ফুলের লম্বা একগাছি মালা। ঘটি থেকে কিছু জল নিয়ে মালার ওপর ছিটিয়ে দিয়ে যুবকটি হাসিমুখে মালাটি ওর দিকে এগিয়ে দিল। ওর হাবভাবে ওকে দেখাচ্ছে ধীর, শান্ত। কালো চোখে বিজয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছে—সেই আগেকার কঠিন দ্যুতি আর নেই, ঘন কালো পল্লবের তলায় ওর চোখের দৃষ্টি যেন একটা নরম খুশিতে ভরে উঠেছে। এ-দৃষ্টিতে মানুষিক অনুভূতির চিহ্ন নেই—সেইটাই তো ওর ভয়ের কারণ, মেয়েটি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছে।

নিচু গলায় বলল, 'আর কিছু চাও?' ওর কথা বলার ভঙ্গীটা অদ্ভুত। ও যেন জনান্তিকে কথা বলছে—যেন ওকে উদ্দেশ করে কিছু বলছে না। ভারী অথচ চাপা গলায় স্বরটা ভারি মিষ্টি হয়ে কানে লাগে।

'আমায় এখানে বন্দী করে রাখা হবে না কি?'

'না, কাল থেকে তুমি বাগানে ঘুরে বেড়াতে পাবে।' সেই একই ধরনের নরম গলায় অল্প দুটি অদ্ভুত করুণামাখা কথা।

মাটির খুরিতে একটু মধু দিয়ে তৈরি পানীয় ঢেলে যুবকটি মেয়েটির সামনে ধরল, 'কেমন লাগল খেতে? খুব চমৎকার—না?'

ও আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল। নানান রকম ওষধি দিয়ে তৈরি—মধু মিশিয়ে মিষ্টি করা হয়েছে। গন্ধটা যেন অনেকক্ষণ ধরে মুখে লেগে থাকে। যুবকটি খুশি হয়ে ওর দিকে তাকাল।

মেয়েটি বলল, 'কী রকম অদ্ভুত স্বাদ!'

ও বলল, 'চমৎকার খেতে, খুব উপকারী।' ওর কালো চোখের দৃষ্টিতে সেই আনন্দের আভাস। কিছুক্ষণ পরে যুবকটি চলে গেল। একটু পরেই ওর গা বমি বমি করতে লাগল। ও যেন নিজের শরীরের ওপর সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ভীষণ ভাবে বমি শুরু হল।

বমির পর ওর সমস্ত শরীরে কেমন একটা আরামের আবেশ ভরে উঠল, ওর প্রতিটি অঙ্গ থেকে যেন সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। খাটের উপর শুয়ে শুয়ে গ্রামের শব্দগুলো ওর কানে আসতে লাগল—ও চোখ মেলে দেখতে লাগল আকাশের রঙ হলুদ হয়ে আসছে, নাকে আসছে পোড়া পাইন কাঠের মিষ্টি গন্ধ। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কুকুরের বাচ্চার চীৎকার, দূরাগত পদধ্বনি, কথা বলার শব্দ। ধোঁয়ার গন্ধ, ফুলের গন্ধ—ভেসে আসছে বাতাসে। সন্ধ্যা নেমে এল, ও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অস্তগামী সূর্যের আভার উপর দূর দিগন্তে একটি ধূসর তারা জ্বল জ্বল করছে। ওর সমস্ত চেতনা যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ও যেন শুনতে পাচ্ছে সন্ধ্যা বেলার ফুল ফোটার শব্দ, চলমান গ্রহতারার শব্দ আসছে কানে, বায়ুস্তরের প্রত্যেকটি স্তর যেন বীণার তারের মতো ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে। বেড়াঘেরা বাগানের ছোট্ট ঘরটিতে ও বন্দী। অথচ এই বন্দীদশা ওর এমন কিছু খারাপও লাগছে না। বেশ কিছুকাল পর ও হঠাৎ আবিষ্কার করল যে এ পর্যন্ত ও একটিও মেয়ের মুখ দেখেনি। ওর সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তারা সবাই বয়স্থ পুরুষ, সেই যাদের সঙ্গে বড় উঁচু বাড়িতে ওর সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রথম দিন। ও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে বাড়িটা খুব সম্ভব মন্দির এবং এই বুড়োরা সেই মন্দিরের হয়তো পুরোহিত হবে। সবারই পরনে সেই একই রঙের চাদর—লাল, কমলা, হলদে ও কালো ডোরাকাটা। সবারই মুখে সেই একই গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাব। কোনো কোনো সময় বুড়ো পুরোহিতদের মধ্যে একজন ওর কাছে এসে বসে। চুপচাপ বসে থাকে কোনো কথা বলে না। বুড়োরা নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না। কেবল ওই যুবকটি স্পানিশ বলে ও বোঝে। বুড়োরা ওর কথার জবাবে কেবল হাসে—অতি সংযত ভালোমানুষের হাসি, পিতা যেমন সন্তানকে দেখে স্নেহশীল ভাবে হাসে। ওদের কালো চোখে কিন্তু সেই অকরুণ

নৃশংস দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পায়। যেই দেখে মেয়েটি ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে অমনি ওরা হাসি দিয়ে ওদের হিংস্রভাবটা ঢাকতে চায়। ও কিন্তু দেখেছে।

ওদের ব্যবহারের মধ্যে এইটাই লক্ষ্যণীয়—একটা নৈর্ব্যক্তিক ভদ্রতা। বুড়োরা যেমন শিশুদের প্রতি প্রশ্রয় দেখায়, ওদের আচরণে সেই ভাবটা প্রকট। কিন্তু এই ভদ্রতাটা যে নিতান্ত বহিরাবরণ, ভেতরে যে একটা বীভৎস সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, একথা মেয়েটি ভুলতে পারে না। বুড়োরা যেই চলে যেত অমনি একটা নাম-না-জানা ভয়ে ওর সমস্ত শরীর শিউরে উঠত।

যুবকটি মাঝে মাঝে এসে ওর কাছে বসত, কথা বলত খুব সহজ দিলখোলা ভাবে। এর বেলাও সত্যি কথাটা যে কথার আড়ালে ঢাকা থাকত—তা মেয়েটি জেনে ফেলেছে। সে-কথাটা বোধহয় বলা চলবে না। যুবকটি তাকিয়ে থাকত স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, কথা বলত ভাঙা ভাঙা স্পানিশ ভাষায়, অলস জড়িত উচ্চারণে। ওর কথা থেকে বোঝা গেল যে যুবকটি সেই অতিবৃদ্ধ লোকটির নাতি ও ডোরাকাটা চাদর গায়ে দেওয়া রেডইণ্ডিয়ানের ছেলে। ওরা পশ্চিম আমেরিকার বংশগত রাজাদের বংশধর—স্পানিয়ার্ডরা এদেশে আসবার আগে বহুপুরাতন কালে ওদের পূর্বপুরুষেরাই ছিল না কি এদেশের রাজা। যুবকটি প্রসঙ্গত বলল যে ও নিজে মেক্সিকো শহরে এমন কি ইউনাইটেড স্টেট্‌সেও গেছে। লস্ আঞ্জেলিস্-এ কিছুদিন রাস্তা তৈরির কাজও করেছে। ঘুরতে ঘুরতে শিকাগো অবধি গেছে।

'তা হলে তুমি ইংরিজি বলো না কেন?'—মেয়েটি জিগগেস করে।

ও কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে আমতা আমতা করে নীরবে মাথা নাড়ে।

'ইউনাইটেড স্টেট্‌সে যখন ছিলে তখন কি তোমার লম্বা চুল হেঁটে দিয়েছিলে?'

আবার যুবকটির চোখে কেমন যেন একটা অস্বস্তির দৃষ্টি ফুটে উঠল, মাথা নেড়ে বলল, 'না, মাথায় ফেট্টি বেঁধে তার ওপর টুপি পরতাম।'

ও চুপ করে যেন বিগত দিনের দুঃখস্মৃতির কথা ভাবতে লাগল।

'এক আমি ছাড়া আর কেউ এ-অঞ্চল থেকে অত দীর্ঘ দিনের জন্য বিদেশে থাকেনি। অন্যরা যায় আবার হপ্তাঅন্তে ফিরে আসে। চলে যেতে পারে না, বুড়োদের হুকুম নেই।'

'তা হলে তুমি গিয়েছিলে কেন?'

'বুড়োরাই পাঠিয়েছিল—আমি একদিন এখানকার দলপতি হব কি না—তাই—'

ওর কথাবার্তায় কেমন একটা শিশুসুলভ সরলতা আছে। এটা যে স্পানিশভাষা ও ঠিকমতো জানেনা—সেইজন্য, এ-সম্বন্ধে মেয়েটির সন্দেহ নেই। বোধহয় বেশি কথা বলাটাই ওর স্বভাব-সংগত নয়। আসল কথাগুলো ও যে লুকিয়ে রাখছে সে তো বোঝাই যায়।

প্রায়ই এসে যুবকটি ওর কাছে বসে থাকে,যেন কাছাকাছি থাকতে চায়। এতটা গায়েপড়া ভাব মেয়েটির ভালো লাগে না। একদিন ওকে মেয়েটি জিগগেস করল ওর বিয়ে হয়েছে কি না। ও বলল যে ও বিবাহিত—দুটি ছেলেও আছে। 'একদিন এনো না তোমার ছেলে দুটিকে দেখবো।'

ও তার জবাবে কিছু বলল না, কেবল ওর কালো চোখ দুটো কী একটা অনির্দেশ্য রহস্যে জ্বল জ্বল করে ওঠে।

যুবকটি ওর কাছে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অথচ আশ্চর্য বলতে হবে পরপুরুষের উপস্থিতিতে মেয়েদের যে একটা স্বাভাবিক লজ্জা হয় সেরকম সংকোচ ও কোনোদিন অনুভব করেনি। চুপচাপ বসে থাকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, কুমারী মেয়ের মতো কুচকুচে কালো এলো চুলের রাশি ওর কাঁধদুটো ঢেকে থাকে। ওর এই শান্ত নিরীহ চেহারাটা দেখলে মনে হয় ও যেন যৌন সম্বন্ধের বাইরের লোক।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই মেয়েটি এই যুবক রেডইণ্ডিয়ানের অন্য রূপটা দেখতে পায়। সেখানে ওর পৌরুষ অনস্বীকার্য, ওর পেশল সুপ্রশস্ত কাঁধে, কালো ভুরুর সংলগ্ন রেখায়, চোখের পাতার একগুঁয়েমি ভঙ্গীতে, পুরু ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের ইঙ্গিতে ওর শক্তি ও পৌরুষ স্পষ্ট। মেয়েটি এভাবে ওকে যখন লক্ষ্য করে দেখে তখন যুবকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখে নেয়, পরমুহূর্তেই আবার সেই মৃদু-মধুর হাসি ওর মুখের ওপর ফুটে ওঠে। অনুসন্ধিৎসু ভাবটা ঢেকে ফেলে।

দিনের পর দিন কেটে গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ; ওর মনের সেই আরামের ঘোর এখনো কাটেনি। দৈবাৎ কখনো কখনো মনে হয় ওর নিজের ওপর শক্তি ও হারিয়ে ফেলছে—তখন মন খারাপ হয়ে যায়। ও নিজের ইচ্ছাশক্তি হারিয়েছে, নিজেকে চালাবার শক্তি ওর নেই। একটা যাদুমন্ত্র ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এক এক সময় ঘোর কেটে যায়, মনের মধ্যে একটা বিভীষিকা জাগে। তখন আবার নিঃশব্দচারী নির্বিকার রেডইণ্ডিয়ান বৃদ্ধেরা একে একে ওর কাছে এসে বসে। ওদের অযৌন অথচ শক্তিশালী প্রভাব ওর মনের ওপর কী প্রতিক্রিয়া করে জানি না। আবার দুদিন বাদে ওর ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, ও যেন গা ছেড়ে দেয়, ওদের যাদুমন্ত্রকে বাধা দেবার চেষ্টাও করে না। যুবকটি কখনো কখনো সুমিষ্ট পানীয় এনে হাজির করে—একবার গলাধঃকরণ করলেই সমস্ত শরীর নিস্তেজ নিঃসাড় হয়ে যায়, ওর বোধশক্তি যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। সব শব্দ ওর কানে আসে। ওর জন্য ওরা একটা মাদী কুকুর এনেছিল। তার নাম ও দিয়েছিল ফ্লোরা। একদিন এই সুষুপ্তির ঘোরে ও যেন ফ্লোরার ক্ষুদ্র জরায়ুতে প্রসবের শব্দ শুনতে পেল, আর একদিন পৃথিবীর চক্রপথের আবর্তন শব্দ ওর কানে এল। সে কী উদাত্ত শব্দ, যেন প্রকাণ্ড ধনুকের ছিলায় কোনো বিরাট দৈত্য টংকার দিচ্ছে!

শীত পড়েছে, বেলা ছোট হয়ে আসে। বিকেল বেলা যখন শীত করে আসে তখন আবার যেন ওর ইচ্ছাশক্তি জেগে ওঠে, ইচ্ছা হয় বেরিয়ে পড়ে, চলে যায়। যুবকটিকে ও বিশেষ পীড়াপীড়ি করে একদিন বলল ও বেরুতে চায়।

ও যে বড় দোতলা বাড়িটার বাগানে বসে ছিল একদিন·সেই বাড়ির ছাদের ওপর ওকে উঠতে দেওয়া হল। সেখান থেকে গ্রামের ভেতরকার অঙ্গন দেখা যায়। সেদিন ওদের নৃত্যোৎসব—সবাই কিন্তু নাচছে না। মেয়েরা ছেলে কাঁখে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে চুপ করে নাচ দেখছে। ঠিক উলটো দিকে অঙ্গনের অপর প্রান্তের দোতলা বাড়িটার কাছে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ছাদের ওপর অপেক্ষাকৃত একটি ছোট দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে, তাদের পেছনে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে ; সেই আলো ঠিকরে পড়ছে রেডইণ্ডিয়ান পুরোহিতদের মাথার ওপর, লাল, কালো হলদে পালক ও ঠিক সেই রঙই চাদরের ওপর।

চারদিককার কঠিন নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা প্রকাণ্ড ঢোল ঢিমে তালে গম গম করে বাজছে। নিচের জনতা প্রতীক্ষায় উন্মুখ।

হঠাৎ দ্রুত তালে একটা ঢোল বেজে উঠল। এই সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পুরুষের গলা সমবেতভাবে বজ্রনির্ঘোষে চেঁচিয়ে উঠল। সে কি গান!—যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অরণ্যের মাতামাতি। গানের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে নাচিয়েরা লম্বা সারিতে এগিয়ে এল। পুরুষদের পেশল তামাটে রঙের শরীর—ঘাড়ের ওপর কালো লম্বা চুল এলিয়ে আছে, পরনে শাদা রঙের ঘাগরা কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা। কোমরবন্ধে লাল কালো ও সবুজ রঙের সুতোর কাজ। ওদের হাতে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ও হলুদরঙা পালক। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ওরা একঘেয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসচে। পায়ের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর

কেঁপে উঠছে, সেই সঙ্গে কেঁপে উঠছে কোমর-বন্ধের সঙ্গে পেছন দিকে বাধা খাটাসের রূপোলি লেজ। প্রত্যেক পুরুষের পেছনে একটি মেয়ে—পরনে খাটো কালো রঙের শেমিজ, মাথার ওপর কড়ি ও পালকের বিচিত্র মুকুট। মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসছে। ওদের হাতেও পালকের গুচ্ছ—হাত ঘুরোবার সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে। শক্ত মাটির ওপর তালে তালে পা ফেলে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে।

মেয়েটি যে দোতলা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে, সেখানেও ঠিক ওই রকম ব্যাপার। চারদিকে ধূপধুনোর গন্ধ, সব চুপচাপ। হঠাৎ ওদিককার বাড়িতে গান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এ-বাড়িতেও শতকণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ। তারপর এদিক থেকেও নাচের দল সার বেঁধে বেরিয়ে পড়ল।

সারাদিন এই উৎসব চলল। ঢোলের বোলে অক্লান্ত আহ্বান। বহু পুরুষের সমবেত সঙ্গীতে ঝড়ের ইঙ্গিত। তামাটেরঙা পায়ের তালে তালে খাটাসের রূপোলি লেজের আন্দোলন। শরতের নির্মেঘ নীল আকাশ থেকে সূর্যের আলো নিঃসৃত হয়ে এলোচুলের কালিন্দী নদীর ওপর ঝরে পড়ছে! কঠিন পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা উপত্যকাটি নিস্তব্ধ; ওপরে—আরো ওপরে মেঘহীন আকাশের গায়ে উত্তুঙ্গ তুষার শিখর কঠিন হীরকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেয়েটি এ-দৃশ্য দেখল—অভিভূতের মতো, মন্ত্রমুগ্ধের মতো। ওর মনে হতে লাগল ঢোলের বাজনায়, সমবেত গানে ও নাচের ভেতর দিয়ে ওর সত্তা যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবনের ক্ষেত্র থেকে ওকে যেন অপহৃত করে দেওয়া হচ্ছে। নৃত্যপরা রেডইণ্ডিয়ান মেয়েদের মাথায় কড়ি ও পালকের মুকুট; এতো শিরসজ্জা নয়, এ যেন একটা রূপক, একটা সংকেত। এই সংকেতের মধ্যেই ওর অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র, যেখানে ও স্বতন্ত্র, যেখানে ও ব্যক্তিবিশেষ, সেখানে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কড়ি ও পালকের মুকুট যেন মেয়েদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

সমাধির ওপর শ্রেণী ও সমষ্টিগত নারীত্বের বিজয়-কেতন! তথাকথিত সভ্যজাতির মেয়েদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আর থাকবে না; যারা থাকবে, যারা বাঁচবে—তারা হলো নারীত্বের ছাঁচে ঢালা জীব, তাদের স্বকীয় ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না, এমন কি তাদের যৌনজীবনও নিয়ন্ত্রিত হবে সমাজের দ্বারা। ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো দেখতে লাগল কত লক্ষ লক্ষ মেয়ে আত্মোৎসর্গের জন্য তৈরি হচ্ছে। নিজের ঘরটিতে ফিরে গেল যখন, তখন ওর মন গভীর বেদনায় বিষিয়ে উঠেছে। এর পর থেকে যখনই সন্ধ্যার ঢোলের বাজনা হয় ও ঢোলের চারদিকে বসে গায়কের দল সমস্বরে গান গেয়ে ওঠে, তখনই ওর চোখের সামনে ছবি ভেসে ওঠে—সূর্য ডুবে গেছে, ঘনায়মান অন্ধকারে যূথবদ্ধ বন্য জন্তুরা যেন রাত্রির পিশাচ দেবতাদের আবাহন করছে। আতঙ্কে ওর বুকটা শিউরে ওঠে। ওদের গানের সুরে যেন সমস্ত নিশাচর জন্তুর ডাক মিশে গেছে—কখনো করুণ, কখনো উল্লসিত। আর সব ছাড়িয়ে যে-ডাক সেটা হলো আদিম পুরুষের—বর্বর হিংস্রতার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে আকস্মিক স্নেহের আবেগ।

কোনো কোনো দিন রাত্রে ও উঁচু ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ঢোলবাদকের চারদিকে অস্পষ্ট কুণ্ডলাকারে যুবকের দল বসে আছে গ্রামের প্রাঙ্গণের বাইরের সেতুটার ওপর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদের অবিরাম গান চলতে থাকে। যেদিন আগুন জ্বালায় সেদিন দেখা যায় অর্ধ উলঙ্গ বর্বরের দল থপ্ থপ্ করে পা ফেলে প্রেতের মতো নৃত্য করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচ চলতে থাকে। কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে আগুনের ধারে বসে পড়ে—শীত নিবারণ করার জন্য কম্বল মুড়ি দেয়।

একদিন ও যুবক রেডইণ্ডিয়ানটিকে জিগগেস্ করল, 'আচ্ছা তোমাদের সবারই পিরানে একই রঙ কেন—লাল হলদে আর কালো ডোরা

কাটা। তোমাদের মেয়েরাই বা কেন কালো জামা গায়ে দেয়।' যুবকটি ওর চোখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকায়, মুখে ওর সেই মৃদু চতুর হাসি খেলে যায়। হাসির পেছনে একটা অদ্ভুত আক্রোশ প্রকাশ পায়। ও বলে, 'আমাদের পুরুষেরা হলো আগুন ও দিনের বেলা। মেয়েরা তারার আলোর মাঝে মাঝে অন্ধকার ব্যবধান।'

'মেয়েরা তারাও নয়?'

'না। আমরা বলি ওরা কালো অন্ধকারের মতো একটি তারাকে অন্য তারা থেকে তফাতে রাখে।'

ওর দৃষ্টিতে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে ওঠে।

ও বলে, 'শ্বেতাঙ্গ লোকগুলো কিছু জানে না—বোঝে না। ওরা ছেলে-মানুষের মতো সারাক্ষণ খেলনা নিয়ে মত্ত। আমরা সূর্য কি তা জানি, চাঁদ যে কি তাও জানি। আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে যে যদি কখনো কোনো শ্বেতাঙ্গ মেয়ে আমাদের দেবতাদের কাছে নিজেকে বলি দেয়, তা হলে পৃথিবী আবার নতুন করে গড়ে উঠবে আর শ্বেতাঙ্গদের দেবতারা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

'নিজেকে বলি দেবে—তার মানে?'

সুচতুর হাসিতে ওর মনের ভাবটা ঢেকে ফেলে যুবক জবাব দেয়—

'তার মানে আর কিছু নয়। শ্বেতাঙ্গ মেয়ে তাদের নিজেদের দেবতাদের ছেড়ে আমাদের দেবতাদের কাছে চলে আসবে।'

ওর এই ব্যাখ্যাটি মেয়েটি মেনে নিতে পারল না। ওর বুকের ভেতর একটা সুনিশ্চিত ভয় ঠাণ্ডা বরফের মতো জমাট হয়ে উঠল।

যুবকটি বলে চলল 'সূর্য থাকেন আকাশের একদিকে, আর চাঁদ থাকেন আর এক দিকে। পুরুষদের কাজ হল সূর্যের ঘরে সূর্যকে খুশি রাখা—আর মেয়েদের কাজ হলে চাঁদের ঘরে চাঁদকে শান্ত রাখা। মেয়েদের কাজই হল এই। আকাশে যখন ওঁরা থাকেন, সূর্য পারেন না চাঁদের

ঘরে যেতে, আর চাঁদও পারেন না সূর্যের ঘরে যেতে। মেয়েরা তাই কেবল চাঁদকে ডেকে বলে চাঁদ যেন ওদের শরীরের ভেতরকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন। আর পুরুষেরা ক্রমাগত সূর্যকে নিজেদের দিকে টানে। টানতে টানতে একদিন ওদের শরীরে সূর্যের শক্তি ঢুকে যায়। তারপর যখন পুরুষ আর মেয়েতে মিলন হয়, তখন সূর্য চাঁদের গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। এই ভাবেই তো সৃষ্টির শুরু।'

মেয়েটি মন দিয়ে ওর কথা শোনে। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়।

যেমন মিথ্যাচারী শত্রুর দিকে লোকে তাকায় তেমনি ওর চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ, অবিশ্বাস ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

'তাহলে তোমাদের লোকেরা আমাদের কাছে হার মানল কেন?'

'রেডইণ্ডিয়ানদের শক্তি কমে যাওয়ায় ওরা সূর্যকে আর ধরে রাখতে পারেনি। সেই ফাঁকে শ্বেতাঙ্গরা এসে সূর্যকে চুরি করে নিয়ে গেছে। চুরি করে তো নিয়ে গেছে কিন্তু সূর্যকে কি ভাবে রাখতে হয় তা ওরা জানে না। ছোটছেলে ফাঁদ পেতে প্রকাণ্ড ছাইরঙা ভালুক ধরতে পারলে যেমন দশা হয় তার, তেমনি দশা হয়েছে তোমাদের। না পারো মারতে, না পারো পালিয়ে যেতে। ভালুক তো ইচ্ছা করলে ছেলেটাকে খেয়ে পালিয়ে যেতে পারে। শ্বেতাঙ্গরা সূর্যকে নিয়ে কী করবে জানে না—ওদের মেয়েরাও জানে না চাঁদকে নিয়ে কী করতে হয়। চিতাবাঘের ছানাদের মারলে চিতাবাঘ যেমন রাগে দিশেহারা হয়, চাঁদও তেমনি তোমাদের মেয়েদের ওপর রেগে গেছে। চাঁদ শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের জরায়ু কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে—ওদের গুহার মধ্যে চাঁদ কুপিত হয়। রেডইণ্ডিয়ানরা সে কথা টের পেয়ে গেছে। কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের মেয়েরা চাঁদকে আবার শান্ত করে তাদের শরীরের গুহায় ফিরিয়ে আনবে। সেই সঙ্গে আমাদের পুরুষেরাও সূর্যকে ফিরে পাবে, আর সেই সঙ্গে আসবে সমস্ত পৃথিবীর ওপর আমাদের প্রভুত্ব।

শাদা-চামড়া লোকগুলো জানেও না সূর্য কী রকম দেবতা। জানেও না, বোঝেও না।'

বিজয়ীর ভঙ্গীতে যুবকটি চুপ করে গেল।

মেয়েটি একটু আমতা আমতা করে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমাদের তোমরা এত ঘৃণা করো কেন? আমাকেই বা কেন?'

একটা হাসিতে যুবকের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, মৃদু গলায় বলল, 'নাঃ, আমরা তো ঘৃণা করি না।'

মেয়েটি হতাশ বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'হ্যাঁ করো।'

খানিকটা সময় চুপচাপ থেকে ছেলেটি উঠে চলে গেল।

তিন

এ-অঞ্চলে শীত পড়েছে, দিনের বেলা সূর্যের তাপে পাহাড়ের মাথায় বরফ গলে যায়। রাত্রে ভীষণ শীত। মেয়েটির সেই ঘোরের ভাব এখনও কাটেনি, বরঞ্চ বেড়েই চলেছে। ওর ইচ্ছাশক্তি ক্রমশই কমে আসছে, ওর হতবুদ্ধি অবসন্ন অবস্থার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটির মনে হয় ওকে কেউ যেন ঠকিয়েছে। সেই ওষধিজাত মিষ্ট পানীয়টুকু খেলেই আবার সব আক্ষেপ শান্ত হয়ে যায়, ওর সমস্ত চেতনা যেন এমন একটা সূক্ষ্মস্তরে গিয়ে পৌছয় যেখানে ওর মনে হয় ও নিজেকে যেন সমস্ত জগতের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে এই ঐক্য-বোধটাই শেষ পর্যন্ত ওর সমগ্র চেতনার স্থান গ্রহণ করল। ও যেন গ্রহতারাদের গতির শব্দ শুনতে পায়। ওর দরজার ফাঁক দিয়ে ও দেখতে পায় অনাদি অনন্ত কাল থেকে যেন সমস্ত অন্তরীক্ষ জুড়ে একটা বিরাট নৃত্যোৎসব চলেছে। গ্রহতারকারা তালে তালে পা ফেলে নৃত্য করছে, মাঝে মাঝে অন্ধকারের ব্যবধান রেখে। কুয়াশায় ঢাকা শীতের দিনে ও হঠাৎ শুনতে পায় পাহাড়ের ওপরকার তুষার যেন পাখা নাড়ছে, যেন মৃদুমন্দ শিস

দিচ্ছে। হংসবলাকার মতো এই বিরাট শ্বেতকায় পাখিগুলো নিঃশব্দ পক্ষবিধূননে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। অদৃশ্য চাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে উড়ে যাবার বেলা ওদের পাখার আঘাতে সমস্ত আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে ওঠে। যে-তুষার থমকে থেমে গেছে পাহাড়ের মাথায়, তার সঙ্গে মেয়েটি কথা বলে—বলে, 'নেমে এসো।' কুয়াশায় ঢাকা অদৃশ্য চাঁদকে ডেকে বলে, 'আর অভিমান করে থেকো না, সূর্যের সঙ্গে ভাব করো।' কোনো কোনো দিন বরফ পড়ে আলগা ভাবে—হালকা হাওয়ায় একটা সুবাস ভাসে। সেদিন মেয়েটি ঠিক বুঝতে পারে সূর্যের আতপ্ত আলোয় চাঁদ যেন শিথিল শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে, সূর্যের তৃপ্তির সঙ্গে মিশে গেছে চাঁদের তৃপ্তি।

ও যেন আজকাল বুঝতে পারে কেন রেডইণ্ডিয়ানদের এই শান্তিপূর্ণ উপত্যকার ওপর অসন্তোষের ছায়া পড়েছে, বুঝতে পারে এই দুঃখের অনেকখানি ওদের ধর্মবুদ্ধিজাত।

যুবকটি ওর ভাঙা ভাঙা স্পানিশে অনেক কথা বুঝিয়ে বলতে চায়। একদিন বলছিল, 'দেখো, সূর্যের ওপর আমাদের অধিকার নষ্ট হয়ে গেছে, সে-ই সূর্যকে এখন আমাদের ফিরে পেতে হবে। বুনো ঘোড়ার মতো সূর্য আমাদের নাগালের বাইরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ফের ওকে বাগ মানানো—সে কী একটুখানি কাজ!'

মেয়েটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল, 'তাই হোক, সূর্যকে তোমরা আবার পাও।' বিজয়ের গর্বে ওর মুখখানা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যুবকটি বলে, 'সত্যি করে বলছ এই তোমার মনের কথা?'

মেয়েটি সর্বনাশ ডেকে আনল ওর মাথার ওপর, স্থির গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো ভাবনাই নেই। ঠিক ফিরিয়ে আনবো দেখো।' যুবকটি খুব খুশি হয়ে সেদিন চলে গেল।

মেয়েটি বুঝতে পারছে একটি চরম পরিণতির দিকে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে—এ সম্ভাবনা পরম দুঃখের সম্ভাবনা। কিন্তু তা হলে কি হয়, ফিরে আসার পথ নেই।

দিনগুলো খুব ছোট হয়ে আসছে, বোধহয় ডিসেম্বর মাস। একদিন আবার ওকে সেই অতি স্থবির রেডইণ্ডিয়ানটির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। আবার বৃদ্ধ তার কুঞ্চিত আঙুল দিয়ে মেয়েটির নগ্নদেহ স্পর্শ করল। প্রবীন রাজা ওর দিকে তাকিয়ে দেখল গভীর একাগ্র দৃষ্টিতে—বহুদূরের দৃষ্টি বহু কাছের মানুষকে যেন দেখছে। মেয়েটিকে উদ্দেশ করে অস্ফুট স্বরে কি যেন কথা বলল।

যুবকটি বিদায়-নমস্কারের ভঙ্গী দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল, 'উনি চাইছেন তুমি ওঁকে বিদায় নমস্কার জানাও।'

মেয়েটি প্রাচীন রাজার চোখ দুটি দেখছে—কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! তক্ষকের চোখের মত নিষ্পলক এই দৃষ্টি সম্মোহিত করে, সমস্ত শক্তি যেন অবশ করে দেয়। অথচ ওর চোখের চাউনিতে কী গভীর করুণা! মুখের সামনে হাত রেখে মেয়েটি রেডইণ্ডিয়ান কায়দায় বিদায় সম্ভাষণ জানালো। প্রতি-সম্ভাষণ করে বৃদ্ধ খাটের ওপরকার লোমশ পুরু গদিতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে হল ওর দিন যেন ফুরিয়ে এসেছে—আর বুড়ো নিজেও যেন সেকথা জানে।

আরেকদিন উৎসবের ধুমধাম। সেদিন মেয়েটিকে সকল লোকের সমক্ষে বের করা হল, পরনে নীল কম্বল, শাদা ঝালর দেওয়া, হাতে দেওয়া হল নীল পালক। এক বাড়ির বেদীর সামনে ওর চারদিক ঘিরে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া দেয়া হল। ওর গায়ের ওপর ছাই ছড়িয়ে দিয়ে ওরা ওকে নিয়ে গেল উলটো দিকের বাড়িতে। সে বাড়ির বেদীর সামনে জমকালো হলদে লাল ও কালো ডোরাকাটা চাদর গায়ে পুরোহিতের দল ধূপদানি হাতে ওকে ঘিরে যেন আরতি করতে লাগল। কী বীভৎস

দেখতে—মুখময় সিঁদুর লেপা! আরতির পর ওর গায়ে পুরোহিতেরা জল ছিটিয়ে দিল। বেদীর আগুন দেখছে এমন সময় মেয়েটি শুনতে পেল গুরু গুরু শব্দে মাদল বেজে উঠল, গম্ভীর গলায় পুরুষ গায়কেরা গান ধরেছে, প্রাঙ্গনে সবাই সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে, এখনি ওদের ব্রতনৃত্য শুরু হবে। ও সবই দেখছে আবছা ভাবে, যেন এই ঘটনাগুলো ওর অচেতন মনের পর্দার উপর ছায়ার মতো উদয় হচ্ছে আবার লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ওর সূক্ষ্ম চেতনায় ও যেন শুনতে পাচ্ছে জ্যামুক্ত তীরের মতো পৃথিবী তার চক্রপথে ছুটে চলেছে, অন্তরীক্ষের সমুদ্র উন্মথিত করে। কানে আসছে বিরাট ধনুকের টংকার। ওর মনে হচ্ছে একটা সোনালি রঙের ফোয়ারা যেন ঊর্ধ্ব আকাশে উঠছে সূর্যের দিকে, আর ওদিকে যেন একটা রূপোলি ঝরনা নেমে আসছে চাঁদের কক্ষ থেকে হিমবন্ত গিরিশৃঙ্গের ওপর। এদিকে সোনালি আলোর ফোয়ারা আর ওদিকে রূপোলি বৃষ্টির ঝরনা—এই দুয়ের মাঝখানে একজন জ্যোতির্ময় অগ্নিবসন পুরুষ একদিকে যেন উত্তাপ ও অন্যদিকে বর্ষন নিবারণ করে নির্বিকার ভাবে বসে আছেন।

আর একটি ছায়ামূর্তি ও দেখতে পাচ্ছে—সে হলো বায়ু। এই মুহূর্তে সুনীল আকাশের প্রান্ত থেকে উঁকি মেরে দেখছে, পরমুহূর্তে আবার হাওয়ার রথে চড়ে কোথায় কোন সুদূরে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর গুহা থেকে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠছে আকাশের দিকে আবার আকাশ থেকে ঝড়ের গতিতে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। নীল হাওয়া—এ যেন দুটো জগতের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে, যেন বিশ্বজোড়া ঐকতানে সুর মেলাচ্ছে ও, একবার সোনালি তারের তারায় বাঁধছে সুর, আবার আরোহণ করছে রূপোলি তারের উদারায়।

ওর ব্যক্তিগত অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এখন ও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে বিশ্বচেতনার মধ্যে।

রেডইণ্ডিয়ানদের ধর্মান্ধ দৃষ্টিতে ও এখন সমস্ত জগতটা দেখছে।
নিজের সম্বন্ধে ও একটি মাত্র কথা একদিন জিগগেস করেছিল যুবকটিকে —'আচ্ছা, একমাত্র আমার পরনে নীল রঙ কেন?' যুবক বলল, 'নীল-রঙ হল হাওয়ার রঙ। এই আছে এই নেই। অথচ মৃত্যুর মতো বায়ু সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। নীলরঙ হল মৃত্যুর রঙ। দূর থেকে নীল আকাশ আমাদের দেখে, কাছে আসতে পারে না। যত এগিয়ে যাই তত ও আবার পিছু হটে। আমাদের দেখ—লালচে তামাটে অথবা হলদে আমাদের গায়ের রঙ, কালো চুল, শাদা দাঁত আর লাল রক্ত। আমরা এখানে আছি, এখানেই থাকবো। তোমাদের নীল চোখ; তোমরা এসেছ সুদূর দেশের দূত হয়ে। তোমাদের তো এখানে থাকা চলবে না। এবার ফিরে যেতে হবে।'
'ফিরে যাবো কোথায়?'
'কোথায় আবার, ওই আকাশে যেখানে সূর্য আছে, যেখানে আছে বৃষ্টির মা চাঁদ। তাদের কাছে গিয়ে তোমাদের বলতে হবে আবার আমরা রেডইণ্ডিয়ানরা—পৃথিবী দখল করেছি। যেমন ভাবে লোকে লাল মরদ ঘোড়ার সঙ্গে নীলরঙা মাদী ঘোড়ার মিলন ঘটায় তেমনি আমরা আবার সূর্যের সঙ্গে চাঁদের মিলন ঘটাতে পারি। এ-কাজ আমরা ছাড়া আর কেউ পারবে না। শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা চাঁদকে তাড়িয়ে দিয়েছে, দূর আকাশে সূর্যের কাছে ওকে আসতে দেয় না। সেইজন্যেই তো সূর্য রেগে আগুন হয়ে গেছে। রেডইণ্ডিয়ানদের কাজ হবে চাঁদকে সূর্যের কাছে ফিরিয়ে আনা।'
'কেমন করে আনবে?'
'শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে মরতে হবে। মরে গিয়ে সে হাওয়ার মতো উড়ে চলে যাবে। আকাশে উঠে সূর্যকে বলবে যে রেডইণ্ডিয়ানরা দুয়োর খুলে দিতে প্রস্তুত। এদিকে আমাদের মেয়েরা চাঁদের দুয়োর দেবে খুলে। নীল

প্রবালের কারাগার থেকে শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা চাঁদকে আসতে দেয় না। আগে তো তা ছিল না, আগে চাঁদ নেমে আসত, শাদা ছাগল যেমন আসে ফুলের বনে। সূর্যও আসতে চায় আমাদের কাছে, যেমন ঈগল এসে বসে পাইন গাছের ডালে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মেয়ে সূর্যকে আর চাঁদকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। ওরা বেরিয়ে আসতে পারে না, রাগে গর গর করতে থাকে। রেডইণ্ডিয়ানরা বলে সূর্যের কাছে ওরা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে বলি দেবে। তা হলেই সূর্য শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে চলে আসবে আমাদের কাছে। চাঁদ দেখবে দুয়োর খোলা, এমন হকচকিয়ে যাবে, পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। তখন আমাদের রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েরা গান গেয়ে গেয়ে চাঁদকে ডেকে বলবে—'এসো, এসো চাঁদ, যেয়ো না, এসো আমাদের শ্যামল প্রান্তরে। ধলা মেয়েকে ভয় কোরো না। আমাদের কাছে যদি আসো ধলা মেয়ে· তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না জেনো!

'শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে সূর্য দেখবে আমাদের শ্যামল গোচারণ ভূমিতে চাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে শাদা ধবধবে ছাগলের বেশে। তাকে ঘিরে আছে রেডইণ্ডিয়ান মেয়েরা, আর পুরুষেরা আমরা খাড়া দাঁড়িয়ে আছি উন্নতশীর্ষ পাইন গাছের মতো। শ্বেতাঙ্গদের মাথা টপকিয়ে তখন এক দৌড়ে সূর্য আমাদের দিকে চলে আসবে। তখন দেখবে আমরা যারা লালচে কালো আর হলদে—আমরা যারা চির-কাল আছি, চিরকাল থাকবো—আমরা সূর্য ও চাঁদ দুজনাকেই ফিরে পাবো। সূর্য থাকবে আমাদের ডান দিকে আর চাঁদ থাকবে বাঁয়ে। বৃষ্টি তখন আমাদের ইচ্ছেমতো সুনীল আকাশের শ্যামল প্রান্তর থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়বে। আমরা ডাক দিলেই বায়ু এসে শস্যকে জাগিয়ে দেবে। আমাদের ইচ্ছেয় মেঘ কেটে যাবে আর প্রত্যেক ভেড়া যমজ বাচ্চা প্রসব করবে। বসন্ত কালের মতো আমরা শক্তিমান হয়ে

উঠব, আর তোমাদের কপালে তখন হবে কঠিন কঠোর শীত ঋতু…’
শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি বলল, ‘কই আমি তো চাঁদকে লুকিয়ে রাখিনি—কেমন করে রাখবো ?’
‘রাখোনি ? ডুয়োরটা দিয়েছো বন্ধ করে—আর এখন হাসা হচ্ছে। ভাবছো সব কিছু বুঝি তোমাদের মরজি মতো হবে ?’
যুবকটি যে ওকে কী চোখে দেখে সে ও আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারে-নি। ওর ব্যবহার এত শিষ্ট, ওর হাসিটা এত মৃদু—অথচ ওর চোখের দৃষ্টিতে কী গভীর বিদ্বেষ, ওর কথার মধ্যে কী নির্মম নৈর্ব্যক্তিক ঘৃণা ! মেয়েটি ঠিক জানে যে ব্যক্তিগতভাবে ওকে যুবকের ভালোই লাগে, ওর প্রতি যুবকটির একটা অদ্ভুত অযৌন স্নেহের আকর্ষণ আছে—একথা মেয়েটি বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু যেখানে ও ব্যক্তি নয় সেখানে ওর প্রতি কী নিদারুণ অকারণ অবজ্ঞা। এই মাত্র ওর দিকে তাকাচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল মুখে—পর মুহূর্তে আবার যুবকটির চোখে কুটিল ঘৃণার আলো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠছে।
‘আমায় তাহলে কি করতে হবে, সূর্যের কাছে উৎসর্গ করার জন্য ?’ মেয়েটি জিগগেস করে।
ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে যুবক বলে, ‘একদিন আমাদের সবাইকেই তো মরতে হবে।’
ওর প্রতি ওদের ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সৌজন্যের অভাব নেই। অদ্ভুত লোক-গুলো—বুড়ো পুরোহিত থেকে আরম্ভ করে যুবক দলপতি পর্যন্ত সবারই ওর জন্যে নারীসুলভ উদ্বেগ, কিসে ওর সুখসুবিধে হয় সেজন্য সবাই সারাক্ষণ ব্যস্ত। একদিকে এই নারীসুলভ স্নেহ, অন্য দিকে আবার ওরা কঠিন নির্দয়ভাবে পুরুষ। সেখানে ওদের আদিম পৌরুষ কালো চোখের দৃষ্টিতে, ওদের দৃঢ়বদ্ধ চিবুকে, ওদের কঠিন দন্তপংক্তিতে সুস্পষ্ট।
শীতের দিন, বরফ পড়ছে—এই রকম একটা দিন ওকে ওরা দোতলা

বড়ো বাড়িটার একটা সুপ্রশস্ত ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের এক কোনায় উঁচু বেদীর ওপর ধুনি জ্বলছে। ধুনির আলোয় ও দেখতে পেল পুরোহিতদের অনাবৃত দেহগুলো চক্‌চক্ করছে, দেয়াল ও ছাদের গায়ে নানারকম অদ্ভুত আঁকজোক কাটা। এ-কামরাটার দুয়োর-জানালা নেই, ওরা ছাদ থেকে নামল একটা সিঁড়ির সাহায্যে। পাইন কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে চিত্রিত দেয়াল, কালো, লাল ও হলদে রঙে রঙ-করা চালচিত্র, দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গিতে নানা রকম অদ্ভুত জিনিস রাখা। আবছা আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—সেগুলো কী রকম দেখতে।

অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ পুরোহিতেরা আগুনের কাছে বসে কি যেন যজ্ঞ করছে। সব নিস্তব্ধ! দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বসবার জায়গা—সেইখানে বেদীর ঠিক উলটো দিকে ওর বসবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। ওর দুপাশে দুজন লোক চুপ করে বসে। ওরা কিছুক্ষণ পরে ওর হাতে একটা পাত্র এনে দিল। ও বিনা দ্বিধায় সমস্ত নির্যাসটুকু নিঃশেষে খেয়ে নিল—ইচ্ছা, সেই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা এসে ওর সমস্ত চৈতন্য লুপ্ত করে দিক।

সেই বাণীহীন অন্ধকারে পর পর কী ঘটল সব ও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। প্রথমে ওর সব কাপড়-চোপড় খুলে নেওয়া হল; তারপর দেওয়ালের গায়ে একটা অদ্ভুত নীল, শাদা ও কালো রঙে আঁকা চিত্রের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে সুবাসিত জলে ওর সমস্ত অঙ্গ ধুইয়ে দেওয়া হল, চুল পর্যন্ত সযত্নে ধুয়ে শাদা কাপড় দিয়ে মুছে দিল। তারপর একটা অদ্ভুত লাল কালো ও হলুদ রঙে আঁকা মূর্তির পায়ের কাছে ওকে শুইয়ে দিয়ে সুগন্ধি তেল দিয়ে ওর সমস্ত শরীর মালিশ করতে লাগল। আরামে ওর চোখ যেন জড়িয়ে আসছে। কালো কালো হাতে যেমন শক্তি তেমনি নরম তাদের স্পর্শ। ওর ধবধবে শাদা শরীরের ওপর কালো কালো মুখগুলো

ঝুঁকে পড়েছে, মুখের ওপর ডগডগে লাল সিঁদুর লেপা, চিবুকের কাছে হলুদরঙের রেখা। কালো চোখে একাগ্র নিবিষ্ট দৃষ্টি, কালো হাতগুলো ওর নরম শাদা ধবধবে শরীর মর্দন করে চলল।

ওরা ব্যক্তির কথা ভুলেই গেছে, এমন একটা কিছু ভাবছে যার সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত সংস্রব নেই। ওকে ওরা নারী হিসাবে কখনও দেখেনি, তা ও জানে। ওদের কাছে ও হল তত্ত্বের বস্তু। মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ও দেখতে লাগল পুরোহিতদের মুখগুলো ওর শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, স্বেদসিক্ত উজ্জ্বল মুখের ওপর ডগডগে লাল সিঁদুরের রঙ—তার ওপর হলুদে রঙের সরল রেখা। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ওদের মনের ভাব জানতে চেষ্টা করতে লাগল। একটি গভীর বিষাদের সঙ্গে যেন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা মিশে গেছে; একদিকে প্রতিশোধের জন্য বদ্ধপরিকরতা অন্যদিকে আসন্ন বিজয় গৌরবের উল্লাস—এই সমস্ত ভাব-গুলো ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর শরীর যেন রক্তমাংস অস্থিমজ্জার সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়ে গলে যাচ্ছে; রক্তিমাভ কুয়াশার মতো ওর চেতনা বিচ্ছুরিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, ও যেন সূর্যের শেষরশ্মির মতো ক্ষণিকের জন্য পশ্চিমের পীনোন্নত মেঘের স্তরের ওপর আশ্রয় নিয়েছে।

ও জানে এ-রক্তিমাভা ক্ষণস্থায়ী—এ রঙীন মেঘ ক্ষণিকের মধ্যে আবার ধূসর বিবর্ণ হয়ে মিলিয়ে যাবে। হোক না ক্ষণিকের স্বপ্ন—এ স্বপ্ন ওর ভালো লাগছে। ও জানে ওকে বলি দেওয়া হবে এবং এ সমস্ত সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। তা হোক না। ও চায় নিজেকে উৎসর্গ করতে।

এর পর ওরা ওকে নীলরঙের একটা ছোটো অথচ ঢিলে জামা পরিয়ে দোতলায় নিয়ে গেল, যাতে সবাই ওকে দেখতে পায়। নিচের দিকে ও তাকিয়ে দেখে প্রাঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। সব কয়টি কালো চোখে একটা কঠিন উল্লাস যেন দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। কারো মুখে একটুও মায়া বা করুণার চিহ্ন নেই। ওকে দেখে নিচের জনতা অস্ফুট স্বরে

গুঞ্জন করে উঠল। ওর গা ছম ছম করছে—পর মুহূর্তেই ও নিজেকে সামলে নিল।

এর পরের দিন ওর অন্তিম দিন। বড় দোতলা বাড়ির একটি কামরায় ওকে ঘুমোতে দেওয়া হয়েছিল আগের রাতটাতে। ভোরবেলায় ওরা শাদা ঝালর দেওয়া নীল কম্বলখানা ওর গায়ে চাপিয়ে ওকে একেবারে প্রাঙ্গনের মধ্যে, জনতার মাঝখানে এনে হাজির করল। মাটির ওপর ধবধবে শাদা বরফ পড়েছে—চারদিকে কালো কম্বল মুড়ি দেওয়া লোকগুলোকে দেখাচ্ছে যেন ওরা অপর কোনো জগতের প্রাণী।

গুরুগুরু শব্দে একটা বিরাট ঢোল বাজছে, আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একজন বৃদ্ধ পুরোহিত পাশের একটা বাড়ির ছাদের ওপর থেকে মন্ত্র পড়ছে। ডুলি যখন এল তখন প্রায় দুপুরবেলা, ডুলি দেখেই সমস্ত জনতা অস্ফুট স্বরে যেন ডুকরে উঠল। ডুলিতে বসে সেই অতিবৃদ্ধ রেড ইণ্ডিয়ান রাজা, ওর ধবধবে শাদা শনের মতো চুল কালো ফিতে দিয়ে বিনুনি করা, ওর চামড়ার রঙ যেন আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত কালো কাঁচের মতো স্বচ্ছ। হাত তুলে ইসারা করতেই প্রবীন রাজার বাহকেরা ডুলিটা ঠিক মেয়েটির সামনে নামিয়ে দিল। ওর দিকে ক্ষীণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধ কাঁপা গলায় মেয়েটিকে উদ্দেশ করে কী যেন কথা বলল। সে কথার মানে যে কি কেউ ওকে বুঝিয়ে দিল না।

আর একটা ডুলি এল। সেই ডুলিতে ওকে বসিয়ে দিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হল। শোভাযাত্রার আগে আগে চলল চার জন পুরোহিত লাল হলদে ও কালো রঙের পোশাক পরে, মাথায় পালকের টুপি। তার পর এলো বুড়ো রাজার ডুলি। মাদল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দুটো বিভিন্ন দলের গান শুরু হল—সে কী দুর্দান্ত চীৎকার! লালচে রঙের মানুষগুলো আজ উৎসবের বেশ পরেছে—মাথায় পালক গোঁজা, কোমরে কাজ করা কটিবাস। প্রাঙ্গনের দুপাশে দুটো লম্বা সার বেঁধে

গানের দলকে পাশে রেখে নাচের দল দাঁড়াল। নাচতে নাচতে ওরা শোভাযাত্রার সঙ্গে বেরিয়ে এল—চামড়ার রঙ লাল, চুলের রঙ কুচকুচে কালো, খাটাসের লেজের রূপোলি রঙ—এই সবে মিলে একটা বর্ণাঢ্য ব্যাপার হয়ে উঠল।

নেচে নেচে ওরা এগিয়ে গেল। পেছনে পেছনে ওর ডুলি আর নৃত্যরত পুরোহিতের দল। সবাই নাচছে এমন কি ডুলির বাহকেরা পর্যন্ত যেন নাচের তালে তালে পা ফেলে চলছে। ধূমায়িত আগুনের চুলির পাশ দিয়ে, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে নিষ্পত্র গাছের সারির নিচ দিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে। বরফের ফাটলের তীক্ষ্ণ দাঁতের তলা দিয়ে ঝির ঝির করে সূক্ষ্মজলের ধারা ছুটে চলেছে—সেই নদী পেরিয়ে, চৌকোনা ক্ষেতগুলো ছাড়িয়ে ওরা নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল।

সমস্ত উপত্যকা শক্ত বরফের শুভ্র আলোয় সমুজ্জ্বল, পাহাড়ের সানুদেশ পর্যন্ত বরফে আবৃত। এই দুগ্ধধবল প্রান্তর অতিক্রম করে লাল ও কালো রঙের শোভাযাত্রা। দ্রুতনিনাদে ঢাক বাজছে, হিমেল হাওয়া শত কণ্ঠের গর্জনে মুখরিত।

ডুলির ওপর শরীর এলিয়ে বসে আছে মেয়েটি, বড় বড় নীল চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের নিচে ক্লান্তির কালিমা পড়েছে। ও ঠিক বুঝতে পারছে এই দীপ্তিময় তুষার শয্যায় আজ ওর মৃত্যু অবধারিত। কালো পাহাড়ের গায়ে লম্বা সরু সরু জমাট বরফের রেখা—দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন চাবুক মেরেছে। উঁচু পাহাড়ের মাথার ওপর এক টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল নীল। মেয়েটি মনে মনে ভাবছে, 'আমি তো মরেই গেছি। এক মৃত্যু থেকে অন্য মৃত্যুতে যাওয়া সে আর এমন কি শক্ত!' তবু ওর মন মানে না, নিকট সম্ভাবনার কথা ভাবলেই বুকের সব রক্ত যেন শুকিয়ে যায়।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে, নাচের বিরাম নেই। পাইন গাছের মাঝ-

খান দিয়ে যে ঢালু রাস্তাটা গেছে সেই রাস্তায় ওরা এগিয়ে গেল। নাচিয়েদের গায়ের রঙ তামাটে, পাইন গাছের গুঁড়ির রঙও তামাটে। ওর ডুলিটাও খানিক পরে সেই রাস্তা ধরে চলল। এবার ওরা ওপরে উঠতে শুরু করেছে বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে। ওরা যে-পথে চলছে সে হলো একটা নদীর ধারা—প্রচণ্ড শীতে জমে বরফ হয়ে গেছে। এপাশে ওপাশে লালচে রঙা উইলোর ঝোপ, একটু দূরে অ্যাসপেন গাছ দাঁড়িয়ে আছে রক্তলেশহীন মৃত দেহের মতো, তারও ওদিকে কালো কালো ছুঁচলো পাথর।

এতক্ষণে ও বুঝতে পারল নাচের দল এবার তাদের চলা থামিয়েছে। ক্রমশ ওর ডুলি এগিয়ে আসছে বাজনদারদের কাছে—গুহাস্থিত শ্বাপদের গর্জনের মতো ঢাকঢোলের বাজনার শব্দ ক্রমেই যেন নিকটতর হচ্ছে। অদ্ভুত দৃশ্য এ-জায়গাটার। পাহাড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা গুহা, গুহার ঠিক সামনের দিকে একটা প্রকাণ্ড সূচ্যগ্র বরফের ফলা নেবে এসেছে নিচের দিকে। যেন অতিকায় একটা রাক্ষস হাঁ করে আছে, আর জমাট বরফটা যেন তারই বিরাট দন্ত। ওপরকার খাড়া পাহাড় থেকে এই বরফটা নাবছে গুহার মুখের সুমুখ দিয়ে। যে-জায়গাটায় জল জমে হ্রদ হবার কথা, ঠিক তারই ওপর পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ দাঁতটা বিলম্বিত—হ্রদ অবধি বরফ পৌঁছয়নি। বরফের ঝরনা যেন শূন্যে ঝুলছে।

এই শক্ত বরফের হ্রদের দুধারে নাচিয়ের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। নাচের বিরাম নেই। পেছনে লালচে রঙের ঝোপ ঝাড় আর তারই সামনে নৃত্যরত রেডইণ্ডিয়ানদের দল।

মেয়েটির এদিকে লক্ষ্য নেই। ও স্থির দৃষ্টিতে দেখছে বরফের সুঁচলো দাঁতটা। জমাট বরফটার পেছনে গুহার মুখটা হাঁ করে আছে। চিতাবাঘের মতো ডোরাকাটা কম্বল গায়ে পুরোহিতের দল একে একে গুহার গা বেয়ে উঠছে ঠিক ওই রাক্ষুসে মুখটার মধ্যখানে। ঠিক

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই বাহকের দল ওর ডুলি নিয়ে পুরোহিতদের পেছনে পেছনে উঠতে লাগল। মাথার ওপর গুহার ছাদটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে গভীর অন্ধকারে, সামনেই সেই বরফের বিরাট দাঁতটা ঝুলে আছে।

গুহার মাঝখানে পুরোহিতেরা তাদের জমকালো পালকের টুপি ও ঝালর লাগানো কম্বল গায়ে অপেক্ষা করছে ওর আসার জন্য। দু-একজন এগিয়ে গেল বাহকদের সাহায্য করতে। এবার গুহার গভীরতম প্রদেশে ওর ডুলি নামানো হল। অনেক নিচে হ্রদের দুধারে তখনও অবিরাম নৃত্য চলছে—সারা গাঁয়ের লোক ভীড় করে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

সূর্য অস্তোন্মুখ। এ দিনটা বছরের সব চাইতে ছোট দিন। ও বুঝে নিয়েছে এই দিনই ওর জীবনের শেষ দিন। সামনের সেই বরফের স্তম্ভ অস্তগামী সূর্যের আলোয় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। এই স্তম্ভের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওকে দাঁড় করানো হল।

কোনো একটা নির্দেশ দেওয়া হলে পর নাচ থেমে গেল। চারদিকে এখন থমথমে স্তব্ধতা। ওকে এক পাত্র পানীয় দেওয়া হল। ওর ঢিলে জামাটা এবার খুলে নেওয়া হল, শুভ্র নগ্নতায় ও দাঁড়াল রঙবেরঙের পোশাক-পরিহিত পুরোহিতদের সামনে। নিচে ঊর্ধ্বমুখ জনতা অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠল। তারপর ওর মুখ ঘুরিয়ে দাঁড় করানো হল—যেন জগতের দিকে ও শেষ বারের মতো পিছন ফিরে দাঁড়াল। ওর দীর্ঘ সোনালি রঙের চুল দেখতে পেয়ে জনতা আর একবার চেঁচিয়ে উঠল।

ও এখন গুহার ভেতর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। গুহার গভীরতম গহ্বরে আগুনের শিখা লকলক করছে। সেই আগুনের আলোয় ও দেখল চারজন পুরোহিত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স, শক্ত সমর্থ শরীর, অঙ্গবাস খুলে ফেলেছে, সামান্য কৌপিনের কথা বাদ দিলে ওদের প্রায় মেয়েটির মতো নগ্ন অবস্থা।

ধুনির ভেতর থেকে যেন সেই অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বেরিয়ে এল হাতে ধূপদান নিয়ে। একেবারে উলঙ্গ শরীর, মুখ দেখে মনে হয় যেন ভাবাবিষ্ট। বলির সামনে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে লাগল। ওর পেছন পেছন এল আর একজন নগ্ন পুরোহিত। হাতে তার আদিম মানুষের পাথরের তৈরি ছুরি।

ধূপের ধোঁয়া দেবার পর মেয়েটিকে একখানা পাথরের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। সেই চারজন শক্ত সমর্থ লোক ওর হাত পা শক্ত করে ধরল। পেছনে সেই স্থবির পুরোহিত খাড়া দাঁড়িয়ে—যেন কালো কাঁচের মতো স্বচ্ছ চামড়ায় ঢাকা একটা নরকঙ্কাল। হাতে পাথরের তৈরি ছুরি নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অস্তগামী সূর্যের দিকে—ওর পেছনে দাঁড়িয়ে অপর একজন নগ্ন পুরোহিত—তার হাতেও পাথরের তৈরি সুতীক্ষ্ণ ছুরি। ও সবই বুঝতে পারছে কিন্তু ঠিক যেন অনুভব করতে পারছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে সূর্য কেমন হলদে, নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছে। ডুবে যাবার দেরি নেই। বরফের স্তম্ভটা যেন সূর্য ও ওর মাঝখানে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে। ও দেখতে লাগল আস্তে আস্তে সূর্যের হলুদ আলোয় গুহার অর্ধেক অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে বেদীর কাছে ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে সেই গভীরে এখনো সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারেনি।

শেষ রশ্মিটুকু যেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। যতই আলোটা আরক্ত হচ্ছে ততই যেন ভিতরে এগিয়ে আসছে। ও বুঝতে পারছে রক্তের মতো লাল হয়ে সূর্য যখন অস্ত যাবে, তখন সূর্যের সমস্ত আলোটুকু বরফের স্তম্ভ ভেদ করে একেবারে গুহার গভীরতম প্রদেশ আলোকিত করে দেবে। এই শেষ রশ্মিটুকুর জন্য ওরা প্রতীক্ষা করে আছে। ওর হাত পা ধরে আছে যে-চারজন তারা কালো কালো আগ্রহভরা চোখে তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে—ওদের শঙ্কান্বিত চোখে কী তীব্র আকুতি।

প্রবীণ রাজার চোখ দুটোও সূর্যের দিকে স্থিরনিবদ্ধ—এ যেন অন্ধের নিষ্পলক দৃষ্টি। অস্তোন্মুখ সূর্যের প্রতি কী একটা ভাষাহীন প্রার্থনা ওর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেন আত্মপ্রকাশ করছে। চারিদিকে বরফের মতো জমাট স্তব্ধতা। উলূকিপরা স্তব্ধ মুখগুলো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। সেই মুখে কী উৎকণ্ঠা, কী গভীর হিংস্রতা। ওরা হিংস্র প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছে। সেই শুভক্ষণটা এলে ওরা বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু কী উৎকণ্ঠা ওদের চোখে!

কেবল অতিবৃদ্ধ পুরোহিতের দৃষ্টি অনাবিল-নির্বিকার। অন্ধের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে ও যেন সূর্যকে পর্যন্ত অতিক্রম করে কোন অতি সুদূরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর একাগ্র তন্ময় দৃষ্টির মধ্যে কী গভীর শক্তি, যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থলে সে দৃষ্টি প্রবেশ করছে। অনড় অটলভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে কখন সূর্যের শেষ রক্তিম রশ্মি তুষারস্তম্ভ ভেদ করে গুহার গভীরে প্রবিষ্ট হবে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ও সোজা লক্ষ্যস্থলে আঘাত করবে, যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবে, সার্থক হবে বলিদান, উদ্ধার হবে হৃতশক্তি।

এই শক্তিই হল পুরুষের কাম্য, এই শক্তিই বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয়ে জাতিকে শক্তিমান করে।

—ক্ষিতীশ রায়

ঘোড়-সদাগরের মেয়ে

'তারপর মেব্‌ল্‌, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ঠিক করেছ?'—জো নির্বোধের মতো হালকা সুরে জিগগেস করলে। নিজেকে বেশ নিরাপদ বলেই সে জানে। উত্তরের অপেক্ষা না করেই মুখ ফিরিয়ে এক টুকরো তামাক জিবের ডগায় এনে সে থুতু ফেললে। তার নিজের কোনো দুর্ভাবনা নেই তাই আর কিছু নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

সকালে খাবার টেবিলের চারধারে মেব্‌ল্‌ আর তার তিন ভাই ভাসা ভাসা একটা পরামর্শ করবার জন্যে বসেছিল। সকালের ডাকে যে খবর এসেছে তাতে বোঝা গেছে যে এ পরিবারের শেষ সম্বলটুকুও আর নেই, এখন সব শেষ। ভারি-ভারি মেহগনির আসবাব পত্র নিয়ে খাবার ঘরটাও যেন শুধু সব শেষ হবার অপেক্ষায় বিরস মুখে চেয়ে আছে।

পরামর্শের ফল অবশ্য কিছু হল না। তিন ভাই টেবিলের চারধারে হাতপা ছেড়ে বসে ধূমপান করতে করতে নিজেদের কথা ভাবছে। তাদের মুখে ও চেহারায় নিষ্ফলতা যেন মাখানো। মেয়েটি একলা। বয়স বছর সাতাশ, মাথায় একটু খাটো বললেই হয়, মুখটা একটু বেশি রকম গম্ভীর। ভাইদের সঙ্গে তার যে তফাৎ আছে তা বুঝতে দেরি হয় না। ভাবলেশহীন কাঠিন্যটুকু মুখে না থাকলে তাকে সুন্দরীই বলা যেত। ভাইরা তার নাম দিয়েছে 'বুলডগ'।

বাইরে অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিন ভাই চেয়ারে বসে কাৎ হয়ে দেখবার জন্য মুখ ফেরালে। তাদের বাড়ির উঠোন থেকে বড় রাস্তায় যাবার পথে 'হলি' গাছের অনেক গুলো ঝোপ। সেই ঝোপ

ছাড়িয়ে এক পাল চাষের ঘোড়াকে তাদের উঠোন থেকে সকালে ব্যায়ামের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা জানে এ-সব ঘোড়ার এই উঠোন থেকে এই শেষবার ব্যায়ামে বার হওয়া। জোয়ান তিন ভায়ের চোখে কেমন একটা উদাসীন দৃষ্টি। এমন করে তাদের জীবনের আশা ভরসা নষ্ট হওয়ায় তারা সবাই ভীত। বিপদের যে ভয় তাদের ঘিরে রয়েছে তাতে তাদের অন্তরের স্বাধীনতাও যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

তবু তাদের দেখলে খাসা জোয়ান ছেলে বলেই মনে হয়। সব চেয়ে বড় জো-র বয়স প্রায় তেত্রিশ। চওড়া বুক, স্বাস্থ্যের জৌলুস নিয়ে বেশ সুশ্রী চোহারাই বলা যায়। মুখখানা তার লাল, চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, কিন্তু তাতে কোনো গভীরতা নেই। মোটা আঙ্গুলে সে তার কালো গোঁফ জোড়ায় পাক দিচ্ছিল। চেহারাটা তার কতকটা নির্বোধের মতো। হাসবার সময় দাঁত বার করবার তার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে। এখন কিন্তু অসহায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সে ঘোড়াগুলোকে দেখছিল। হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্যয়ে সে স্তম্ভিত।

বিশাল চাষের ঘোড়াগুলো তাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। ল্যাজে মাথায় তারা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। যেখানে বড় রাস্তা থেকে একটা গলি বেরিয়ে গেছে, সেখানকার কালো মিহি কাদা যেন উদ্ধত উল্লাসে তাদের বড় বড় খুরওয়ালা পায়ে মাড়িয়ে ঘোড়াগুলি একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের প্রতি গতি-ভঙ্গীতে বিশাল অচেতন শক্তির পরিচয়, তারই সঙ্গে সেই জড়ত্ব, যার জন্যে তারা মানুষের অধীন।

জো অসহায় ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের শরীরের মতোই ঘোড়াগুলো যেন তার আপনার। কোনো আশাই আর তার নেই বলে মনে হয়। এইটুকু তার সৌভাগ্য যে, যে-মেয়েটি তার বাগ্‌দত্তা, তার বাবা পাশের একটি জমিদারীর একজন কর্মচারী। তার ভাবী-শ্বশুর

তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। বিয়ে করে তাকেও লাগাম পরতে হবে। তার নিজের স্বাধীন জীবন এই খানেই শেষ। এখন থেকে সে একটা পরাধীন জানোয়ার মাত্র।

অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সে মুখ ফেরালে। ঘোড়াগুলোর পায়ের শব্দ এখনো তার কানে বাজছে। হঠাৎ মনের অস্থিরতার দরুনই আর কিছু করতে না পেরে খাবারের প্লেটগুলো থেকে মাংসের কিছু টুকরো কুড়িয়ে সে টেরিয়ার কুকুরটার দিকে শিষ দিয়ে ছুঁড়ে দিলে। কুকুরটা আগুনের ধারে শুয়েছিল, উঠে পড়ে সে-গুলো গিলে ফেলে জো-র মুখের দিকে তাকালো। নির্বোধের মতো ঈষৎ হেসে জো চড়া গলায় বললে, 'এমন মাংস আর তোর বরাতে নেই, কেমন ? আছে ?'

কুকুরটা একটু ল্যাজ নেড়ে একবার পাক খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

টেবিলে আবার খানিকক্ষণ কারুর মুখে কোনো কথা নেই। পরামর্শ বৈঠক না ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত যেতে পারছে না বলেই জো অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। জো-র পরের ভাই ফ্রেড হেনরির বেশ সুঠাম চেহারা। ঘোড়াগুলোর চলে যাওয়া সেও লক্ষ্য করেছে, তবে জো-র মতো অত হতাশ ভাবে নয়। জো-র মতো তারও মধ্যে পশু-সুলভ-জড়ত্ব হয়তো আছে কিন্তু সে সেই ধরনের পশু যা কারুর বশে থাকে না, নিজে বশ করে! যে কোনো ঘোড়া ফ্রেডের কাছে এলেই জব্দ। তার ভাবভঙ্গীতেও এই সহজ প্রভুত্ব পরিস্ফুট। শুধু নিজের জীবনের উপরই তার দখল নেই। মেবল্ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, গোঁফ জোড়া একটু পাকিয়ে তুলে ফ্রেড একটু বিরক্ত হয়েই তার দিকে তাকাল।

'তুমি গিয়ে কিছুদিন লুসির সঙ্গে থাকবে বোধ হয় ? কেমন, তাই তো ?' ফ্রেড হেনরি জিগগেস করলে। মেয়েটি কোনো উত্তর না দেওয়ায় ফ্রেড আবার বললে, 'তাছাড়া আর কি করতে পার ভেবে তো পাচ্ছি না।'

জো. সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলে, 'ঝি-গিরি করতে পারে।' মেয়েটির মুখে কোনো ভাবান্তর নেই।

ভায়েদের মধ্যে ছোট, ম্যালকম বললে, 'আমি হলে নার্সিং শিখতে যেতাম।'

মেব্‌ল্‌ এ-কথাটাও শুনেছে বলে মনে হল না। ওরা সবাই মিলে তার সম্বন্ধে এত বছর ধরে এত কথা বলেছে যে আজকাল সে তাদের কথায় কানই দেয় না। মার্বেলের বড় ঘড়িটার আওয়াজে বোঝা গেল আধঘণ্টা কেটে গেছে। কুকুরটা আগুনের ধারের মাদুর থেকে উঠে যেন একটু অস্বস্তির সঙ্গে সকলের দিকে তাকাল। তবু পরামর্শের নামে মিছিমিছি তাদের জটলা আর শেষ হয় না।

হঠাৎ জো বললে, 'বেশ, আমি এখন চললাম।' চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে ঘোড়া থেকে নামবার ধরনে উঠে পড়ে সে আগুনের কাছে গেল। এখনো তার ঘর থেকে বেরুবার নাম নেই। আর সকলে কি করে, বা, বলে তা না জেনে যেন সে যেতে পারছে না। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে সে কুকুরটার দিকে চেয়ে তারই সঙ্গে চড়া নাটুকে গলায় আলাপ করতে লাগল: 'যাবি আমার সঙ্গে? কি রে? যাবি নাকি? শুনছিস, যেতে হবে অনেক দূর, যা ভাবছিস তার থেকে অনেক দূরে।' কুকুরটা একটু ল্যাজ নাড়ল, জো পাইপটা ঢাকা দিয়ে টানতে টানতে তামাকের নেশাতেই মশগুল হয়ে কুকুরটার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল। হাঁটু দুটো একটু বেঁকিয়ে তার দাঁড়াবার ভঙ্গীটা ঘোড়সওয়ারদেরই মতো। কুকুরটা কেমন একটু যেন অবিশ্বাসের সঙ্গে বিষণ্ণ মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ফ্রেড হেনরি বোনকে জিগগেস করলে, 'লুসির কাছ থেকে কোনো চিঠি পেয়েছ?'

'পেয়েছি, আর হপ্তায়।'

'কি লিখেছে সে ?'

মেব্‌ল্‌ এ কথার কোনো উত্তর দিলে না। ফ্রেড তবু নাছোড়বান্দা, আবার জিগগেস করলে, 'সে কি তোমায় তার কাছে গিয়ে থাকতে বলেছে ?'

'ইচ্ছে করলে গিয়ে থাকতে পারি।'

'তা হলে তোমার তাই থাকাই উচিত। লিখে দাও যে সোমবারে তুমি যাচ্ছ!' এবারও মেব্‌ল্‌ কোনো উত্তর দিলে না। ফ্রেড বেশ একটু অধৈর্যের স্বরে বললে, 'কেমন, তাহলে তাই করবে তো ?'

মেব্‌ল্‌ এখনো নিরুত্তর। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। ব্যর্থতা ও অসন্তোষের ছায়া সকলের মুখে। শুধু ম্যালকম নির্বোধের মতো হাসছে।

'আগামী বুধবারের মধ্যে তোমাকে একটা কিছু কিন্তু ঠিক করে ফেলতে হবে, তা না হলে রাস্তার ফুটপাতে ছাড়া জায়গা পাবে না।'—জো একটু চেঁচিয়েই বললে। মেব্‌লের মুখ আরও অন্ধকার হয়ে উঠল, তবু সে নীরব। ম্যালকম জানালা দিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'ঐতো জ্যাক ফারগুসান আসছে।'

'কোথায় ?' জো চেঁচিয়ে জিগগেস করলে, 'ভেতরে আসছে নাকি ?'

ম্যালকম ঘাড় বাঁকিয়ে গেটটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আসছে।'

সবাই চুপচাপ। মেব্‌ল্‌ যেন অপরাধী আসামীর মতো বসে আছে। হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে একটা শিস্ শোনা গেল। কুকুরটা উঠে ডাকতে লাগল। জো উঠে দরজা খুলে দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'এস।'

একটি যুবক এসে ঘরে ঢুকল। গায়ে তার ওভারকোট, গলায় পশমের বড় রুমাল জড়ান, মাথায় পশমের টুপিটা কপাল পর্যন্ত টানা, ঘরে ঢুকেও টুপিটা খোলেনি। ছেলেটি মাঝারি গোছের লম্বা, চোখ দুটি দেখলে ক্লান্ত মনে হয়।

ম্যালকম, জো, ফ্রেড, তিন জনে মিলেই তাকে সম্ভাষণ করলে।

ফ্রেড হেনরিকেই উদ্দেশ করে জ্যাক জিগগেস করলে, 'ব্যাপার কি ?'
'সেই এক ব্যাপার ! বুধবারে আমাদের চলে যেতে হবে। সর্দি লেগেছে নাকি ?'
'হ্যাঁ, বেশি রকম লেগেছে।'
'থেকে যাওনা এখানে ?'
'আমি থেকে যাব ? একেবারে শুয়ে না পড়া পর্যন্ত আর তা হচ্ছে না।' জ্যাকের গলাটা একটু ধরা, কথায় স্কচ্-টান।
জো পরম উল্লাস ভরে বলে উঠল, 'এ বড় মজার ব্যাপার, না ? ডাক্তার নিজেই সর্দিতে কাবু। রুগীদের পক্ষে খুব সুবিধের নয়, কি বল ?'
ডাক্তার তার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে বললে, 'কেন, তোমার কিছু হয়েছে নাকি ?'
'আমার জ্ঞানত তো নয়। কেন বলতো ?'
'না, রুগীদের জন্যে বড্ড দরদ দেখাচ্ছ কিনা, তাই ভাবলাম তুমি নিজেই বুঝি তাদের দলে পড়েছ।'
'কোনো দিন কোনো হতভাগা ডাক্তারের চিকিৎসায় আমায় থাকতে হয়নি, আশা করি হবেও না।'
মেব্‌ল্‌ হঠাৎ টেবিল থেকে উঠে পড়ে ডিশগুলো সব এক জায়গায় জড় করতে লাগল। এতক্ষণ যেন সবাই তার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ডাক্তার তার দিকে নীরবে চেয়ে রইল। ঘরে আসা থেকে এ-পর্যন্ত মেব্‌ল্‌কে সে কুশল সম্ভাষণও করেনি। মেব্‌ল্‌ ট্রে-তে করে ডিশগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ডাক্তার জিগগেস করলে, 'তোমরা তাহলে কখন সবাই যাচ্ছ ?'
ম্যালকম জবাব দিলে, 'আমি তো সাড়ে এগারটার ট্রেন ধরছি। জো তুমি কি গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছ ?'
'যাচ্ছি তো আগেই বলেছি।'

'তাহলে এখনি সেটার বন্দোবস্ত করার দরকার,' বলে ডাক্তারের সঙ্গে করমর্দন করে ম্যালকম বললে, 'চললাম। আর যদি পরে দেখা না হয় তাহলে এই খানেই বিদায় নিচ্ছি।' জো-কে সঙ্গে নিয়ে ম্যালকম বেরিয়ে গেল। জো-কে দেখে মনে হল ল্যাজ গুটানো কুকুরের মতো তার অবস্থা অতি কাহিল।

ঘরে ফ্রেড ও ডাক্তার ছাড়া আর কেউ নেই। ডাক্তার এবার ফ্রেডের দিকে চেয়ে বললে, 'কি বিশ্রী কাণ্ড, সত্যি। তুমিও বুধবারের আগে যাচ্ছ নাকি ?'

'সেই রকমই তো হুকুম।'

'কোথায় যাচ্ছ ? নর্দ্যাম্‌টনে ?'

'হু।'

ডাক্তার বিরস মুখে বললে, 'মুশকিল বটে!' খানিক চুপ করে থেকে ডাক্তার আবার বললে, 'তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে ?'

'প্রায়,' উত্তর দিলে ফ্রেড। আবার খানিক চুপ করে থেকে ডাক্তার বললে, 'তুমি না থাকলে বেশ খারাপ লাগবে।'

'আমারও তাই,' বললে ফ্রেড।

'তুমি চলে গেলে রীতিমত কষ্ট হবে,' ডাক্তার যেন নিজের মনেই বললে। ফ্রেড মুখ ফিরিয়ে রইল। কিছুই আর বলবার নেই। মেব্‌ল্‌ টেবিলটা ভালো করে পরিষ্কার করতে ফিরে এল। ডাক্তার তাকে জিগগেস করলে, 'আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন ? বোনের বাড়ি যাচ্ছেন না-কি ?'

মেব্‌ল্‌ ডাক্তারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। ফারগুসান এ দৃষ্টিকে বরাবর ভয় করে। কিছুতেই এ-দৃষ্টির সামনে সে সহজ হতে পারে না, কেমন অস্বস্তি বোধ করে। মেব্‌ল্‌ কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে বললে, 'না, যাচ্ছি না।'

ফ্রেড একেবারে যেন জ্বলে উঠে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'তা হলে দোহাই তোমার! কি তুমি করতে চাও বল?'

কোনো জবাব না দিয়ে মেব্‌ল্‌ নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগল। শাদা টেবিল ক্লথটা মুড়ে রেখে সে আর একটা ঢাকনা টেবিলের উপর বিছিয়ে দিলে। ফ্রেড রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে নিজের মনে বিড় বিড় করে বললে, 'এমন বদমেজাজী জানোয়ার আর দেখিনি।' মেব্‌লের তবু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। নীরবে নিজের কাজ সেরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফ্রেড দাঁতে ঠোঁট চেপে, রাগে বিরক্তিতে সেদিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'সারা দিন গাধার মতো ওর পেছনে চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে দিলেও ওর কাছ থেকে একটি কথা যদি বার করতে পার!'

ফারগুসান একটু হেসে বললে, 'তাহলে ও কি করবে ঠিক করেছে?'

'কি করে বলব বল?' ফ্রেড উত্তর দিলে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললে না। ডাক্তার তারপর উঠে পড়ে বললে, 'তোমার সঙ্গে আজ রাতে দেখা হবে তো?'

'কিন্তু কোথায়? জেস্‌ডেল-এ আজ যাচ্ছি না-কি?'

'বলতে পারি না। যা সর্দি লেগেছে। যাই হোক আমি 'মুন এণ্ড স্টারস'এ যাচ্ছি।'

'লিজি ও মে একটা রাত অন্তত ফাঁকি পড়ুক, কেমন?'

'তাই—অবশ্য যদি শরীর আমার এই রকমই থাকে।'

'একই কথা—' ফ্রেড ও ডাক্তার দুজনে এক সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাড়িটা বেশ বড়, কিন্তু এখন চাকর-বাকর কেউ নেই, তাই কেমন যেন ফাঁকা লাগে। বাড়ির পেছনে ইঁট দিয়ে বাঁধানো একটা উঠোন এবং তার পরে একটা বড় চত্বর, মিহি লাল কাঁকর দেওয়া। তার দুধারে আস্তাবল।

অন্য দুদিকে যতদূর দেখা যায় শীতে হতশ্রী ভিজে ক্ষেতের পর ক্ষেত। আস্তাবলগুলো এখন খালি। এ বাড়ির কর্তা জোসেফ পার্ভিন লেখা পড়া বিশেষ শেখেননি। কিন্তু নিজের চেষ্টায় বেশ বড় ঘোড়ার ব্যবসাদার হয়ে উঠেছিলেন। আস্তাবলগুলো তখন ঘোড়ায় ভর্তি থাকত। ব্যাপারী, চাকর, বাকর, সহিস, ঘোড়া সব কিছু মিলে বাড়ি তখন জম-জমাট। কিন্তু ইদানিং অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে গেছে। জোসেফ পার্ভিন দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছিলেন, তাঁর নষ্ট ভাগ্য পুনরুদ্ধার করতে, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। তিনিও মারা গেছেন এবং তাঁরই সঙ্গে সব কিছুই গেছে রসাতলে। ঋণ আর পাওনাদারদের হুমকি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মাসের পর মাস চাকর-বাকর ছাড়া অভাবের মধ্যে মেব্‌ল্‌ একলাই কোনো রকমে অকর্মণ্য ভায়েদের জন্যে সংসার চালিয়েছে। দশ বছর ধরে সে এ সংসার চালাচ্ছে। কিন্তু আগে, গোড়ার দিকে কোনো অনটন তাকে সইতে হয়নি। তখন এ বাড়ির চালচলন ইত্যাদি ইতর ও অমার্জিত লাগলেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জোরেই সে কখনো আত্ম-বিশ্বাস হারায়নি, বরং একটু দাম্ভিকই ছিল। বাড়ির লোকজনের কথাবার্তা হয়তো ছিল নোংরা, চাকরানীদের চরিত্র হয়তো ভালো ছিল না, তার ভায়েদের জারজ সন্তান-সন্ততিও হয়তো ছিল, তবু যতদিন অর্থের প্রাচুর্য ছিল ততদিন মেব্‌ল্‌ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিতই বোধ করেছে। তার দর্প, তার গাম্ভীর্য ছিল অটুট।

এ বাড়িতে ব্যাপারী আর ইতর গোছের লোক ছাড়া কেউ আসত না। তার বড় বোন চলে যাবার পর মেব্‌ল্‌ কোনো মেয়ে-সঙ্গী আর পায়নি। কিন্তু তাতে তার কিছু আসত যেত না। সে নিয়মিত গির্জায় যেত, বাপকে দেখা শোনা করত। তার চোদ্দ বছর বয়সের সময় তার মা মারা যায়। মাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসত। সেই মার স্মৃতি নিয়েই তার দিন

কেটে গেছে। বাপকেও সে অন্যভাবে ভালোবাসত। বাবার ওপর সে নির্ভর করেছে, জোর পেয়েছে তিনি থাকায়। তারপর হঠাৎ চুয়ান্ন বছর বয়সে তিনি আবার বিয়ে করেছেন এবং মেব্‌ল্‌ তাঁর ওপর একেবারে বিমুখ হয়ে উঠেছে। এখন তিনি শুধু তাদের ওপর দুর্বহ ঋণের বোঝা চাপিয়ে মারা গেছেন।

দারিদ্র্যের দিনে মেব্‌ল্‌ খুব কষ্ট পেয়েছে। তবু এ পরিবারের প্রত্যেকের এমন একটা সহজাত অদ্ভুত দম্ভ আছে যা টলবার নয়। মেব্‌ল্‌ জানে যে সব শেষ হয়ে গেছে। তবু সে নুয়ে পড়বে না। সে তার নিজের পথই অনুসরণ করে চলবে। সে কিছু ভাবতে চায় না, কঠিন এক জেদ নিয়ে অচেতন ভাবে সে শুধু দিনের পর দিন সহ্য করে যাবে। কারুর কথার কোনো জবাব দেবার প্রয়োজন কি? সব শেষ হয়ে গেছে, কোনো পথ আর নেই, এইটুকু জানাই তো যথেষ্ট। এই ছোট শহরের বড় রাস্তা দিয়ে আর তাকে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতে হবে না। দোকানে গিয়ে সব চেয়ে সস্তা খাবার কেনার লজ্জা আর তাকে পেতে হবে না। এসব শেষ হয়ে গেছে। কারুর কথা সে ভাবছে না, নিজের কথাও নয়। তার কাছে তার পরলোকগত মা, দেবীর মতো। সেই মা-র কাছেই সে চলেছে। তার জীবনের এই আসন্ন পরিপূর্ণতার কথা ভাবলেই তার মনে একটা গভীর আনন্দের শিহরণ সে অনুভব করে।

বিকালে একটা ছোট ব্যাগে কাঁচি, স্পঞ্জ, পরিষ্কার করবার একটা ছোট বুরুশ নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। শীতের ম্লান দিন। কাছাকাছি কটা কারখানার ধোঁয়ায় বাতাস আচ্ছন্ন। চারধারে কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়া। কারুর দিকে না চেয়ে দ্রুতপদে সে শহরের ভেতর দিয়ে গীর্জার সমাধি-স্থানে গেল।

এখানে এলে সে নিজেকে সব সময়ই নিরাপদ মনে করে। যেন এখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। যদিও গীর্জার দেয়ালের ধার দিয়ে যে

কেউই যাকনা কেন তাকে অনায়াসে দেখে যেতে পারে। তবু এই বিশাল গীর্জার ছায়ায় কবরগুলির মাঝখানে এলে তার মনে হয় সে যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর এক জগতে চলে গেছে।
কবরের ঘাসগুলি সযত্নে ছেঁটে দিয়ে সে ছোট, ফিকে গোলাপী চন্দ্র-মল্লিকাগুলি টিনের ক্রুশটিতে সাজিয়ে দিলে। তারপর পাশের একটি কবর থেকে একটি খালি পাত্র নিয়ে তাতে জল ভরে সমাধির মর্মর পাথর সযত্নে ধুয়ে দিলে। একাজে সে সত্যিই তৃপ্তি পায়। যেন এই কাজ করার সঙ্গে তার মায়ের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ সে অনুভব করে। যে জগতে সে জীবন যাপন করে, মায়ের কাছ-থেকে-পাওয়া মৃত্যুর জগত মেব্‌লের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য।
গীর্জার কাছেই ডাক্তারের বাড়ি। ফারগুসান আসলে একজন ভাড়াটে সহকারী ডাক্তার মাত্র। এ অঞ্চলে সকলের গোলামী করতে করতে তার আর নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ মেলে না। ডাক্তারখানায় বাইরে থেকে যে সব রুগী এসেছে তাদের দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে যেতে সে কবরের পাশে মেব্‌ল্‌কে দেখতে পেল। এমন একটি সুদূর তন্ময়তা তার মধ্যে আছে যে, তার দিকে চাইলে যেন আর এক জগতের আভাস পাওয়া যায়। ফারগুসানের মনে কোন এক রহস্যময় তন্ত্রী যেন হঠাৎ বেজে উঠল। তার গতি আপনা থেকে মন্থর হয়ে এল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে যেন আর চোখ ফেরাতে পারছে না।
ফারগুসানের দৃষ্টি যেন অনুভব করেই মেব্‌ল্‌ চোখ তুলে তাকাল। এই দৃষ্টি বিনিময়ে দুজনেরই মনে হল তারা কেমন করে পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেছে। টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে ফারগুসান রাস্তা দিয়ে চলে গেল। তার মনে কিন্তু কবরের ধারে মেব্‌লের সেই দীর্ঘায়ত চোখের ধীর শান্ত দৃষ্টি যেন মুদ্রিত হয়ে গেছে। কি আছে তার মুখে কে জানে, কিন্তু সে মুখ যেন ফারগুসানকে সম্মোহিত করে দিয়েছে। এমন

একটা প্রচণ্ড শক্তি মেব্‌লের দৃষ্টিতে আছে যা তার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দেয়, যেন কোনো উগ্র ওষুধ সে পান করেছে। এর আগে নিজেকে তার দুর্বল মনে হয়েছে—মনে হয়েছে বুঝি তার সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আবার যেন জীবনের উত্তাপ তার মধ্যে ফিরে এসেছে, প্রতিদিনের তুচ্ছ বিড়ম্বিত জীবন থেকে সে মুক্ত।

ডাক্তারখানার রুগী দেখার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে সে আবার দূরের কয়েকটি রুগীর বাড়ি যাবার জন্যে যখন বেরিয়ে পড়ে তখন বিকেল হয়ে আসছে। রাস্তাটা যেখানে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে, সেখানে পৌঁছে সে একবার ফিরে তাকাল। দূরে ছোট শহরটা পড়ন্ত রোদে ঠিক যেন ছাইচাপা আগুনের মতো জ্বলছে। শহরের শেষ প্রান্তে একটা ঢালু জমির ওপর পার্ভিনদের বাড়ি 'ওল্ডমেডো' দেখা যাচ্ছে। ও বাড়িতে আর বেশি বার তাকে যেতে হবে না। এই নোংরা অচেনা শহরে ঐ একটি বাড়ির সঙ্গই তার ভালো লাগত—তাও সে হারাতে বসেছে। এরপর জীবনে বাকি থাকবে শুধু কাজ আর কাজ, শুধু খনি আর লোহার কারখানার লোকদের বাড়ি বাড়ি অবিরাম ঘোরা ফেরা। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে ক্লান্তিকর হলেও এ কাজ যে তার খুব খারাপ লাগে তা নয়। বরং এ কাজে কেমন একটা তৃপ্তি, কেমন একটা উত্তেজনাই সে পায়।

পার্ভিনদের বাড়ির নিচে ঢালু মাঠগুলোর তলায় একটা গভীর চৌকোন জলাশয়। হঠাৎ ডাক্তারের চোখে পড়লো কালো পোশাক-পরা কে একজন মাঠের ভেতর দিয়ে সেই পুকুরের দিকে নেমে আসছে। ভালো করে একটু লক্ষ্য করতেই সে বুঝতে পারলে যে আগন্তুক মেব্‌ল্ ছাড়া আর কেউ নয়।

একটু অবাক হয়েই ডাক্তার সে দিকে চেয়ে রইল। মেব্‌লের হঠাৎ পুকুরের দিকে যাবার কি দরকার পড়েছে? নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় নয়,

যেন আর কোনো শক্তির তাড়নায় মেব্‌ল্‌ এক লক্ষ্য নিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে পুকুরের দিকে নেমে যাচ্ছে। মেব্‌লের প্রতিটি পদক্ষেপ ফারগুসান একাগ্রভাবে লক্ষ্য করে দেখছিল। পুকুরের ধারে মেব্‌ল্‌ এক মুহূর্তের জন্যে বুঝি দাঁড়াল, তারপর মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে নেমে গেল জলের মধ্যে। স্থির জল মেব্‌লের বুকের কাছ পর্যন্ত যখন উঠে এসেছে তখনও ফারগুসান নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। সায়াহ্নের আবছা অন্ধকারে মেব্‌ল্‌কে তারপর আর দেখতে না পেয়ে ডাক্তার নিজের মনে বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য, এ যে বিশ্বাস করা যায় না।' এক মুহূর্ত দেরি না করে ভিজে সপ্‌সপে মাঠের ওপর দিয়ে, ক্ষেতের আলের ঝোপগুলো ঠেলে সে পুকুরটার দিকে দৌড়োতে শুরু করলে। কয়েক মিনিট বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন সে পুকুরের ধারে গিয়ে পৌছল, তখন মেব্‌লের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। ফারগুসানের দৃষ্টি মৃত্যুর মতো হিমশীতল জল ভেদ করে যেন মেব্‌ল্‌কে সন্ধান করে ফিরতে লাগল। জলের তলায় একটা কালো ছায়া যেন দেখা যাচ্ছে—মেব্‌লের কালো পোশাকটাই বোধ হয়।

ডাক্তার সাহস করে ধীরে ধীরে পুকুরে নামল। তলায় গভীর নরম কাদায় পা বসে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা জল যেন মৃত্যুর মতোই জড়িয়ে ধরছে প্রতি পদে। সে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জল ঘুলিয়ে উঠে পচা কাদার দুর্গন্ধে বাতাস ভরে গেল। ঘৃণায় শরীর সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, তবু সে আরও গভীর জলে নামতে লাগল। তলার কাদা এত নরম ও পিছল যে তার ভয় হচ্ছিল হঠাৎ পা পিছলে তলিয়ে যাবে। সাঁতার সে জানে না, তাই ভয়ও তার না করছিল এমন নয়।

আরও একটু নেমে গিয়ে ঠাণ্ডা জলের ভেতর হাতড়ে হাতড়ে সে চারধারে মেব্‌লের খোঁজ করতে লাগল। একবার মনে হল যেন তার পোশাকটা হাতে ঠেকেছে, কিন্তু ভালো করে ধরতে না ধরতেই

আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে তা গলে গেল। মরিয়া হয়ে সেটা আর একবার ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে আর টাল সামলাতে পারলে না, সেই নোংরা দুর্গন্ধ জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। নাকে মুখে জল ঢুকে দম বন্ধ হয়ে কয়েক মিনিট তার প্রায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। প্রাণপণে যুঝে আবার অতি কষ্টে যখন সে শক্ত মাটি আশ্রয় করে দাঁড়াতে পারল, তখন তার মনে হল কত যুগ যেন ইতিমধ্যে কেটে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে আবার জলের দিকে তাকালে। মেব্‌ল্‌ তার কাছেই ভেসে উঠেছে। এবারে সবলে তার পোশাক আঁকড়ে ধরে ডাক্তার ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এল। তারপর তাকে সযত্নে ধরে তুলে কোনো রকমে টলতে টলতে জলের সীমানা ছাড়িয়ে শুকনো ডাঙ্গায় গিয়ে পৌছল।

মেব্‌ল্‌কে যখন সে মাটিতে শুইয়ে দিলে তখন তার কোনো জ্ঞান নেই, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পরই ডাক্তার টের পেল মেব্‌লের ধীরে ধীরে শ্বাস বইতে শুরু করেছে। আরও খানিকক্ষণ চেষ্টা করার পর মেব্‌লের শরীরে একটু উত্তাপ ফিরে এসেছে অনুভব করে, নিজের ওভারকোটটা তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ডাক্তার তাকে তুলে নিয়ে বাড়িটার দিকে অগ্রসর হল।

পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। ডাক্তারের মনে হয় এ ভারি বোঝা নিয়ে বাড়িতে পৌছনো তার আর হবে না। বহুক্ষণ বাদে বাইরের দরজা খুলে যখন সে রান্নাঘরে গিয়ে আগুনের কাছে মাদুরের ওপর মেব্‌ল্‌কে আবার নামিয়ে রাখলে তখন মেব্‌লের বেশ স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। কিন্তু চোখ একেবারে খোলা হলেও জ্ঞান তার তখনো হয়নি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বিছানা থেকে কটা কম্বল এনে ডাক্তার সেগুলো আগুনের কাছে গরম করবার জন্যে রেখে দিলে। তারপর

মেব্‌লের পুকুরের নোংরা জলে ভেজা দুর্গন্ধ পোশাক সব ছাড়িয়ে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার সারা দেহ ভালো করে মুছে দিলে। এবার তাকে নগ্ন অবস্থাতেই কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রেখে সে খাবার ঘরে মদ্য জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধানে গেল। একটা বোতলে কিছু হুইস্কি পড়ে আছে। নিজে এক চুমুক খেয়ে নিয়ে সে মেব্‌লের মুখেও খানিকটা এনে ঢেলে দিলে।

পর মুহূর্তেই তার ফল টের পাওয়া গেল। মেব্‌ল্ সোজা ডাক্তারের দিকে সচেতন ভাবে তাকিয়ে জিগগেস করলে, 'ডাক্তার ফারগুসান ?'

কোটটা খুলতে খুলতে ডাক্তার ফিরে জিগগেস করলে, 'কি ?' ভিজে কাপড়ের দুর্গন্ধে সে তখন সত্যই অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজের স্বাস্থ্যের জন্যেও তার এখন ওপরে গিয়ে কোনো রকম পোশাক বদলান দরকার।

'কি আমি করেছিলাম ?' জিগগেস করলে মেব্‌ল্।

'পুকুরে নেমে গিয়েছিলে,' উত্তর দিলে ডাক্তার। সমস্ত শরীরে থেকে থেকে তার এমন কাঁপুনি শুরু হয়েছে যে সে মেব্‌লের দিকে মন দিতেই পারছে না। কিন্তু মেব্‌ল্ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। ডাক্তারের মনে হল মেব্‌লের দিক থেকে তারও যেন চোখ ফেরাবার ক্ষমতা নেই। নিজের মন তার ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। একটু একটু করে তার কাঁপুনি আবার থেমে এল। আবার যেন নিজের ভেতরে সে অন্ধ, অচেতন অথচ প্রবল জীবনের স্রোত অনুভব করতে পারছে।

তেমনি স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থেকে মেব্‌ল্ জিগগেস করলে, 'আমার কি মাথার ঠিক ছিল না ?'

'সেই মুহূর্তে ছিল না বোধ হয়,' ডাক্তার জবাব দিলে। এবার সে শান্ত, সেই অদ্ভুত উদ্বেগ কেটে গিয়ে তার শক্তি সে ফিরে পেয়েছে।

মেব্‌ল্ আবার জিগগেস করলে, 'এখন কি আমার মাথা ঠিক হয়েছে ?'

একটু ভেবে ডাক্তার বললে, 'হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।' ডাক্তার মুখটা

ফিরিয়ে নিলে। সত্যই তার যেন আবার কেমন ভয় করছে, কারণ অস্পষ্ট ভাবে সে বুঝতে পারছে, মেব্‌লের শক্তি তার চেয়েও প্রবল। খানিক বাদে সে জিগগেস করলে, 'এ সব ছেড়ে পরবার মতো শুকনো কিছু পোশাক কোথায় পাব বলতে পার?'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মেব্‌ল্ জিগগেস করলে, 'তুমি কি আমার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছিলে?'

'না, হেঁটেই গিয়েছিলাম। তবে একবার তলিয়েও যেতে হয়েছে।'

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। ডাক্তার ওপরে গিয়ে ভিজে পোশাক ছেড়ে আর কিছু পরবার জন্য ব্যাকুল। তবু সে ইতস্তত করছে। আরও কি যেন একটা ইচ্ছা তার মধ্যে আছে। মেব্‌ল্‌ই যেন তাকে ধরে রেখেছে। নিজের ইচ্ছা-শক্তি বলে কিছু তার যেন আর নেই, সব শিথিল হয়ে গেছে। তবু ভেতরে কোথায় যেন একটা উত্তাপ সে অনুভব করছে। ভিজে জামা কাপড় গায়ে থাকা সত্ত্বেও আর কাঁপুনি তার নেই।

'কেন তুমি এ কাজ করলে?' মেব্‌ল্ জিগগেস করলে।

'তোমায় এমন বোকামি করতে দিতে চাই না বলে।'

'বোকামি তো নয়,' মেব্‌ল্ মেঝেতে শায়িত অবস্থায় তেমনি স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'যা আমি করতে গিয়েছিলাম তাই ঠিক। আমি তখনই বুঝেছিলাম।'

'আমি গিয়ে জামা কাপড়গুলো ছেড়ে আসি।'

মুখে বলা সত্ত্বেও ডাক্তারের যেন মেব্‌লের কাছ থেকে সরে যাবার ক্ষমতা নেই। তার দেহের শক্তি যেন মেব্‌লের হাতের মুঠোয়, কোনো মতেই সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কিম্বা হয়তো মুক্ত হবার বাসনাই তার নেই।

হঠাৎ মেব্‌ল্ উঠে বসল এবং উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অবস্থাটা বুঝতে তার দেরি হল না। গায়ে জড়ান কম্বলগুলো সে অনুভব করলে,

সেই সঙ্গে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও। মুহূর্তের জন্যে একেবারে দিশে-হারা হয়ে উন্মাদের মতো অস্থির দৃষ্টিতে সে যেন কি খুঁজছে মনে হল। চারধারে তার ভিজে পোশাকগুলো ছড়ান সে দেখতে পাচ্ছে। ফারগুসান ভয়ে একেবারে নিস্পন্দ।

স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে ফারগুসানের দিকে তাকিয়ে মেব্‌ল্‌ জিগগেস করলে, 'কে আমার কাপড় ছাড়িয়েছে?'

'আমি, তোমায় সুস্থ করবার জন্যে।'

খানিকক্ষণ নীরবে অদ্ভুত দৃষ্টিতে মেব্‌ল্‌ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিগগেস করলে, 'তুমি তাহলে আমাকে ভালোবাস?'

ডাক্তার মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইল। নতজানু অবস্থাতেই একটু একটু করে সরে গিয়ে মেব্‌ল্‌ ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধরলে। ডাক্তারের হাঁটুতে উরুতে তার বুক যেন সে নিষ্পেষিত করে দিতে চায়, মুখে তার প্রথম অধিকারের বিজয় উল্লাস, প্রেমের প্রেরণায় রূপান্তরিত চোখে, দীনতা ও দৃপ্ত উজ্জ্বলতার এক অদ্ভুত সমাবেশ।

'তুমি আমায় ভালোবাস।' অপরূপ আনন্দে সে যেন গুঞ্জন করে উঠল—'আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাস।' কণ্ঠে তার আকুলতার সঙ্গে স্থির বিশ্বাসের দৃঢ়তা।

আকুল ভাবে একেবারে যেন আত্মহারা হয়ে সে এখন ডাক্তারের হাঁটুতে পায়ে, ভিজে পোশাকের ওপর চুমু খাচ্ছে।

ডাক্তার নিচু হয়ে তার এলোমেলো ভিজে চুলের দিকে, তার নগ্ন নিটোল কাঁধের দিকে তাকাল। সে বিস্মিত, বিমূঢ় এবং সেই সঙ্গে কেমন যেন ভীত। সে তো মেব্‌ল্‌কে কখনো ভালোবাসবার কথা ভাবেনি, ভালোবাসতে কখনো চায়নি। মেব্‌ল্‌কে যখন সে জল থেকে উদ্ধার করেছে তখন সে ডাক্তার, আর মেব্‌ল্‌ রুগী এই সম্বন্ধটুকুই তার মনে ছিল। আলাদা, ব্যক্তিগত ভাবে মেব্‌লের কথা সে একবারও ভাবেনি। এখন পরস্পরের

যে সম্বন্ধের কথা সে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে সেটা তার কাছে সত্যই অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এতে ডাক্তার হিসেবে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। মেব্‌ল্‌ তার পা জড়িয়ে আছে, এ ব্যাপারটা সত্যই নিতান্ত কুৎসিত। তার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তবু—তবু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাও তার নেই।

আবার মেব্‌ল্‌ তার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে প্রচণ্ড প্রেমের আকুলতার সঙ্গে কেমন একটা অপার্থিব ভয়াবহ জয়ের দীপ্তি। এর কাছেই সে একেবারে অসহায়। তবু কোনোদিন সে মেব্‌ল্‌কে ভালোবাসতে চায়নি—কোনোদিনই নয়। সেই কঠিন অনমনীয়তা এখনো তার মন থেকে একেবারে যায়নি।

মেব্‌ল্‌ তেমনি গভীর বিশ্বাসের সুরে গুঞ্জন করে চলেছে, 'তুমি আমায় ভালোবাস, তুমি আমায় ভালোবাস।'

মেব্‌ল্‌ দুই হাতে ক্রমশই তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। ফারগুসানের মনে কি যেন একটা ভয়, ভয়ের চেয়েও বেশি কি যেন একটা আতঙ্ক। সত্যই মেব্‌ল্‌কে ভালোবাসার কোনো ইচ্ছা তার নেই, তবু মেব্‌ল্‌ তাকে টানছে। টাল সামলাবার জন্য সে হাত বাড়িয়ে মেব্‌লের নগ্ন কাঁধটা একবার ধরে ফেললে। তার মনে হল মেবলের কোমল কাঁধের মাংসের ভেতর থেকে একটা শিখা উঠে তার হাতটা যেন পুড়িয়ে দিলে। না, মেব্‌ল্‌কে ভালোবাসার কোনো ইচ্ছা তার নেই। তার সমস্ত মন এই আত্মসমর্পণের বিরোধী। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে বিভীষিকা। তবু অপরূপ মেব্‌লের সেই নিটোল নগ্ন কাঁধের স্পর্শ, মধুর তার মুখের দীপ্তি। মেবল কি ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়? তার কাছে আত্মসমর্পণের কথা ভাবাটাই যেন বিভীষিকা। তবু ডাক্তারের বুকের ভেতরটা কি একটা ব্যথায় যেন টন্‌টন্‌ করে উঠছে।

মেব্‌লের দিক থেকে সে দরজার দিকে চেয়েছিল বটে, কিন্তু তার হাতটা

তখনো মেব্‌লের কাঁধে। হঠাৎ মেব্‌ল্‌ কেমন যেন নিস্পন্দ হয়ে গেল। ডাক্তার তার দিকে ফিরে তাকাল। দ্বিধায়, ভয়ে মেব্‌লের চোখ দুটি এখন বিস্ফারিত, মুখের আলো তার নিভে আসছে। নিদারুণ একটা পাণ্ডুর ছায়ায় তার মুখ ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে। মেব্‌লের চোখের দৃষ্টিতে যে-প্রশ্ন তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে, তা যেন ডাক্তার আর সহ্য করতে পারছে না। সে প্রশ্নের পেছনকার মৃত্যুময় দৃষ্টিও তার কাছে অসহ্য।

সমস্ত অন্তরটা তার গুমরে উঠল কিন্তু এবার সে নিজেকে ছেড়ে দিলে, হৃদয়কে মুক্ত করে দিলে মেব্‌লের দিকে। হঠাৎ তার মুখে স্নিগ্ধ একটি হাসি দেখা দিল, আর তারই মুখের ওপর নিবদ্ধ মেব্‌লের চোখ ধীরে ধীরে জলে ভরে গেল। ডাক্তার সেই আর্দ্র চোখ দুটির দিকে চেয়ে রইল অনিমেষে—কোনো শান্ত ঝরনা থেকে যেন ধীরে ধীরে রহস্যময় জলের স্রোত উঠে আসছে। ডাক্তারের হৃদয় জ্বলে উঠে বুকের ভেতরেই যেন গলে গেল।

মেব্‌লের দিকে আর সে চাইতে পারছে না। হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে মেব্‌লের মাথাটি দুই হাতে ধরে সে তার মুখখানি নিজের গলার কাছে চেপে ধরলে। মেব্‌ল্‌ একেবারে স্থির হয়ে আছে। ডাক্তারের হৃদয়ও যেন চূর্ণ, শুধু কি এক তীব্র বেদনায় সে হৃদয় এখনো কাতরাচ্ছে। সে টের পেল মেব্‌লের উষ্ণ চোখের জলের ধারায় তার গলা ভিজে যাচ্ছে। তার কিন্তু নড়বার ক্ষমতা নেই। পুরুষের জীবনে অসীমতার ইঙ্গিত নিয়ে যে এক-একটি মুহূর্ত আসে, তারই মাঝখানে সে যেন দুলছে।

শুধু এখন মেব্‌লের মুখটি তার বুকের অত্যন্ত কাছে না চেপে ধরলেই তার নয়। আর তাকে কোনো দিন ছেড়ে দিতে সে পারবে না। এমনি করে চিরদিন সে যেন থাকতে চায়—হৃদয়ের এই দুঃসহ ব্যথা নিয়েই থাকতে চায়, যে-ব্যথায় জীবনের স্বাদও সে পেয়েছে।

নিজের অগোচরেই সে মেব্‌লের ভিজে-নরম, এলোমেলো চুলগুলোর দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ সেই পুকুরের বদ্ধ-নোংরা জলের দুর্গন্ধ তার নাকে এলো। সেই মুহূর্তেই মেব্‌ল্‌ তার আলিঙ্গন থেকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে তার দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির অতলতা ও আন্তরিকতাতেই ডাক্তার যেন ভয় পায়। কি করছে না জেনেই সে মেব্‌লকে চুমু খেতে লাগল। মেব্‌লের চোখে সেই অতল আন্তরিক ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সে যেন মুছে ফেলতে চায়। আবার যখন মেব্‌ল্‌ তার দিকে মুখ ফেরাল তখন আনন্দের সে উজ্জ্বল আভা আবার তার চোখে দেখা দিয়েছে। এ দৃষ্টিকেও ডাক্তার ভয় করে, তবু সংশয়ের সে দৃষ্টি এর চেয়েও ভয়াবহ বলে এ দৃষ্টি ফিরে আসাতে সে খুশি।

দ্বিধাজড়িত স্বরে মেব্‌ল্‌ জিগগেস করলে, 'তুমি আমায় ভালোবাস?'

'হ্যাঁ,' কথাটা বলতে ডাক্তারের বুঝি বুকটা ছিঁড়ে গেল। কথাটা মিথ্যা বলে নয়; কথাটা সবেমাত্র তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে বলে। এ কথা বলতে তার সদ্যচ্ছিন্ন হৃদয়ের ক্ষত যেন আরও গভীর হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এখনো সে এ-কথা সত্য হতে দিতে বুঝি চায় না।

মেব্‌ল্‌ তার দিকে মুখটা তুলে ধরলে আর ডাক্তার নিচু হয়ে সাদরে তার মুখে একবার চুমু খেলে—সেই চুমু যা শাশ্বত প্রতিশ্রুতির প্রতীক। তাকে চুমু খাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাক্তারের হৃদয়ে ব্যথার টান পড়ল। মেব্‌লকে সে কখনো ভালোবাসতে চায়নি। কিন্তু সে সব প্রশ্ন এখন আর ওঠে না। সমস্ত দ্বিধা সংশয় অতিক্রম করে সে এখন মেব্‌লের কাছে ধরা দিয়েছে; পিছনে যা ফেলে এসেছে সেই শীর্ণ সঙ্কুচিত সত্তার আর কোনো দাম নেই।

চুমু খাবার পর মেব্‌লের চোখ আবার ধীরে ধীরে জলে ভরে এলো। কোলের ওপর হাত দুটি জড়ো করে একদিকে মাথা নুইয়ে সে তখন ডাক্তারের কাছ থেকে একটু দূরে স্থির হয়ে বসে আছে। ধীরে ধীরে

তার চোখ দিয়ে জলের ফোঁটাগুলি গড়িয়ে পড়ছে। দুজনেই কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব। নিজের দীর্ণ হৃদয়ের বেদনায় ডাক্তার যেন একেবারে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে মেব্‌লুকে ভালোবাসবে? এরই নাম কি ভালোবাসা? এমনি ভাবেই কি তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে? আর সে কিনা ডাক্তার! জানতে পারলে সবাই কি টিট্‌কারিই না দেবে! সবাই হয়তো জানবে, এই চিন্তাই তার কাছে যন্ত্রণার মতো।

এই যন্ত্রণা অনুভব করেই সে আবার মেব্‌লের দিকে তাকাল। মেব্‌লু উদাসভাবে বসে আছে। এক ফোঁটা তার চোখের জল গড়িয়ে পড়তেই ডাক্তারের হৃদয় যেন বহ্নিদীপ্ত হয়ে উঠল। এইবার প্রথম সে দেখতে পেল মেব্‌লের একটা কাঁধ একেবারে খোলা, একটি হাত অনাবৃত। ঘরের ভেতর প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, অস্পষ্ট ভাবে মেব্‌লের বুকের একটা দিকও সে দেখতে পাচ্ছে।

'তুমি কাঁদছ কেন?' ডাক্তার জিগগেস করলে। তার গলার স্বর বদলে গেছে। মেব্‌লু মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকাল এবং চোখের জলের ভেতরেই হঠাৎ নিজের অবস্থাটা টের পেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

কতকটা যেন ভয়ে ভয়েই ডাক্তারের দিকে চেয়ে সে বললে, 'আমি তো ঠিক কাঁদছি না।'

ডাক্তার হাত বাড়িয়ে কোমলভাবে তার নগ্ন বাহু ধরে ফেলে মৃদুকম্পিত স্বরে বললে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি, তোমায় ভালোবাসি!'

একটু সঙ্কুচিত হয়েই মেব্‌লু মাথা নিচু করলে। তার বাহুতে ডাক্তারের হাতের কোমল মুষ্টির চাপ অনুভব করে সে যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে। ডাক্তারের দিকে চেয়ে সে বললে, 'আমি যাই, গিয়ে তোমার জন্যে কিছু শুকনো পোশাক নিয়ে আসি।'

'কেন? আমি তো বেশ আছি।'

'না, আমি যাই। তোমার পোশাক বদলে ফেলা দরকার।'

ডাক্তার তার হাত ছেড়ে দিলে। মেব্‌ল্‌ কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। তবু তার ওঠবার নাম নেই। সাগ্রহে সে বললে, 'আমায় একটা চুমু খাও।'

ডাক্তার তাকে চুম্বন করলে, কিন্তু খুব সংক্ষেপে—খানিকটা যেন বিরাগ ভরেই।

কম্বলগুলো নিয়ে জড়ামড়ি করে মেব্‌ল্‌ একটু ভয়ে ভয়ে এবার উঠে পড়ল। জড়ানো কম্বলগুলো ভালো করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় সে তখন বেশ বিব্রত। ডাক্তার কিন্তু নির্মমভাবে তার দিকে চেয়ে আছে সে জানে। কম্বলগুলো যথা সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার সময় তার শাদা খানিকটা অনাবৃত পা ডাক্তার দেখতে পেল। [illegible] তার গায়ে প্রথম কম্বল জড়িয়ে দেয় তখনকার কথা সে একবার মনে করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই এই মনে করতে চাওয়া সম্বন্ধেই তার মন বিরূপ হয়ে উঠল। যখন তার কাছে মেব্‌লের কোনো মূল্যই ছিল না তখনকার কথা মনে করতে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

অন্ধকার বাড়িটার ভেতরে কোথা থেকে একটা অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ শুনে ডাক্তার একবার চমকে উঠল। তারপর মেব্‌লের গলা সে শুনতে পেলে—'এখানে পোশাক আছে।' মেঝে থেকে উঠে সিঁড়ির নিচে গিয়ে ডাক্তার মেব্‌লের ওপর থেকে ফেলা পোশাকগুলো আগুনের কাছে নিয়ে এলো। তারপর গা হাত পা মুছে পোশাকগুলো বদলে ফেলবার পর নিজের চেহারা দেখে নিজেরই তার হাসি পেল।

আগুনটা নিভে আসছিল তাই কিছু কয়লা তার ওপর সে চাপিয়ে দিলে। বাড়িটা এখন প্রায় অন্ধকার, শুধু দূরের রাস্তার একটা আলো ক্ষীণভাবে এসে পড়েছে। একটা দেশলাই যোগাড় করে সে ঘরের গ্যাসের আলোটা জ্বেলে দিলে। তারপর নিজের পোশাকের পকেট-

গুলো খালি করে তার সঙ্গে মেব্‌লের ভিজে পোশাকগুলো কুড়িয়ে জড়ো করে সবগুলো নিয়ে স্নানের ঘরে রেখে এল।

দেয়াল-ঘড়িতে তখন ছ'টা। তার নিজের ঘড়ি আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এইবার তার ডাক্তারখানায় যাওয়া দরকার। খানিকক্ষণ সে অপেক্ষা করলে, কিন্তু মেব্‌লের নামবার কোনো লক্ষণ নেই। সিঁড়ির কাছে গিয়ে তাই সে ডেকে বললে, 'আমায় এবার যেতে হচ্ছে।'

তৎক্ষণাৎ মেব্‌ল্‌ নেমে আসছে সে শুনতে পেল। কালো ভয়েলের তার সব চেয়ে সুন্দর পোশাকটা মেব্‌ল্‌ পরে এসেছে, তার চুল ঠিকমতো পাট কর' কিন্তু এখনো ভিজে। ডাক্তারের দিকে চেয়ে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে হেসে ফেলে বললে, 'এ পোশাকে তোমায় ভালো লাগছে না।'

'খুব সংএর মতো দেখাচ্ছে নাকি ?' ডাক্তার জিগগেস করলে।

দুজনেই দুজনের কাছে কেমন একটু সঙ্কুচিত।

মেব্‌ল্‌ বললে, 'তোমার জন্যে একটু চা করে দিই।'

'না, আমায় এখুনি যেতে হবে।'

আবার তেমনি সংশয়াকুল কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মেব্‌ল্‌ জিগগেস করলে, 'না গেলেই কি নয় ?'

হৃদয়ের সেই বেদনা আবার জেগে উঠে ডাক্তারকে যেন বুঝিয়ে দিলে, মেব্‌ল্‌কে কতখানি সে ভালোবাসে। কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে পরম আগ্রহে হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা দিয়ে সে মেব্‌ল্‌কে নিচু হয়ে চুম্বন করলে।

মেব্‌ল্‌ কেমন অস্থির হয়ে উঠে বললে, 'এমন বিশ্রী গন্ধ আমার চুলে, আমি এমন বিশ্রী, সত্যি আমি একেবারে বিশ্রী।' হঠাৎ বুকভাঙা কান্নায় সে ফুঁপিয়ে উঠল, 'তুমি কেন আমায় ভালোবাসতে চাইলে ? কি ভয়ানক বিশ্রী আমি !'

তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার জন্যে চুমু খেতে খেতে

ডাক্তার বললে, 'কি বোকামি করছ? আমি তোমাকে চাই, তোমাকে বিয়ে করতে চাই। শিগ্‌গিরই আমাদের বিয়ে হবে—যদি পারি তো কালই।'

কিন্তু তবু মেব্‌ল্‌ আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমার ভয়ানক খারাপ লাগছে, ভয়ানক বিশ্রী। মনে হচ্ছে তোমার কাছে আমি যেন কুৎসিত একটা কিছু।'

অন্ধভাবে ডাক্তার শুধু বললে, 'না আমি তোমায় চাই, তোমায় চাই।' তার গলার স্বর অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। তাকে হয়তো না চাইতে পারে ভেবে, মেব্‌ল্‌ যা ভয় পেয়েছিল এ গলার স্বরে সে যেন তারও চেয়ে বেশি ভীত হয়ে উঠল।

নিষ্ফল সিদ্ধি

'ভেতরে কোথায় একটা শক্ত সরেস মানুষ লুকিয়ে আছে, কিন্তু ওর এমন কোনো মেয়ের হাতে পড়া দরকার যার মাথা ঠাণ্ডা।

মেয়ে-বন্ধু মহলে এই ছিল তার সম্বন্ধে মন্তব্য। এতে সে বাধিত হত, খুশি হত, আবার তিক্তও হয়ে উঠত।

মাথা-ঠাণ্ডা মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকার কথায় তিক্ত হয়ে উঠবার তার যথেষ্ট কারণও ছিল। কিছুদিন হল অতি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন সে চুকিয়ে দিয়েছে, গত দশ বছর ধরে তারও জিমি সম্বন্ধে ঐ ধারণাই ছিল।

"বাইরের জগতের আলো-বাতাসে জিমিকে আমি ছেড়ে দিতে চাই কিন্তু আমি ঠিক জানি তাহলেই বেচারা আর কোনোও মেয়ের খর্পরে গিয়ে পডবে। ঐ তার মহৎ দোষ। দশ মিনিট যদি ও একলা দাঁড়াতে পারে! না, তা অসম্ভব। অথচ ওর ভেতর কোথায় এমন অসাধারণ, এমন উঁচুদরের একটা মানুষ লুকিয়ে আছে!"

মস্ত বড় ধনী এক মার্কিন যুবকের হাত ধরে জিমির জীবন থেকে ভেসে চলে যাবার সময় ক্ল্যারিসার এই ছিল শেষ টিপ্পনি। জিমির নাম উল্লেখ করায় মার্কিন ছেলেটি একটু বুঝি উষ্ণই হয়েছিল। হাজার হোক ক্ল্যারিসা এখন তারই স্ত্রী। কিন্তু ক্লারিসা মাঝে মাঝে এমন বেয়াড়া ভাবে কথা বলে যেন জিমির সঙ্গে এখনও সে বিবাহিত।

জিমির অবশ্য সে রকম ধারণা আদৌ নেই। কীটানুকীটও তেমন কোনো কথা হলে রুখে দাঁড়ায়, জিমিও বুঝি তাই। তার সমস্ত মন এখন তিক্ত, তিক্ত ও বিষাক্ত। ক্ল্যারিসা তার সম্বন্ধে যা বলে বা ভাবে তা সমস্তই সে

জানে। তার ভেতর "অসাধারণ, সরেস, শক্ত একটি মানুষ লুকিয়ে আছে" সে অনেক শুনেছে। তাতে খুশি যা হতে পারতো তা 'বেচারা,"কোনোও মেয়ের খর্পরে" ইত্যাদিতেই সম্পূর্ণ উবে গেছে।

নিজের মনে মনেই সে বলে, "যে কোনো মেয়ের বুকে লুটিয়ে পড়বার মতো বেচারা আমি নই। ঠিক তেমন মেয়ে যদি খুঁজে পেতাম সেই আমার বুকে এসে আশ্রয় নিত।"

জিমির বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। আর কারও বুকে লুটিয়ে পড়বে না তারই বুকে কেউ আশ্রয় নেবে এরই উপর তার হৃদয়ের গতি এখন নির্ভর করছে। মনে মনে একটি মেয়েলি মেয়ের কথা সে ভাবে যার কাছে সে যে শুধু "শক্ত আর সরেস" ; মোটেই "বেচারা" নয়। ধরো কোনো সরল অশিক্ষিত মেয়ে, ডুবারভিলের টেস-এর মতো কেউ বা কোনো ব্যাকুলা গ্রেচেন্ কিম্বা রুথের মতো কোনো আনতাক্ষী কৃষক-কন্যা মাঠ থেকে নীবার-কণা কুড়িয়ে ফিরছে। এমনটি কি মেলে না? পৃথিবীতে নিশ্চয়ই এমন অনেক আছে।

মুশকিল এই যে তাদের সঙ্গে তার কখনও দেখা হয়নি। তার সঙ্গে যে সব মেয়ের দেখা হয় তারা সবাই সভ্য ও শহুরে। "খাঁটি" লোকের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ তার সত্যই হয়নি। আমাদের কজনেরই বা হয়। যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়না তারাই বুঝি "খাঁটি," সরল, সহজ নিষ্কলুষ আসল মানুষ! হায়, কেন এই সরল, নিষ্কলুষ লোকেদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়না! এ দুঃখের তুলনা নেই!

কারণ তারা যে আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই—আছে কোথাও না কোথাও! শুধু তারা আমাদের-ই চোখে পড়ে না।

জিমির যা কাজ তারই দরুন তার অসুবিধে সব চেয়ে বেশি। কত লোকের সংস্পর্শেই তাকে আসতে হয় কিন্তু আসলদের সঙ্গে নয়, সেই "খাঁটি" লোক, সেই সরল, নিষ্কলুষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেশ একটি উন্নাসিক উঁচুদরের, এক কথায়, সার্থক, সাময়িক পত্রিকার সে সম্পাদক। তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো এমন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে খোলাখুলি ধরনে লেখা যে কাতারে কাতারে অনুরাগীর দল তার সঙ্গে আলাপ করতে আসে। তার উপর সে দেখতে সুশ্রী, ইচ্ছে করলে অতি মাত্রায় ভদ্র ও মিষ্টি ব্যবহার করতে পারে এবং একদিক দিয়ে সত্যই সে খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুতরাং তাকে সশ্রদ্ধ অনুরাগ জানাবারও সযত্নে রক্ষা করতে চাইবার লোকের যে অভাব নেই তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমত তার সুশ্রীতার কথাই ধরা যাক : যেন বাটালিতে কাটা পরিচ্ছন্ন নিখুঁত মুখের গড়ন, তা দেখলে গ্রীক পুরাণের "ফনের" হাস্যময় মুখ মনে পড়ে যায়—"ফন" উদাস ভাবে হাসতে ভুলে গেছে এমন কোনোও সময়ের মুখ। টানা নিটোল তার গালের রেখা, জোরাল চোয়াল আর ঈষৎ বাঁকানো খগ-নাসা, তার সুন্দর ধূসর চোখ, তার সুদীর্ঘ পল্লব, তার দীর্ঘ কালো ভুরু, সবই অনিন্দ্যনীয়। যখন সে কিছু নিয়ে বিদ্রূপ করে তখনই তাকে সব চেয়ে সহজ মনে হয়। পুরু কালো ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত, তার ধূসর কালো চোখে কৌতুকের দীপ্তি, স্ফুরিত অধর ও নাসিকায় বিদ্রূপের রেখা—তাকে, তখন যেন ঠিক "প্যানের" মতো দেখায়। তার পুরুষ বন্ধুদের মতে তার সেই চেহারাই সব চেয়ে সুন্দর —সুশ্রী, মসৃন "স্যাটরের" চেহারা।

তার নিজের মতে সে সাধু "সিবাষ্টিয়ানের" মতো একজন শহিদ। নিষ্ঠুর পৃথিবী তীরের পর তীর মেরে তাকে বিদ্ধ করছে আর সে শুধু যথাসাধ্য তার ক্ষত থেকে ঝরে-পড়া প্রতি রক্ত বিন্দু গণনা করে চলেছে। কখনো কখনো সে তীর এক সঙ্গে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তাকে জর্জর করে তুলেছে, রক্তের ধারায় তার সব গণনা গেছে হারিয়ে—যেমন হয়েছিল ক্ল্যারিসা যখন ধনী মার্কিন ছেলেটির সঙ্গে চলে যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের

ব্যবস্থাটা জিমির, না ক্ল্যারিসার দিক থেকে করা হবে তাই ছিল ক্ল্যারিসার প্রশ্ন।

সুতরাং জিমিকেই এ দায় নিতে হয়।

তার পুরুষ-বন্ধুদের মতে জিমি হল চিরহাস্যময় "ফন," "স্যাটর" কিম্বা "প্যানের" মতো কেউ না-হলেও তার এই রকমই কিছু হওয়াই উচিত। কিন্তু তার নিজের মতে সে সাধু "সিবাষ্টিয়ানের" মতো শহিদ—শুধু তার মনটা "প্লেটোর"। তার মেয়ে-বন্ধুদের মতে সে একজন চমৎকার মধুর লোক—জীবনের উপলব্ধি তার গভীর, আর সেই সঙ্গে মেয়েদের সত্যি করে বোঝবার ক্ষমতা। কি করে মেয়েদের রানীর মর্যাদা দিতে হয় সে জানে, আর বলতে গেলে সেইতো মেয়েদের সত্যকার মর্যাদা···

স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর সে খুব জমকালো গোছের ধনী কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। সে তা করেনি। ভেতরের কথা হল এই যে আর কোনোও মেয়েকে রানীর মর্যাদা সে দেবে না এই ছিল তার সঙ্কল্প। এবার মেয়েদের পালা তাকে রাজার মর্যাদা দেওয়ার।

এমন কোনো মেয়ে সে চায়, রক্তে যার উদ্দামতা অথচ শিক্ষা ও সভ্যতার যাকে এখনও বিকৃত করেনি—যার কাছে রূপে, গুণে, ঐশ্বর্যে সে "সলোমনের" মতো। সে-মেয়ের অবস্থা বেশ একটু খারাপ হওয়া দরকার, যাতে জিমির ঐশ্বর্য তাকে অবাক করে দিতে পারে। ঐশ্বর্য তার তেমন কিছু নয়, তিনটি হাজার পাউণ্ড আর হ্যাম্‌শায়ারে ছুটি-ছাটা কাটাবার মতো একটি ছোট বাড়ি। অবশ্য সরল অনাবিল হতে গেলে তার সাধারণ, নিম্নশ্রেণীর একটি মেয়ে হওয়া দরকার—হ্যাঁ, একান্ত দরকার। তা বলে ঠিক স্থূল, নির্বোধ, নগণ্য কেউ হলেও চলবে না।

বহু বহু চিঠি সে পায়; কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস ইত্যাদি অনেক কিছুই তাতে থাকে। আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালের মধ্যে দাঁড়কাকের মতো ঠুকরে ঠুকরে সে কিছুই পড়তে বাকি রাখে না।

এরই মধ্যে একটি—না একটি চিঠি নয়, একজন লেখিকা হয়তো সেই আদর্শ মেয়ে হতেও পারে। নাম তার এমিলিয়া পিনেগার। ইয়র্ক-শায়ারের একটি কয়লার খনির সংশ্লিষ্ট গ্রামে সে থাকে। বিবাহিত জীবনে সে যে সুখী নয় একথা বলাই বাহুল্য।

উত্তরাঞ্চলের এই সমস্ত অজানা ও কতকটা ভয়াবহ খনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম সম্বন্ধে জিমির মনে চিরকাল কেমন একটা রহস্যময় কৌতূহল ছিল। সে নিজে কখনো অক্সফোর্ডের উত্তরে এক পা-ও বাড়ায়নি। তার ধারণা সেখানকার খনিতে যারা কাজ করে তাদের ভেতরই আসল খাঁটি জিনিস আছে। আর কি একটা অপরূপ নাম, পিনেগার! তার ওপর আবার এমিলিয়া।

এমিলিয়া একটি কবিতার সঙ্গে ছোট একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। চিঠিতে "কমেন্‌টেটার"-এর সম্পাদককে এই অনুরোধ ছিল যে কবিতাটি যদি উপযুক্ত না মনে হয়—তাহলে তিনি যেন সেটি ছিঁড়ে ফেলেন। "কমেন্‌টেটার"-এর সম্পাদক হিসাবে জিমির কবিতাটি বেশ ভালোই লাগল, ছোট্ট চিঠিটি ততোধিক। কিন্তু কবিতাটি ছাপা সম্বন্ধে তখনও সে মনস্থির করতে পারেনি। সে মিসেস্ পিনেগারকে চিঠি লিখে জিগগেস করলে তার আর কিছু পাঠাবার মতো আছে কিনা।

এমনি করে চিঠি লেখালেখি শুরু। অবশেষে অনুরোধে পড়ে—মিসেস্ পিনেগার লিখলেন: "আপনি আমার কথা জানতে চেয়েছেন, কিন্তু কিইবা আমি বলব। আমার বয়স একত্রিশ, আট বছরের আমার একটি মেয়ে আছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তিনি আমার সঙ্গে এক বাড়িতেই থাকেন বটে কিন্তু সঙ্গ দেন তিনি আর একজনকে। আমি কবিতা লিখতে চেষ্টা করি যদি অবশ্য তা কবিতা হয়; কারণ আর কোনো ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার পথ আমার নেই। কারুর কাছে এর দাম যদি নাও থাকে, তবুও আমাকে যেমন করে হোক নিজেকে প্রকাশ

করতেই হবে, অন্তত ক্যানসার বা ঐ-রকম যে সব রোগ মেয়েদের হয়, তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই করতে হবে। বিয়ের আগে আমি স্কুলে মাস্টারি করতাম। রথ্যারহাম কলেজ থেকে পাশ করে আমি সার্টিফিকেট পেয়েছি। সম্ভব হলে আমি আবার স্কুলের কাজ নিয়ে একলা থাকতাম। কিন্তু বিবাহিত মেয়েরা আর স্কুলের কাজ পায়না, তাদের এ কাজ দেয়া হয়না।—"

খনির মজুর

তারই স্ত্রীর রচনা

মাল গাড়ির খুদে ইঞ্জিন,
আর বাছাই করবার ছাঁকনিগুলোর শব্দ আমি শুনতে পাই,
ঠিক যেন তার হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্‌ধকানি।
তার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসে ঐ একই মর্ম আমি পাই।
হালকা উজ্জ্বল তার চুলের রং ;
খনির গহ্বরে জ্বলন্ত কয়লার পাহাড়,
যেমন কটুগন্ধ ধোঁয়ায় বাতাস আচ্ছন্ন করে তোলে,
তেমনি আচ্ছন্ন করে আছে সে আমার জীবন।
অনির্বান যে-আগুন পৃথিবী ভেদ করে চলেছে,
তা যেন অনাদি কালের তারই দুর্নিবার সঙ্কল্প।
তার নিঃশ্বাস পড়ে, আর খনির খাড়া সুড়ঙ্গ পথে
কপিকলের খাঁচা ওঠা-নামা করে ;
শুষে-নেওয়া বাতাস যেমন আলোড়িত হয় ঘূর্ণি পাখায় ;
তেমনি উদ্দাম যেন তার কামনা।
পাতালে কয়লার জগতে তার বাস।
তার আত্মা যেন আশ্চর্য এক ইঞ্জিন !

তারই সঙ্গে আমি বিবাহিত ; তাই আমি জানি,
এই তার সত্যকার পরিচয়।
মাতা ধরিত্রীর অন্ধকার অঙ্গার-জঠরে তার জন্ম,
ঊর্ধ্বলোকের দুঃখ ভোগ তার নিয়তি।

এই কবিতাটি নিয়েই "কমেন্‌টেটার"-এর সম্পাদক হিসাবে জিমি একটু ফাঁপরে পড়েছিল। মিসেস্ পিনেগার ঠিক সরল গ্রাম্য মেয়ে বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই কিনা, সে বিষয়েও তার একটু ভাবনা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মেয়েটির ভিতরকার কি যেন একটা আকুল হতাশার সুর, কি যেন একটা অত্যন্ত করুণ ইতিহাস, তাকে আকর্ষণ করেছে।

পরের ঘটনা

সন্ধ্যায় গোধূলি যখন ঘনিয়ে এসেছে,
তখন দিন কেমন করে কেটেছে,
আমায় যদি জিজ্ঞাসা কর ;
আমি বলব, জানিনা।
আমার, আর যে দিন গেছে তার মাঝখানে
কোনো এক নতুন আগন্তুকের সুদূর দামামা ধ্বনি।
সে এক আশ্চর্য পুরুষ : এই সব ধোঁয়াটে বস্তির
করুণ গোধূলির ভেতর দিয়ে
অদৃশ্য সেনার সুদীর্ঘ বাহিনী সে চালিয়ে নিয়ে যায়।
অন্ধকারে সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার
যখন অবশ হয়ে আসতে থাকে
তখন, সমস্ত দিন যা দেখেছি, যা জেনেছি,
কোনো এক অস্বচ্ছ পরদার আড়ালে
জঞ্জালের মতো হারিয়ে যায়।

তার বদলে নিজের মধ্যে অস্পষ্ট দামামা-ধ্বনি শুনি।
অবসাদ যত গাঢ় হয় কান পেতে উৎসুক হয়ে
ততই সে আগমনীর অর্থ বুঝতে চাই আমার জীবনে।
কে জানে এ হয়তো মৃত্যু দেবতারই
প্রলয় তাণ্ডবের বাদ্য!
কিম্বা কোনো এক আশ্চর্য পুরুষ,
মানুষের এক নতুন অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা
এমনি করে ধ্বনিত করে চলেছে।
কিন্তু কি তাতে আসে যায়!
কয়লার কালো ধুলোয় যে দিন শুরু হয়েছিল
কয়লার মতো কালো গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকারে
সেদিন শেষ হয়ে যাচ্ছে তেমনি।
বেঁচে থাকব যদি পারি;
না যদি পারি তবে যা আসে আসুক
আমি প্রস্তুত।

এই কবিতাটির ভেতর এমন একটি অপরূপ, অতল নিরাশার সুর জিমির কানে লাগলো, যে সে কবিতাটি নিজের কাগজে ছাপবে বলে ঠিক করল। শুধু তাই নয়, লেখিকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেও সে উৎসুক হয়ে উঠল। চিঠি লিখে সে মিসেস্ পিনেগারের কাছে জানতে চাইলে যে জিমি যদি কাছাকাছি কোথাও যায় তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে কিনা। শেফিল্ডে সে যে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে তাও সে জানালে। মিসেস্ পিনেগার সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলেন।

"বই আর সত্যকার জীবনের মানুষ" নিয়ে তার বিকালের বক্তৃতা সেরে সে পিনেগাররা যে গ্রামে থাকে তারই উদ্দেশে একটি ট্রেনে রওনা হল।

ফেব্রুয়ারি মাস, এখানে-সেখানে তুষার জমে আছে, পৃথিবীর কেমন একটা বীভৎস চেহারা। মিল-ভ্যালিতে যখন সে পৌঁছাল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে— গাঢ় আঠার মতো অন্ধকার, কি যেন একটা বিভীষিকায় ভরা, তারই ভেতর দিয়ে ঠিক প্রেতের মতো কথা কইতে কইতে লোকেরা যাতায়াত করছে, উচ্চারণে তাদের অদ্ভুত টান, পাতালের কয়লার খনির অদ্ভুত গন্ধ তাদের গায়ে, তাদের ভারি ভারি পাগুলো মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতেই যেন তারা শ্রান্ত। এ যেন একটা প্রেতায়িত ভয়াবহ জগত।

বাজারে যাবার জন্যে একটা চড়াইয়ের রাস্তা ধরে তাকে উঠতে হল। যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে অন্ধকার উপত্যকায় ইতস্তত ছড়ান আলোর বিন্দুগুলি দেখে তার মনে হল যেন প্রেতেরা সেখানে শিবির ফেলেছে। গাঢ় চটচটে অন্ধকারে কয়লা ও গন্ধকের কটুগন্ধ যেন প্রেত-লোকেরই আভাস দেয়।

লোকের কাছে রাস্তা জেনে নিয়ে সে আর একটা উতরাই পথে নিউ লণ্ডন লেনের দিকে অগ্রসর হল। গায়ে তার কেমন একটু কাঁটা দিয়ে উঠছে। চারদিকে একটা ছমছমে বিভীষিকা, যেন কালো বাতাস, লোহা ও ধাতুর নিঃশ্বাসে বিষাক্ত। তার ভাগ্য ভালো যে, সে যেমন কাউকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, তাকেও কেউ পাচ্ছে না দেখতে। যাদের কাছে সে পথ জিগগেস করছে তাদের ভাষা অনেকটা আধা-অপমান ও আধা-তাচ্ছিল্যের।

অনেককে পথ জিগগেস করে করে বহুদূর ক্লান্ত ভাবে হাঁটবার পর সে প্যাচপ্যাচে তুষার-গলা ঠাণ্ডা কাদায় ভরা, দুধারে গাছের সারি দেওয়া একটি রাস্তায় এসে পড়ল। বোঝা গেল যে কয়লার খনিটা শহরের বাইরে কোথাও হবে। গাছগুলোর ভেতর দিয়ে অন্ধকারের গায়ে ক্ষতর মতো সব জ্বলন্ত কয়লার চুল্লির আগুনগুলো সে দেখতে

পাচ্ছিল, জ্বলন্ত গন্ধকের গন্ধ আসছিল তার নাকে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন আধুনিক কোনো "ইউলিসিস্"—"হেকেটে"র রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "সাইরেন," "সিলা" বা "ক্যারিবডিসের" বদলে, খনি ও কারখানার জগতে আধুনিক "ওডিসি" কত বেশি ভয়াবহ।

অবশেষে সে দূরে কয়েকটা আলোর রেখা দেখতে পেল, নিশ্চয় ওখানে বাড়ি ঘর আছে। এইবার একটা নতুন রাস্তা—সমস্ত রাস্তায় একটি মাত্র আলো। বাড়িগুলো একেবারেই অন্ধকার বললেই হয়, জিমি দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিক যেন শ্মশান। তার পর তিনটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

তারাই তাকে বাড়ি চিনিয়ে দিলে। একটা অন্ধকার গলি দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে একটা দরজার কাছে পৌঁছে সে কড়া নাড়লে। ওপরের একটি ধাপে···একটি মেয়ে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে বেশ লম্বাই বলা চলে।

"আপনিই কি মিসেস্ পিনেগার?"

"ও আপনি, মিস্টার ফ্রিথ্? আসুন, আসুন!"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে রান্নাঘরের উজ্জ্বল আলোকে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে মিসেস্ পিনেগারকে ভালো করে দেখা গেল, মুখে যেন তার একটা চাপা রাগের মুখোশ, দৃষ্টি যেন কঠিন। হঠাৎ জিমির নিজেকে অত্যন্ত ছোট, অত্যন্ত খেলো মনে হল। সব কেমন যেন তার গুলিয়ে গেল। অপ্রস্তুত ভাবে বললে, "এখানে আসতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে।" নিজের কাদা মাখা বুট জোড়ার দিকে চেয়ে সে আবার বললে, "আপনার বাড়ি ঘর সব একেবারে নোংরা হয়ে যাবে দেখছি।"

"না, না, তাতে কি হয়েছে, আপনার চা খাওয়া হয়েছে?"

"না, কিন্তু তার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

একটি ছোট মেয়েকে দেখতে পেয়ে খানিকটা যেন তার আড়ষ্টতা

কাটল। মেয়েটির হালকা রঙের চুল কপালের ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে, তারই তলায় নীল চোখ দুটি কেমন যেন একটু করুণ।

"আপনার মেয়ে নিশ্চয়, বাঃ, বেশ মেয়েটি! কি নাম ওর?"

"জেন।"

"কেমন আছ জেন?" জিমি জিগগেস করলে। কিন্তু মেয়েটি শুধু এক দৃষ্টে নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বাপ, মা-র স্নেহ-বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের মতো তার চোখে কেমন যেন ভয়, বিমূঢ়তা ও বেদনার ছায়া। টেবিলে রুটি, মাখন, জ্যাম, কেক্‌ ও চা সাজিয়ে মিসেস্‌ পিনেগার জিমির সামনা-সামনি এসে বসল। সুন্দরী সন্দেহ নেই, নিখুঁত কালো ভুরু, ধূসর চোখে সোনালি ছিটে। তাকাবার সহজ, সতেজ ভঙ্গী দেখলে মনে হয় নিজের সম্মান নিজে রাখার ব্যবস্থা করতে সে অভ্যস্ত। সমস্ত দেহের মধ্যে চোখ দুটিই অবশ্য তার সব চেয়ে সুন্দর। তার ভেতর করুণার আভাস যেমন আছে তারই সঙ্গে, ধূসরের গায়ে হলুদের ছিটের মতো অটল, অনমনীয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা মিশে আছে। গ্রীক মুখোশের মতো নাক ও মুখ তার নিখুঁত। প্রথম দর্শনেই জিমির মনে হল, মিসেস্‌ পিনেগার সেই ধরনের মেয়ে, যে জীবনে ভুল করেছে জেনেও নিজেকে আর বদলাতে চায় না—বদলাতে এখন আর পারে না।

জিমির বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। এই মেয়েটির সামনে সব দিক দিয়ে কেমন যেন তার নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে। মেয়েটির মুখে কোনো কথা নেই। জিমি চা খাচ্ছে আর শুধু সেই দিকে তাকিয়ে সে বসে আছে। মানুষ ও নিয়তির বিরুদ্ধে যে নারী চিরদিন সংগ্রাম করে এসেছে তারই দৃষ্টি মিসেস্‌ পিনেগারের চোখে। রান্নাঘরের আর এক কোণ থেকে হালকা রঙের এক মাথা চুল নিয়ে ছোট মেয়েটিও তপ্ত নীল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয় মনে হচ্ছে," জিমি বললে।

"না, নয়, অত্যন্ত বিশ্রী জায়গা," উত্তর দিলে মিসেস্ পিনেগার।
"এখান থেকে আপনার চলে যাওয়া উচিত।"
মিসেস্ পিনেগার এ কথা শুনেছেন বলেই মনে হল না। আলাপ চালিয়ে যাওয়া জিমির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে। মিস্টার পিনেগারের কথা সে জিগগেস করলে। মেয়েটি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "তিনি ন'টায় আসেন।"
"এখন খনিতে আছেন নাকি?"
"হ্যাঁ, তাঁর বিকেল থেকেই কাজের পালা।"
এ পর্যন্ত জেন একটি শব্দও করেনি।
"জেন কথা-টথা বলে না?" জিমি জিগগেস করলে।
তার দিকে ফিরে তাকিয়ে মিসেস্ পিনেগার বললে, "খুব কম।"
জিমি এবার তার বক্তৃতার কথা, শেফিল্ড ও লণ্ডনের কথা নিয়ে খানিক আলাপ করলে। কিন্তু মিসেস্ পিনেগারের তাতে বিশেষ মনোযোগ আছে বলে মনে হল না। তেমনি কঠিন অদ্ভুত দৃষ্টিতে জিমির দিকে তাকিয়ে সে সারাক্ষণ নিজের দূরত্বটুকু বজায় রেখেই প্রায় নীরব হয়ে বসে রইল। জিমির মনে হল, কার ওপর যেন মিসেস্ পিনেগার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল; সে কামনা তার সফল হয়েছে। কিন্তু যে চড়ায় শত্রুর নৌকো সে বানচাল করেছে সেইখানেই যেন তার নিঃসঙ্গ নির্বাসন হয়েছে। মনে তার ক্ষমা নেই, ক্ষোভ নেই, অনুতাপ নেই, তবু কি প্রতিশোধ সে যে নিয়েছে, এবং কেনই বা নিয়েছে, তাই শুধু সে ভেবে পায় না।
"আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত," জিমি বললে।
"কোথায়?" মিসেস্ পিনেগার জিগগেস করলে।
জিমি অস্পষ্ট ভাবে হাত নেড়ে বললে, "যেখানে হোক, শুধু এখান থেকে আর কোথাও।"

মিসেস্ পিনেগার যেন সেই কথাটাই গভীর ভাবে খানিক ভেবে দেখে বললে, "তাতে তফাৎ কি হবে আমি তো বুঝতে পারি না।" তারপর মেয়েটির দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে বললে, "এক এই পৃথিবী থেকেই একেবারে সরে যাওয়া ছাড়া তার কিছুতে কোনো লাভ আছে বলে আমার মনে হয় না।" মেয়েটিকে আর একবার মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললে, "কিন্তু ওর কথাটাও তো ভাবতে হয়।"

জিমি সত্যই ভীত হয়ে পড়ল। এ ধরনের নিদারুণ গম্ভীর কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তবু সে একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠেছিল। এই স্বল্পভাষী সুন্দরী মেয়েটি তাকে যেন কি কঠিন এক পরীক্ষায় আহ্বান করছে। চোখের তারায় যার সোনার গুঁড়ো ছিটানো তার দৃষ্টিতে করুণার সঙ্গে একটা দ্বন্দের আহ্বান। মেয়েটির কোথায় হয়তো হৃদয় এখনও আছে। কিন্তু সে হৃদয় কেমন করে, কেনই বা বিকল হয়ে গেছে? হয়তো মেয়েটি নিজেই তার জন্যে দায়ী, নিজেই সে নিজের শত্রুতা করেছে।

জীবন নিয়ে ছোট-খাট জুয়া খেলতে জিমি অভ্যস্ত। হঠাৎ বলে ফেললে, "আমার সঙ্গে এসেও তো থাকতে পারেন!"

জিমির মুখে দুর্বোধ অদ্ভুত হাসি। জুয়াড়ীর মতোই সে মেয়েটির আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। যেখানে একেবারে সর্বনাশ হবার আশঙ্কা নেই, তেমন কোনো জুয়ার ব্যাপারে জিমি সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর এক দিক দিয়ে আবার মেয়েটি সম্বন্ধে কেমন একটা আতঙ্কও তার মনে আছে। সে আতঙ্ক সে জয় করতে চায়।

মেয়েটি তেমনি স্থির হয়ে বসে রইল। তার সুন্দর মুখে শুধু একটু কঠিন হাসির আভাস। অবশেষে বললে, "আপনার সঙ্গে গিয়ে থাকতে পারি, মানে?"

"মানে—সাধারণত যা মানে বোঝায় তাই।" জিমি একটু জোর করেই

হেসে উঠে আবার বললে, "এখানে তো তুমি সত্যিই সুখী নও। এ অবস্থায় তোমার থাকাই উচিত নয়। তুমি তো ঠিক সাধারণ মেয়ে নও। বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এস। আমার সঙ্গে এসে তোমাকে থাকতে বলছি, এ বলার মধ্যে কোনোও ফাঁকি নেই। লণ্ডনে এসে তুমি যদি চাও আমার স্ত্রীর মতোই থাকবে। তারপর আমরা বিয়ে যদি করতে চাই, তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই তা আমরা অনায়াসেই করতে পারব।"

জিমি কথাগুলো যেন নিজের মনেই বলে গেল। তার প্রকৃতিই এই রকম। সব কিছু সে নিজের ভেতর থেকেই ভেবে নেয়, যেন তার নিজেরই ভেতরকার সমস্যা। নিজের মনে এরকম কথা বলবার সময় তার বাঁ চোখটা একটু মিট মিট করে আর মাথাটা একটু আলগা ভাবে দোলে, যেন অন্তর্মুখী দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেকেই শুধু সে বোঝাতে চাইছে।

মেয়েটি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। এই ধরনের ব্যাপার তার কাছে সত্যই অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর। জিমির অদ্ভূত ব্যবহারে, তার এই আকস্মিক অসঙ্কোচ প্রস্তাবের ধরনে, তার নিজের ঔদাসিন্যও খানিকটা কেটে যায়।

"আচ্ছা এ বিষয়ে পরে ভাবা যাবে।" তারপর আবার সেই ছোট মেয়েটির দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করে মিসেস্ পিনেগার বললে, "ওর কি হবে?"

জেন তখনও সেই কোণের জায়গায় নীরবে বসে আছে। তার ছোট রক্তিম ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হয়ে আছে, মুখে কোনো ভাবের চিহ্ন মাত্র নেই। সে যেন মূর্ছার ঘোরে আচ্ছন্ন, মনে হয় সে যেন বড়দের মতোই সব কিছু বোঝে, তবু শিশুর মতো অচেতন হয়ে বসে আছে।

মিসেস্ পিনেগার তার চেয়ার ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে এবার সোজা-সুজি ভাবে তাকাল, মেয়েটিও মা-র দিকে তাকিয়ে রইল। তার তপ্ত

নীল চোখে অপরাধীর মতো কি যেন ভয়ের আভাস। মা ও মেয়ে, দুজনের কারুর মুখেই কথা নেই, তবু তাদের দৃষ্টি দিয়েই যেন তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছে।

জিমি মাথা ঘুরিয়ে বললে, "বাঃ নিশ্চয়ই! ওকেও তো নিয়ে যেতে হবে।" মিসেস্ পিনেগার মেয়েটির দিক থেকে ফিরে তেমনি অচঞ্চল দৃষ্টিতে জিমির দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি কিছু না ভেবে চিন্তে হঠাৎ কিছু করছি মনে কোরো না। অনেক দিন ধরেই আমি এই নিয়ে ভাবছি—যেদিন থেকে তোমার প্রথম চিঠি ও কবিতা পেয়েছি সেই দিন থেকে।"—বিব্রত হওয়ার দরুনই বোধহয় জিমির গলা একটু কেঁপে গেল।

মিসেস্ পিনেগার ইষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে জিগগেস করলে, "আমাকে দেখার আগেই?"

"নিশ্চয়ই, তোমায় দেখার আগে তো বটেই। তা না হলে তোমায় তো কোনো দিন দেখতামও না। প্রথম থেকেই আমার কেমন মনে হয়েছিল"—

জিমি যেন কিসের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কথা কইতে কইতে তার দেহের অদ্ভুত ভঙ্গী সব মাতালের মতো। নেশায় আবিষ্টের মতো, অন্তর্মুখী দৃষ্টি নিয়ে সে শুধু নিজের সঙ্গেই কথা কয়ে যাচ্ছে। মিসেস্ পিনেগার যেন তার নিজের চেতনার মধ্যে অশরীরী একটা ছায়া মাত্র, সেই ছায়ার সঙ্গেই যেন তার আলাপ চলছে।

মিসেস্ পিনেগার জিগগেস করল, "এখন আমাকে দেখবার পর সত্যিই কি আপনি চান যে আমি লণ্ডনে যাই?"—তার গলায় অবিশ্বাসের সুর।

সমস্ত ব্যাপারটাতেই কেমন একটু আতিশয্যের আভাস সে যেন পাচ্ছে। কিন্তু তাই বা হবে না কেন? যে কবরের মধ্যে সে বাস করছে, তা

থেকে তাকে টেনে বার করতে হলে, একটু আতিশয্য তো না হয়েই পারে না।

আবার হাত ও মাথা ঘুরিয়ে জিমি বললে, "নিশ্চয়ই চাই। সত্যি করে এখন তোমায় দেখেছি বলেই সত্যি করে তোমায় চাই।" এখনও জিমির দৃষ্টি অন্তর্মুখী, নেশার ঘোরে সে নিজের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছে।

দূরের কোণ থেকে ছোট মেয়েটির তপ্ত নীল চোখের দৃষ্টি এখনও তার ওপর নিবদ্ধ। হঠাৎ সে দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সে নির্বোধের মতো হেসে উঠল। তার পর, বললে, "বাঃ এতটা তো আমি আশাই করতে পারিনি। তুমি, জেন, দুজনেই আমার সঙ্গে গিয়ে থাকবে, সে তো আমার পক্ষে নতুন জীবন।" জিমির গলার স্বরে আড়ষ্টতার সঙ্গে কেমন একটা উন্মাদনা। এই প্রথম মিসেস্ পিনেগারের দিকে সে সোজা ভাবে তাকাল। কিন্তু সোজাসুজি তাকান সত্ত্বেও মনে হল এখনও তার দৃষ্টিতে কি যেন একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতা। এখনও সে যেন শুধু নিজেকেই দেখছে—নিজের চেতনার অন্তর্লীন সব ছায়াকেই।

মিসেস্ পিনেগার একটু যেন কঠিন স্বরেই জিগগেস করলে, "আমায় কবে আপনি যেতে বলছেন?"

"কেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ইচ্ছে হলে কালই আমার সঙ্গে যেতে পার। সেণ্ট জন্‌স্ উডে আমার ছোট্ট একটা বাড়ি আছে, সে বাড়ি তোমারই আশায় সাজান। কালই আমার সঙ্গে চল, সেইটাই সব চেয়ে সহজ।"

জিমি মাথা নিচু করে বসে আছে। মিসেস্ পিনেগার তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। মাথার কোঁকড়ান চুল তার পাতলা হয়ে এসেছে, একটু টাকও পড়তে সুরু করেছে।

"কাল আমি যেতে পারব না। আরও কয়েকটা দিন আমার দরকার," মিসেস্ পিনেগার বললে। তার ইচ্ছে হল জিমির মুখটা আর একবার

দেখে। বলতে গেলে একেবারে শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়ে যে মানুষটি তার কাছে এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি এনেছে তার মুখটাও সে যেন মনে করতে পারছে না।

জিমি এবার মুখ তুলে তাকাল—তার চোখে সেই অন্ধের মতো আত্মনিমগ্ন দৃষ্টি। তাকে ঠিক মেফিস্টোফিলিসের মতো দেখাচ্ছে—অন্ধ মেফিস্টোফিলিস। কালো ভুরু জোড়া একটু কোঁচকান, যেন অন্ধ মেফিস্টোফিলিস্ রাস্তায় ভিক্ষা করছে।

"আমার ভাগ্যে যে এমনটা ঘটেছে এ তো সত্যিই আশ্চর্য!"—কথায় জোর দেবার চেষ্টায় জিমির ঠোঁট দুটোর ভঙ্গী হয়েছে অদ্ভুত। সে আবার বলতে লাগল, "আমি তো শেষ হয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে শেষ। শেষ হয়েছিলাম ক্লারিসা আমার কাছে থাকতেই। সে চলে যাবার পর আমার আর কিছুই ছিল না। পৃথিবীতে আর আমার যে কিছু হতে পারে তা আমি ভাবিনি। তার পর এই যা ঘটল—তোমার দেখা আমি পেলাম, আমার কাছে এ এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর জেন—জেনের কথাই ধর, সত্যিই সেও আসছে ভাবলে সমস্ত ব্যাপারটা যেন বিশ্বাস করতেই সাহস হয় না।" জিমি অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল।

জেন ও তার মা একটু অপ্রস্তুত ভাবেই জিমির দিকে চেয়ে রইল। মিসেস্ পিনেগার একটু ভেবে নিয়ে বললে, "মিস্টার পিনেগারের সঙ্গে আমার সব বোঝাপাড়া করে নিতে হবে। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"আমি? না, বিশেষ উৎসাহ নেই। তবে তুমি যদি উচিত মনে কর তাহলে অবশ্যই চাই।"

মিসেস্ পিনেগার বললে, "আমার মনে হয় দেখা করাই ভালো।"

"বেশ, তাহলে তাই করব যখন তুমি বল।"

"তিনি ন'টার পরে আসেন।"

"বেশ তখনই তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করব, সেই ভালো। তবে তার আগে রাত্রে শোবার একটা জায়গা খুঁজে বার করা দরকার মনে হচ্ছে। এবং খুঁজতে দেরি না করাই বোধ হয় উচিত।"

"চলুন আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে খোঁজ করছি," মিসেস্ পিনেগার বলল। জিমি বাধা দিয়ে বলল, "না, না, তোমার না যাওয়াই ভালো। শুধু কোথায় যেতে হবে যদি আমায় বলে দাও।"—তার সুরটা কতকটা অভিভাবকের মতো। মিসেস্ পিনেগারকে সে যেন দুর্নাম থেকে, এমন কি তার নিজের কাছ থেকেও বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকারে জিমি বেরিয়ে পড়ল। যত খারাপই তার লাগুক, তবু তার মাথায় টুপিটা এঁটে দেবার ধরনে মনে হল মস্ত বড একটা দুঃসাহসিক অভিযানে যেন সে চলেছে।

মিসেস্ পিনেগার রুটির দোকানে খোঁজ করতে বলেছিল, সেখানকার লোকেরা কিন্তু তাকে জায়গা দিতে রাজী নয়। সরাইখানাতেও সবাই মাথা নেড়ে জানালে জায়গা নেই। জিমি কিন্তু যতদূর সম্ভব তার মার্জিত অক্সফোর্ডের টান দেওয়া ভাষায় মিনতি করে বললে, "তার মানে আমি কি কোথাও বেড়ার ধারে শুয়ে রাত কাটাই আপনারা চান? আপনাদের যিনি কর্ত্রী তাঁর সঙ্গে কি দেখা হয় না?" অনেক কষ্টে কর্ত্রীকে রাজী করিয়ে বসবার ঘরে একটা শোবার জায়গা সে যোগাড় করে নিলে। সেখানে বেশ গনগনে আগুনের ব্যবস্থাও আছে। দশটা নাগাদ ফিরবে বলে সে তারপর জল কাদার ভেতর দিয়ে আবার নিউ-লণ্ডন লেনের দিকে চলল।

সে যখন পিনেগারদের বাড়িতে এসে পৌছল মেয়েটিকে তখন শোয়ান হয়েছে। আগুনের ওপর একটা সস্‌প্যানে জল ফুটছে। মিসেস্ পিনে-গারের মুখের কঠিন রেখাগুলো এর মধ্যেই যেন একটু মোলায়েম হয়ে এসেছে মনে হল।

মিসেস্ পিনেগার টেবিলের ওপর একটা ঢাকা বিছিয়ে দিলে। জিমি নীরবে বসে রইল। তার মনে হল মিসেস্ পিনেগার যেন তার অস্তিত্বই ভুলে গেছে। স্বামীর বাড়ি ফেরার উদ্যোগ-আয়োজনেই সে ব্যস্ত।

কয়লার খাদে রাত্রির ন'টার বাঁশি শোনা গেল। মিসেস্ পিনেগার ফুটন্ত সস্‌প্যানটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সেখান থেকে এবার সেদ্ধ আলুর গন্ধ আসছে।

বাইরে ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল তার পর দমকা ঝড়ের ঝাপটার মতোই যেন একটি লোক এসে ঢুকল। জিমির বুঝতে দেরি হল না যে এই মিস্টার পিনেগার। কয়লার গুঁড়োয় মুখটা কালো হয়ে আছে, তারই ভেতর দিয়ে জ্বলন্ত নীল চোখ আর হালকা রঙের গোঁফ জোড়া দেখা যাচ্ছে। এমিলি পিনেগার পরিচয় করিয়ে জিমিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ইনি মিস্টার ফ্রিথ্।"

জিমি অক্সফোর্ডের ঢঙে একটু এঁকে বেঁকে উঠে হাত বাড়িয়ে কুশল-সম্ভাষণ করলে।

মিস্টার পিনেগার বললে, "আপনি বসুন, আমার হাত নোংরা, কর-মর্দনের উপযুক্ত নয়।"

জিমি আবার সোফায় বসে পড়ে বললে, "না, কয়লার গুঁড়ো আবার নোংরা কিসের, ওতে কোনো দোষ নেই।"

"সবাই তাই বলে বটে," পিনেগার উত্তর দিলে। পিনেগার মাথায় খুব লম্বা নয়, একটু রোগা কিন্তু বেশ সবল ও তেজী বলেই মনে হয়। মিসেস্ পিনেগার একটি কলসীতে গরম জল ঢালছে। একটা কাঠের চেয়ারে বসে পড়ে পিনেগার তার বিশাল খাদে-হাঁটবার বুটজোড়া খুলতে লাগল। তার গা থেকে পাতালের জগতের একটা অদ্ভুত গন্ধ বার হচ্ছে। নীরবে বুটজোড়া খুলে চটি পায়ে দিয়ে সে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল। এমিলি গরম জলের কলসীটা নিয়ে সেখানে রেখে এল।

খানিক বাদে গা-হাত ধুয়ে পিনেগার শুধু প্যাণ্ট পরে খালি গায়ে এসে আগুনের কাছে উবু হয়ে বসল। মুখ, হাত ও গায়ের সামনের দিকটাই শুধু তার ভিজে, পিঠটা একেবারে শুকনো। একটা তোয়ালে নিয়ে সে মুখ, হাত জোরে জোরে ঘসতে লাগল। এমিলি সাবান মাখানো একটা ফ্লানেল দিয়ে তার পিঠটা তখন পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ঘরে যে আর কেউ আছে তা যেন তাদের খেয়ালই নেই। খাদে যারা কাজ করে এটা তাদের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান। স্বামীর পিঠ ধুতে ধুতে এমিলির মুখে যে ঘৃণা ও বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠছিল, জিমির কাছে তখনও তার অর্থটা স্পষ্ট নয়।

ধোয়া-মোছা শেষ হবার পর এমিলি তোয়ালে ও জলের জায়গাটা নিয়ে চলে গেল। পিনেগার তখনও আগুনের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে বসে আছে, এটাও যেন তার প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান। তার খালি গায়ের ওপর আগুনের আভা এসে পড়েছে, মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে উত্তাপে। জ্বলন্ত কয়লাগুলোর দিকে চেয়ে কি যেন সে ভাবছে।

বয়স তার প্রায় পঁয়ত্রিশ। তাজা জোয়ান চেহারা, শরীরে কোথাও মেদের চিহ্ন নেই। পেশীগুলো তার স্থূল না হলেও সতেজ ও সবল। আগুনের আভায় তাকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে জিমির মনে হল পিনেগার যেন একটা নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই করা ইঞ্জিন—ইস্পাতের মতো নীল চোখে দুর্জ্ঞেয় তার দৃষ্টি। এমন মসৃণ তার গতি যে মনে হয় তার চলার ফাঁকে ফাঁকে ঘুম যেন জড়িয়ে আছে।

পিনেগার জিমির দিক থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে ফিরে তাকাল: জিমিকে যেন সে নিজের চেতনার বাইরেই রাখতে চায়। এমিলির কাছ থেকে জামা কাপড় নিয়ে সে আবার স্নানের ঘরের দিকে গেল। এখনও তার চলাফেরা সমস্তই যেন ঘুমন্ত ইঞ্জিনের মতো—তার চেতনার জানালা যেন বাইরের পৃথিবীর দিকে রুদ্ধ।

এমিলি টেবিলের ওপর এবার স্বামীর রাত্রের খাবার সাজিয়ে রাখছে। গরম স্টু, কিছু সিদ্ধ-করা আলু আর এক কাপ চা। পিনেগার স্নানের ঘর থেকে সাজপোশাক করে ফিরে এসে টেবিলে খেতে বসে জিমির দিকে চেয়ে বললে, "আপনি তো এ অঞ্চলে আগে কখনো আসেননি, না ?—" পিনেগারের গলায় একটু বাড়াবাড়ি রকম লৌকিকতার সুর, তার দৃষ্টিতে সেই সঙ্গে কেমন একটু অপ্রসন্নতা।

জিমি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "না, কোনো দিনই আসিনি।"

পিনেগার খেতে আরম্ভ করে আবার জিগগেস করলে, "অনেক দূর থেকে আসছেন বোধ হয় ?" থালার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার খাবার ধরন দেখে কিন্তু মনে হল, জিমি সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। কিম্বা হয়তো এমনও হতে পারে জিমি সম্বন্ধে তখনও সে সতর্ক, মনে মনে কিছু একটা ভাবছে। জিমিও সতর্কভাবে উত্তর দিলে, "আসছি লণ্ডন থেকে।"

"লণ্ডন !" পিনেগারের স্বরে যেন একটু বিস্ময়, তবু থালার ওপর থেকে তখনো সে মুখ তোলেনি।

এমিলি এবার নীরবে একটি চেয়ারে এসে বসল, তার এই বসাটা যেন কোনো অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ।

পিনেগার চা-টা নাড়তে নাড়তে জিগগেস করলে, "এ অঞ্চলে আসার কারণ ?"

জিমি সোফার ওপর অস্বস্তির সঙ্গে একটু নড়ে-চড়ে বসে বললে, "ও ! আমি মিসেস্ পিনেগারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

এবারও জিমির দিকে না চেয়ে পিনেগার জিগগেস করলে, "আপনাদের তাহলে আগেই আলাপ ছিল ?"

"আগে ছিল না, এখন হয়েছে।"

জিমি আরও ব্যাখ্যা করে বললে, "আজ সন্ধ্যার আগে মিসেস্ পিনেগারকে আমি কোনো দিন দেখিনি। আমি "কমেণ্টেটার"-এর

সম্পাদক। মিসেস্ পিনেগার আমার কাগজে কয়েকটি কবিতা পাঠান, আমার সেগুলি ভালো লাগে এবং আমি ওঁকে সেকথা জানাই। তারপর আমার এখানে আসতে ইচ্ছা হয়, উনিও রাজী হন। তাই এসেছি।"

পিনেগার বড় একটা রুটির টুকরো কেটে মুখে পুরে, এতক্ষণ বাদে জিমির দিকে সোজা তাকিয়ে বললে, "ওর কবিতা তাহলে আপনার ভালো লেগেছে? আপনার কাগজে ছাপছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, ছাপবো বলেই ঠিক করেছি।"

"আমি ওর একটি ছাড়া আর কোনো কবিতা পড়িনি—সেই কবিতাটি, যাতে এক খাদের শ্রমিকের কথা আছে। তার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে বলেই ওর ধারণা তাকে ও সম্পূর্ণ ভাবে চেনে।"—পিনেগারের গলার স্বরের কর্কশতার সঙ্গে কঠিন একটু বিদ্রূপের সুর। জিমি চুপ করে রইল। পিনেগারের গলার স্বরের কর্কশতা তাকে কেমন যেন সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। পিনেগার আবার বললে, "কমেনটেটার কাগজটার সঙ্গে আমার নিজের বিশেষ বনে না। আমার মনে হয় কাগজটার যাবার কোন ঠিকানা নেই তবু শুধু মিছিমিছি অনেক রাস্তা ঘুরে হায়রান।"

"হয়তো তাই," জিমি উত্তর দিলে, "কিন্তু রাস্তাটাতে তো মজা আছে! আমি তো দেখি এখন কারুরই কোনো ঠিকানা নেই—অন্তত কোনো কাগজের নয়।"

পিনেগার উত্তর দিলে, "তা বলতে পারি না। লিবারেটারে অন্তত কিছু খবর থাকে—জ্যানস্-এ ভাববার কিছু কথা। লোকে যে সব বড় বড় ভাবের কথা বলে, তাতে কি যে লাভ তা তো আমি কিছুই বুঝি না। সে সব দিয়ে কোথাও পৌছান যায় না।"

জিমি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, "কিন্তু কোথাই বা আপনি যেতে চান? খনির চাকরিতে উন্নতির কথা যদি বলেন তাহলে অবশ্য ভালো কথা। চেষ্টা করে উন্নতিই করুন। কিন্তু জীবনে কোথাও পৌছাবার

কথা যদি বলেন তখন অন্তত কি নিয়ে কথা বলছেন, তা জানা দরকার।"
পিনেগার হঠাৎ শান্ত ও কঠিন স্বরে বললে, "আমি মানুষ, কেমন, মানুষ কিনা?"
জিমি সত্যই একটু বিরক্তির সুরে বললে, "হ্যাঁ, মানুষ, তাতে হয়েছে কি? আপনি কি বলতে চান?"
পিনেগার গম্ভীর কর্কশ স্বরে ধীরে ধীরে বললে, "আমায় দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতে কাউকে দেব না, একথা বলবার আমার অধিকার নেই?"
"নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আসলে এ কথার কোনো মানে হয় না। স্বয়ং রাজা থেকে আরম্ভ করে আমাদের সকলকে দিয়েই কাজ বাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই যে আপনি পুডিং খাচ্ছেন, এও আপনার স্ত্রীকে এবং আরও শত শত লোককে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিয়ে।"
"আমি জানি, তা আমি জানি। কিন্তু তাতে কোনো কিছু আসে যায় না। আমাকে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতে আমি দেব না।"
জিমি হতাশার ভঙ্গী করে বললে, "বেশ, দেবেন না, কিন্তু এটা কথার কথা মাত্র।"
পিনেগার অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে তার চেয়ারে বসে রইল। তার মুখ কঠিন। তার চেতনায় কাঁটার মতো কি যেন একটা বিঁধে আছে। গায়ে বিঁধে থাকা কাঁটার ওপর চামড়ায় যেমন কখনো কখনো কড়া পড়ে শক্ত হয়ে যায়, তেমনি সে যেন তার মনের ভেতরকার সেই কাঁটার ওপর কড়া পড়িয়ে দিতে চাইছে। "আমায় দিয়ে সবাই শুধু কাজই বাগিয়ে নেয়। খাদে আমায় দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেয়—আর তার বদলে যাই হোক মজুরি দেয় একটা। বাড়িতেও আমাকে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেওয়া হয়, আর আমার স্ত্রী এমন করে টেবিলে খাবার ধরে দেয় যেন আমি দোকানে কোনো খদ্দের এসেছি।"
"কিন্তু কি আপনি আশা করেন?" জিমি জিগগেস করলে।

"কি আমি আশা করি? কিছুই না। কিন্তু আমি বলছি—"জিমির দিকে সোজা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে পিনেগার বললে, "আমিও কোনো কিছু সইতে রাজী নই।" পিনেগারের চোখে এমন একটা কঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যে জিমি আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে বললে, "কি আপনি সইতে চান না তা যদি আপনি বলেন—"

জিমিকে বাধা দিয়ে পিনেগার বলে উঠল, "আমি চাই না যে আমার স্ত্রী কবিতা লেখে আর আদের সে কখনো দেখেনি এমন সব লোককে কবিতা পাঠায়। আমি বাড়ি এলে ফুটোকরা পাথরের দেয়ালের মতো মুখ করে আমার স্ত্রী রানী বোডিসিয়ার মতো বসে থাকবে তা আমি চাই না। তার কি হয়েছে আমি জানি না, সে কিন্তু নিজেকেই চেনে না। তবু সে যা খুশি তাই করে এবং মনে রাখবেন আমিও তাই করি।"

জিমি বলে উঠলো, "অবশ্যই।" অবশ্যই যে কেন তা কিছু সে জানে না।

"আমার আর একজন স্ত্রীলোক আছে ও আপনাকে বলেছে?" পিনেগার জিগগেস করলে।

"হ্যাঁ বলেছে।"

"কেন আছে শুনুন। খাদে নেমে রোজ কম বেশি আটঘণ্টার গোলামি যদি আমায় করতে হয়, তা হলে আমিও চাই যে আমার কাছে কেউ নির্বিচারে ধরা দেবে।"

জিমি একটু ভেবে বললে, "আপনার স্ত্রী আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এই যদি আপনি চান তাহলে বলব সমস্যা তো এইখানেই। যে আপনার কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত এমন মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত।"

জিমির মুখ থেকে এমন কথা অবশ্য আশ্চর্য। সে যেন পাদ্রি সাহেবের মতো গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে চলেছে। তার নিজের জীবনে ক্ল্যারিসার সেই অন্তর্ধানের কথা বেমালুম গেছে ভুলে।

"আমি এমন স্ত্রী চাই যে আমায় খুশি করতে চাইবে," পিনেগার বললে।

এতক্ষণ বাদে এমিলি প্রথম কথা বললে, কঠিন স্বরে জিগগেস করলে, "আর কেউ হোক না হোক তুমিই শুধু খুশি হবে তারই বা কি মানে আছে ?"

"আমার মেয়ে আমায় খুশি করতে চায় কিন্তু তার মা তাকে তা দেয় না। তা ছাড়া মেয়েদের পরস্পারের যোগ থাকেই।" জিমির দিকে ফিরে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিনেগার বললে, "জেনে রাখুন, যে স্ত্রীলোক আমায় খুশি করবে এবং খুশি করবার জন্যে উৎসুক থাকবে তাকেই আমি চাই। নিজের বাড়িতে তাকে যদি না পাই তাহলে বাইরে তাকে খুঁজে বার করব।"

মিসেস্ পিনেগার বললে, "আশা করি সে তোমায় খুশি করে ?"

"হ্যাঁ করে," উত্তর দিলে পিনেগার।

"তাহলে তার সঙ্গে গিয়ে বাস করলেই তো পার।"

পিনেগার ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, "কেন তা করি না জান ? কারণ আমার নিজের সংসার আছে। আমার বাড়ি আছে, সঙ্গিনী হিসেবে যেমনই হোক, স্ত্রী আছে একজন, আর আছে আমার মেয়ে। এ সংসার আমি ভাঙবো কেন ?"

এমিলি হিংস্র ভাবে বলে উঠল, "আর আমার কথাটা ভেবেছ ?"

"তোমার কথা ? তোমার সংসার আছে, মেয়ে আছে, তোমার জন্যে খেটে রোজগার করে এমন একজন স্বামী আছে। যা চাও তাই তুমি পেয়েছ। যা ইচ্ছে হয় তাই তুমি কর।"

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে এমিলি বললে, "তাই করি কি ?"

"হ্যাঁ বাড়ির সামান্য কাজকর্ম ছাড়া তোমার যা খুশি তাই তুমি কর। তুমি যদি যেতে চাও যেতে পার। কিন্তু আমার বাড়িতে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তার অমর্যাদা তুমি করতে পার না। এখানে বাইরের লোক তুমি আনতে পারবে না, বুঝেছ ?"

"তোমার বাড়ির মর্যাদা তুমি রাখ ?" এমিলি জিগগেস করলে।
"হ্যাঁ, রাখি। আমার খুশি করে এমন কারুর কাছে আমি যাই বটে কিন্তু তোমাকে তার জন্যে কিছু থেকে বঞ্চিত করি না। আমি শুধু চাই যে গৃহিনী হিসেবে তুমি তোমার কর্তব্য কর।"
"তোমার পিঠ ধুয়ে দেওয়া পর্যন্ত!" এমিলির স্বরে কঠিন বিদ্রূপ। জিমির কাছে কিন্তু কথাটা একটু যেন ইতর মনে হল।
"হ্যাঁ, পিঠ ধুয়ে দেওয়া পর্যন্ত, পিঠটা যখন ধোয়া দরকার।" পিনেগার জবাব দিলে।
"কেন, আর একজন যিনি আছেন, তিনি পারেন না ?"
"এটা আমার বাড়ি।" পিনেগার জোরের সঙ্গে বললে।
এমিলি ক্ষিপ্তের মতো একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গী করে থেমে গেল। জিমি সভয়ে নীরবে বসে রইল। খনির এই মজুরের স্তব্ধতার অন্তরালে, অটল সঙ্কল্প আর তীব্র আক্রোশের প্রচণ্ডতা সে যেন অনুভব করতে পারছে। পিনেগারের রোগা লম্বা মুখের হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, সুকঠিন, অনমনীয় পুরুষের হাড। মনে হয় যেন দুর্ভেদ্য জীবন্ত কংকাল ও করোটিতে মানুষের আত্মা কেমন করে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।
চশমার আড়ালে সে অন্তমুখী দৃষ্টি নিয়ে অক্সফোর্ডের ভঙ্গীতে ভারি গলায় বললে, "শুনুন, আপনি বলছেন মিসেস্ পিনেগার স্বাধীন, যা খুশি তাই করতে পারেন। তাহলে আমার সঙ্গে এখুনি উনি যদি চলে যান, আপনার কোনো আপত্তি নিশ্চয়ই নেই।"
পিনেগার অবাক হয়ে জিমির দিকে চেয়ে রইল। তার পর গভীর অবিশ্বাসের স্বরে বললে, "ও কি যেতে চায় ?" এমিলি স্বামীর এই অহমিকায় ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসলে। সে যে স্বামীর চেয়ে এই আর একজনকে পছন্দ করতে পারে এটা পিনেগারের কাছে অবিশ্বাস্য, এমিলি বুঝতে পারলে।

জিমি বললে, "সে চায় কি না আপনিই তাকে জিগগেস করুন। কিন্তু এই জন্যেই আমি এখানে এসেছি, ওকে আর মেয়েটিকে নিয়ে আমার সঙ্গে গিয়ে থাকতে বলবার জন্যে।"

"ওকে কখনো না দেখেই এই কথা জিগগেস করবার জন্যে আপনি এসেছেন?" পিনেগার রীতিমতো বিস্মিত।

জিমি সজোরে মাথা নেড়ে বললে, "হ্যাঁ, ওকে না দেখেই।"

পিনেগার এবার স্ত্রীর দিকে ফিরে দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতার সুরে বললে, "তোমার কাব্যের জালে এবার বড় মজার মাছ পড়েছে।"

স্বামীর এই ঘনিষ্ঠ তাচ্ছিল্যের স্বর এমিলির সব চেয়ে অসহ্য। সে ঝংকার দিয়ে উঠলো, "তুমি নিজে কি মাছ ধরেছ? আর ধরেছই বা কি দিয়ে?"

"পাখি ধরবার আঠা দিয়ে," পিনেগারের মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি।

খানিকক্ষণ কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। সবাই যেন কিসের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। শেষে পিনেগারই তার স্ত্রীকে জিগগেস করলে, "কি উত্তর তুমি একে দিয়েছ?"

"আমি বলেছি হ্যাঁ," শান্ত স্বরে এমিলি জবাব দিলে। দূরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে পিনেগার অনেকক্ষণ বসে রইল। মনে হল তাঁর নিজের হৃদয় থেকে কি যেন দূরে উড়ে চলে যাচ্ছে আর সে স্থির হয়ে তাই দেখছে। কিন্তু কোনো ভাবাবেগকে প্রশ্রয় সে দেবে না।

পরম ধার্মিক পাদ্রিসাহেবের ভঙ্গীতে জিমি বললে, "আমার বিশ্বাস এতে সব দিক দিয়ে ভালোই হবে।" একটু অস্বস্তির সঙ্গে সে আবার জড়িত স্বরে বললে, "জেনকে যদি ও নিয়ে যেতে চায় তা হলে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই? আমি কথা দিচ্ছি আমি ওর জন্য যথাসাধ্য করব।"

পিনেগার এমন ভাবে জিমির দিকে চাইল, যেন সে অনেক, অনেক

দূরে। জিমি সে দৃষ্টিতে একটু যেন কেঁপে উঠল। সে বুঝতে পারল যে পিনেগার নির্মম ভাবে নিজের হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

পিনেগার বললে, "আমি তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। ও যা খুশি করতে পারে।"

এমিলি বলে উঠল, "স্বার্থপরতা নয়—একেই বলে অপত্যস্নেহ।"

পিনেগার তার দিকে ফিরে তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর খানিক চুপ করে থেকে বললে, "আমি তোমাকে যা খুশি করবার স্বাধীনতা দিয়েছি। আর আমার কাছে কিছু প্রাপ্য তোমার নেই।"

তিক্ত কণ্ঠে এমিলি বললে, "যা খুশি করবার স্বাধীনতাই বটে।"

জিমি ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, বেশ রাত হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সরাইখানায় তার জায়গা নাও মিলতে পারে। পরদিন সকালে আসবে বলে সে বিদায় নিলে।

আবার সেই কালো রাত্রি-শাসিত দেশের অন্ধকার আর কাদা। তারই ভেতর দিয়ে সে সরাইখানার দিকে হেঁটে চলল। মনে তার অদ্ভুত একটা উল্লাস, কিন্তু তারই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও যেন মিশে আছে। তবে একটু আশঙ্কার আভাস না থাকলে সে যেন কোনো দিনই সম্পূর্ণ উল্লসিত হতে পারে না। যে দুইটি প্রাণীকে ঐ বাড়িতে সে রেখে এসেছে, সশঙ্কচিত্তে তাদের কথা সে ভাবতে লাগল। বিরোধের কি ভয়াবহ তীব্রতা! সে নিজে কোনো বিষয়ে তীব্রতা সহ্য করতে পারে না। আগে থাকতেই সে হার স্বীকার করে। এমিলিকে এমনি ভাবেই সে চালিয়ে নিতে পারবে। এমিলি! এ নামটা উচ্চারণের অভ্যাস তার করা দরকার। এমিলি! এমিলিয়া যেন একটু বাড়াবাড়ি। এমিলি বলেও কোনো নাম অবশ্য সে কখনো পায়নি।

সত্যই তার অত্যন্ত ভয় করছিল, সেই সঙ্গে কেমন একটা উল্লাস। সে যেন মস্ত বড় একটা কিছু করছে। মেয়েটির সঙ্গে সত্যই যে সে প্রেমে

পড়েছে এমন নয়। কিন্তু তবু তাকে ঐ লোকটির কাছ থেকে সে নিয়ে যেতে চায়। এই দুঃসাহসিকতাই তাকে প্রলুব্ধ করে। সত্যই সে উল্লসিত বোধ করে—পৌরুষ গর্বের একটা উল্লাস।

কিন্তু পরের দিন সকালে যখন সে পিনেগারদের বাড়িতে ফিরে গেল, তখন সে অনেকটা দমে গিয়েছে। অন্ধকার মেঘলা দিন, ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। গাছ-পালা রাস্তা সব কিছুরই কেমন একটা বিষন্ন মলিন চেহারা। বাড়িগুলো কেমন কালচে দেখাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন মেঘে ঢাকা আকাশের তলায় শুধু চারধারের খনির নানা রকম শব্দ আর কয়লার গুঁড়োর গন্ধ। মনে হয় যেন কোনো পাতাল-পুরীতে আছে।

বেশ একটু অনিচ্ছার সঙ্গে পিনেগারদের খিড়কির দরজায় গিয়ে ঘা দিলে। পেছনের ছোট বাগানটা সেখান থেকে দেখা যায়। কোনো শ্রী তার নেই।

ছোট মেয়েটি তাকে দরজা খুলে দিলে: সেই হালকা রঙের চুল, তপ্ত গাঢ় নীল চোখ, আর রক্তিম গাল দুটি।

"এই যে জেন!" জিমি আদর করে ডেকে ভেতরে নিয়ে ঢুকল। এমিলি টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে সে সত্যই সুন্দর, কিন্তু চামড়া তার তেমন ভালো নয়; যেন যে সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে তার শরীরে তা সয়নি। জিমি তার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে মিষ্টি করে তার নিজের বিশেষ হাসিটি হাসল। এ হাসি দিয়ে অনেক মেয়েকেই সে জয়ের আনন্দের স্বাদ দিয়েছে। কিন্তু সোনা-ছিটানো চোখে এমিলি যে ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল তাতে এতটুকু করুণার আভাস সে পেল না। হঠাৎ তার মনে হল, কেমন করে, এই মেয়েটির সঙ্গে সে রাত কাটাবে! কিন্তু সঙ্কল্প তার অটুট। যেমন করে হোক সে সফল হবেই।

পিনেগার আগুনের কাছে কাঠের একটা চেয়ারে বসে আছে, পাতলা

রোগাটে চেহারা, শক্ত হাড়গুলো দেহের সব জায়গায় ফুটে বেরিয়েছে। তার দিকে চেয়ে তার কাঁধ যেন আরো কঠিন হয়ে উঠল। এই মানুষটির বিরুদ্ধে তাকে জয়ী হতেই হবে।

"কটার ট্রেনে আপনি যাচ্ছেন!" জিগগেস করলে এমিলি।

"সাড়ে বারোটায়।" বলে জিমি তার দিকে তাকালে। এমিলির চোখেও বিস্ময় ও কৌতূহলের একটা অদ্ভুত সমাবেশ। জিমির দৃষ্টিতে কেমন একটা শিশুসুলভ মন-ভুলান উজ্জ্বলতা আছে। দীর্ঘ পল্লবে ছাওয়া তার চোখের সেই দৃষ্টিতে এমিলিও যেন প্রায় মুগ্ধ—পিনেগারের নীল চোখের ভেতর থেকে যে অনমনীয় আক্রোশ ফুটে বার হয় তা থেকে এই দৃষ্টি এত বেশি আলাদা বলেই হয়তো। স্বামীকে তার সব সময়েই কেমন ভয় করে—তার সেই শীর্ণতা, তার সেই কঠিন অনমনীয়তা সবই তার কাছে ভয়ঙ্কর। আর এই চোখে ঠিক যেন কাবুলী-বেড়ালের মতো উজ্জ্বল, মোহময় দৃষ্টি; সে দৃষ্টিতে এক দিকে যেমন দুঃসাহস আর এক দিকে তেমনি সঙ্কোচ। সে দৃষ্টির আকর্ষণ অদ্ভুত। এক মুহূর্তে এমিলি যেন সে দৃষ্টির কুহকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

"যাবার আগে খেয়ে যাবেন তো?" এমিলি জিগগেস করলে।

জিমি সভয়ে বলে উঠল, "না।" পিনেগারের সঙ্গে খেতে তার একান্ত অনিচ্ছা। সে আবার বললে, "না, সকালে আমার খুব বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। শেফিল্ডে গাড়ি বদল করবার সময় আমি স্যাণ্ডুইচ্ খেয়ে নেব, সত্যি বলছি!"

এমিলিকে কেনা-কাটার জন্যে দোকানে যেতে হবে। দোকান থেকে ফিরে এসেই সে জিমির সঙ্গে স্টেশনে যাবে জানালে। তখন সবে এগারোটা বেজেছে।

পিনেগার একটা খবরের কাগজ নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছে। কোনো দিকে যেন তার লক্ষ্য নেই। জিমি তাকে উদ্দেশ করে বললে, "কিন্তু

শুনুন, আমাদের এ ব্যাপারটার একটা মিমাংসা করা দরকার। আমি চাই মিসেস্ পিনেগার জেনকে নিয়ে আমার কাছে এসে থাকে। সেও আসতে রাজী। সুতরাং আপনার মনে হয় না কি যে আজই তারা আমার সঙ্গে গেলে ভালো হয়। সামান্য দু'একটা জিনিসপত্র একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে এলেই তো চলে। অকারণে ব্যাপারটাকে বেশি দূর গড়াতে দিয়ে লাভ কি?"

পিনেগার উত্তর দিলে, "আমি তো বলেছি সে যা খুশি করতে পারে, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

জিমি এমিলির দিকে ফিরে বললে, "বেশ তাহলে তাই কেন কর না। এখনই আমার সঙ্গে যেতে পার না কি?" জিমির গলার স্বরে স্পষ্ট একটা আকুলতা। সে যেন সত্যই এমিলির কাছে করুণা ভিক্ষা করছে।

"তা হয় না, আজ আমি যেতে পারি না," এমিলি মনস্থির করেই উত্তর দিলে।

"কিন্তু সত্যি কেন পার না? আমার সঙ্গে এখন গেলেই তো হয়। তোমার তো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।"

"ও স্বাধীনতার দৌড় বেশি নয়। তা ছাড়া আজকে কোনোও রকমেই আমার যাওয়া হয় না," এমিলি যেন একটু রূঢ় ভাবেই বললে।

জিমি তার সেই নিজস্ব অদ্ভুত মিনতির সুরে বললে, "তাহলে তুমি কবে নাগাদ আসতে পারবে? বুঝতে পারছ না যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।"

এমিলি হঠাৎ যেন বলে ফেললে, "আমি সোমবারে আসতে পারি।"

"সোমবারে!" চশমার আড়ালে জিমির চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ভয়-চকিত। তারপর দাঁতে যেন দাঁত চেপে মাথা নেড়ে সে বললে, "বেশ তাই, সোমবারেই এস, আজ শনিবার।"

"কিছু যদি মনে না করেন, আমার দু'একটা জিনিসপত্র কিনতে

দোকানে বেরুতে হবে। ফিরে এসে আমি আপনার সঙ্গে স্টেশনে যাব।”
জেনকে তাড়াতাড়ি একটা ফিকে নীল রঙের কোট আর ফিতে বাঁধা টুপি পরিয়ে নিজে একটা কালো টুপি ও ভারি কালো কোট পরে এমিলি বেরিয়ে গেল। জিমি অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে পিনেগারের সামনে বসে রইল। পিনেগার চশমা চোখে দিয়ে কাগজ পড়ছিল। চশমাটা চোখ থেকে খুলে, সেবার গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কি যেন একটা বললে। জিমি সায় দিয়ে বললে, “হ্যাঁ, যাই বলুন যুক্তি মানাই সবচেয়ে ভালো। গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে লেবার গভর্ণমেণ্টই একমাত্র ন্যায্য গভর্ণমেণ্ট। যদিও আমার নিজের মতে সব গভর্ণমেণ্টই সমান।”
“হতে পারে,” পিনেগার বললে, “কিন্তু আজ হোক কাল হোক কিছু একটা চরম হয়ে যাওয়া দরকার।”
“কিছু কেন, অনেক কিছু,” জিমি বললে। তারপর একেবারে চুপ হয়ে গেল।
অনেকক্ষণ বাদে পিনেগার জিগগেস করলে, “আপনার আগে কখনো বিয়ে হয়েছে?”
“হয়েছে, বিবাহ-বিচ্ছেদও হয়ে গেছে।”
পিনেগার জিগগেস করলে, “আমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ করি আপনি বোধহয় চান?”
“হ্যাঁ, তাই—মানে—তাই তো সব দিক দিয়ে ভালো—”
পিনেগার বললে,“বিচ্ছেদ হোক বা না হোক আমার কাছে সবই সমান। আমি আর কারুর সঙ্গে থাকব বটে কিন্তু বিয়ে আর কখনো করব না। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তবে ও যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় আমি বাধা দেব না।”
“সেই তো সত্যিই ভালো,” জিমি বললে।

অনেকক্ষণ কারুর মুখে কোনো কথা নেই। এমিলি ফিরে এলে জিমি যেন স্বস্তি পায়। হঠাৎ পিনেগার বললে, "আপনি আমার কাছে একটা উপলক্ষ্য। কিছু একটা ভেঙ্গে যাওয়া দরকার ছিল। আপনি সেই ভাঙ্গবার উপলক্ষ্য।"

এই রোগাটে আত্মনিমগ্ন লোকটির মধ্যে কোথায় এমন একটা দৃঢ়তা আছে যে জিমির তার সঙ্গে এক ঘরে বসে থাকতেও কেমন যেন লজ্জা লাগছে। এক দিকে সে একটু মোহিত বললেও হয়। কিন্তু আর এক দিকে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না বলেই জিমি যেন তাকে ঘৃণা করে।

একটু হেসে জিমির দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে পিনেগার বললে, "আমার স্ত্রী কি ভাবে জানেন? সে ভাবে সে আমায় ছেড়ে গেলে আমি একেবারে গোল্লায় যাব। আমার দুর্গতির আর শেষ থাকবে না, এই তার শেষ আশা।"

কি যে বলা উচিত কিছু ভেবে না পেয়ে জিমি মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। পিনেগারও কিছুক্ষণ একেবারে নীরব। জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে সে যেন অসীম ধৈর্য নিয়ে বহুকালের কোনো বন্দীর মতো কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ বাদে আবার সে বললে, "আমার স্ত্রীর ধারণা কোথায় যেন উজ্জ্বল এক ভবিষ্যত তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে ভবিষ্যতের দরজা আপনিই যেন খুলে দেবেন।" আবার পিনেগারের চোখে সেই কৌতুকের হাসি দেখা গেল।

এই হাসি জিমিকে সত্যই মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে তার কুহকে পড়বার জন্যে তার রাগও হয়। কারণ জিমির বাসনা পুরুষদের মধ্যে সেই হবে সব চেয়ে শক্তিমান পুরুষ, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ। অথচ এই রোগাটে অদ্ভুত লোকটির কাছে সে কেমন যেন ছোট হয়ে যায়। যেখানেই থাকুক এই লোকটির আত্মনিমগ্ন স্তব্ধতার প্রভাব যেন

সমস্ত ঘর ভরে থাকে, তা কাটিয়ে ওঠা যায় না। জিমি সেইজন্যেই তাকে ঘৃণা করে।

অনেকক্ষণ বাদে এমিলি ফিরে আসবার পর জিমি তার সঙ্গে বেরুবার আগে পিনেগারের করমর্দন করে বিদায় নিলে। পিনেগারের নীল চোখে সেই অদ্ভুত সকৌতুক দৃষ্টি। জিমি জানে সে দৃষ্টি কোনোদিন সে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

স্টেশন পর্যন্ত তারা হেঁটে গেল। এই হেঁটেই যাওয়াটা যেন যাকে তারা ফেলে এসেছে তার বিরুদ্ধে দুজনের ষড়যন্ত্র। সোমবারে কি কি করতে হবে তারই ব্যবস্থা তারা করে ফেললে। এমিলি সকালে ন'টার ট্রেনে আসবে, জিমি মার্লবোন স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে সেণ্ট জনস্-উডের বাড়িতে নিয়ে আসবে। সেখানে জেনকে নিয়ে তাদের নতুন জীবন আরম্ভ হবে। হয় পিনেগার নয় এমিলি, যেই হোক প্রথম উদ্যোগী হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করবে। তারপর তাদের বিয়ের ব্যবস্থা। ট্রেনে বাড়ি যেতে যেতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা প্রচণ্ড উন্মাদনার স্বাদ জিমি যেন পাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন মস্ত বড় দুরন্ত দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছে। সে অবশ্য এত বেশি উত্তেজিত যে ফলাফল বিচার করবার ক্ষমতা তার নেই। শুধু যত লণ্ডনের কাছে ট্রেন এগুতে লাগল তত তার মন দমে যেতে লাগল একেবারে। সে যেন ভয়ানক ক্লান্ত।

তা সত্ত্বেও রাত্রের খাবারের পর সে সেভার্ণের কাছে গিয়ে সব কথা বলে ফেলল।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সেভার্ণ বললে, "আহাম্মক কোথাকার! এ তুমি কেন করতে গেলে?"

একটু কেমন সঙ্কুচিত হয়ে জিমি বললে, "করলাম, কারণ আমি তাই চাই।"

"হা ভগবান! মেয়েটির কথা শুনে তো মেডুসার মাথা মনে পড়ছে। তোমার বুকের পাটা আছে বলতে হবে! ক্ল্যারিসার কথা মনে আছে?"
"ও! কিন্তু এ ব্যাপার একেবারে আলাদা।"
"হুঁ, তার নাম এম্মা না ঐ ধরনের কিছু, কেমন?"
জিমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বললে, "এমিলি।"
"যাই বল, তুমি আসলে একটি আহাম্মক, সুতরাং আহাম্মকের মতো কাজ করে যাওয়াই তোমার পক্ষে ঠিক। সাধ করে, একটি করে মেয়েকে কেন্দ্র করে নিজের জীবনে তুমি ঝড় তোলাও। তবে যতদিন উইপিং উইলোর মতো, সে ঝড়ে নুয়ে কাটাতে পারবে ততদিন উপড়ে যাবার ভয় তোমার নেই। তোমার ভালো হোক। তবে গ্রেচনের মতো ভালোবাসায় আত্মহারা মেয়ে খুঁজতে গিয়ে, তুমি যা করলে তাতে সত্যি বলতে হয়, তুমি ধন্য।"
সেভার্ণের আর কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু জিমি যখন বাড়ি গেল তখন তার পা রীতিমত কাঁপছে। রবিবার সকালে সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। কিন্তু কি করে শুরু করবে প্রথমটা ভেবে পেল না। ডিয়ার মিসেস্ পিনেগার লিখলে বড্ড বেশি দূর করে দেওয়া হয়, আবার শুধু ডিয়ার এমিলি লেখবার মতো ঘনিষ্ঠতাও এখন হয়নি। সুতরাং ডিয়ার-টিয়ার কিছু না দিয়েই সে সোজা শুরু করে দিলে, "তুমি আসবার আগে একটা কথা তোমায় জানাতে চাই। আমরা হয়তো ভালো করে সবদিক ভেবে চিন্তে না দেখেই একটা সঙ্কল্প করে ফেলেছি। তোমার কাছে আমার অনুরোধ এই যে আসবার আগে তুমি শেষবার ভালো করে সব দিক ভেবে নাও। নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে এস না। যদি এতটুকু দ্বিধা মনে কোথাও থাকে, তাহলে একেবারে যে কোনো দিকে হোক নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।
"আমার দিক থেকে বলছি, তুমি না এলেও আমি ভুল কিছু বুঝব না। তবে আমাকে একটা টেলিগ্রাম কোরো। যদি তোমরা আস, তাহলে তোমাদের

সাদরে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য আমি তৈরি থাকব। তোমারই জে, এফ্‌।"

একজন লোককে যাতায়াতের ভাড়া আর তার ওপর উপরি তিন পাউণ্ড দিয়ে সে রবিবারে চিঠিটা পৌঁছে দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলে। সন্ধ্যায় লোকটি ফিরে এল। চিঠি দেওয়া হয়েছে, কোনো উত্তর নেই।

বিশ্রী রবিবারের রাত : সোমবারের উৎকণ্ঠিত সকাল।

একটা টেলিগ্রাম : "সাড়ে বারটায় জেনকে নিয়ে মার্লবোন পৌঁছোব। তোমারই এমিলি।"

দাঁতে দাঁত চেপে জিমি স্টেশনে গেল। কিন্তু তারপর এমিলি তার দিকে চেয়ে আছে টের পেয়ে যখন সে ফিরে তাকাল, যখন সে এমিলিকে জেনের হাত ধরে ধীরে ধীরে আসতে দেখল, তখন কালো ভুরুর তলায় এমিলির জ্বলন্ত চোখের উত্তপ্ত দৃষ্টিতে তার মনে হল সে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এমিলির হাত ধরবার সময় তার মুখে ঈষৎ বিবর্ণ হাসি দেখা গেল। তবু সে বললে, "তুমি এসেছ বলে আমি যে কি খুশি হয়েছি কি বলব।"

ট্যাক্সিতে বসবার পর এমিলির জন্যে এমন একটা বিকৃত অথচ তীব্র কামনা সে অনুভব করলে যে তার মনে হল, সে কামনার প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে তার কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছে এমিলির মধ্যে সেই আর একটি লোক এখানেও কেমন করে উপস্থিত! খাঁটি মদের মতো এই উপস্থিতি যেন তার মনে নেশা ধরিয়ে দিলে। সেই লোকটি! কি ভাবে কোন দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্ম রূপে সে—সেই স্বামী যেন সত্যই শরীরী হয়ে তাদের সঙ্গে আছে। তারই জ্যোতির্মণ্ডলে যেন এমিলির সমস্ত গতিবিধি নিবদ্ধ। তার সঙ্গে এমিলির উদ্বাহবন্ধন ভাঙবার নয়।

নির্জলা মদের মতো এই অনুভূতি জিমিকে যেন মাতাল করে তুললে। তার কাছে আগে কার সবচেয়ে বড় পরাজয় হবে, এমিলির, না তার স্বামীর?

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

গোলাপ বাগানে ছায়া

ছেলেটিকে মাথায় একটু খাটোই বলা যায়। সমুদ্রের ধারে একটি ছোট সুন্দর বাড়ি, তারই জানালায় ছেলেটি একটি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছে। খবরের কাগজ পড়া অবশ্য শুধু নামে। সকাল তখন প্রায় সাড়ে আটটা, বাইরে সকালের রোদে গোলাপগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন উস্কে-দেওয়া ছোট ছোট আগুনের মালসা। টেবিল থেকে দেয়াল-ঘড়ি, দেয়াল-ঘড়ি থেকে তার নিজের বড় রূপোর পকেট-ঘড়িটার দিকে ছেলেটি চেয়ে দেখলে। তার মুখে যেন একটু কাঠিন্যের রেখা দেখা গেল—ধৈর্যের কাঠিন্য। এবার উঠে পড়ে সে ঘরের দেয়ালে টাঙানো তৈল-চিত্র-গুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। দেয়ালে হরিণের একটা ছবি, বে-কায়দায় পড়ে হরিণ রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই ছবিটার দিকে ভ্রুকুটির সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল। তারপর পিয়ানোটা খোলবার চেষ্টা করলে কিন্তু পিয়ানোর ডালাটা চাবি-বন্ধ। এবার ঘরের একটা ছোট্ট আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেয়ে সে গোঁফে একটু তা দিয়ে নিলে—চোখে এবার তার কৌতূহলের উজ্জ্বলতা। চেহারাটা তার মন্দ নয়। গোঁফে সে আবার পাক দিলে। দেখতে ছোট-খাট হলে কি হবে, চেহারাটা তার তেজী, চনবনে। আয়না থেকে নিজের মুখ দেখে নিজের প্রতি করুণার সঙ্গে বেশ একটু তৃপ্তি নিয়েই সে অন্য দিকে ফিরল।

সে এবার বাগানে বেরিয়ে এল। শরীর যেমন তার মজবুত পোশাকটাও তেমনি নতুন, চকচকে ও মানানসই। উঠোনের একটা আপেল গাছ খানিকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে সে আর একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেটে লাল ফলে ভর্তি একটা বাঁকা আপেল গাছ তার কাছে আরও

বেশি ভালো লাগলো। ফিরে তাকিয়ে একটা আপেল পেড়ে নিয়ে বাড়িটার দিকে পেছন ফিরে তাতে একটা কামড় দিলে—ধারালো দাঁতের নিখুঁত একটি কামড়। আশ্চর্যের বিষয় আপেলটা সত্যিই মিষ্টি। আর একটা ফল পেড়ে নিয়ে সে আবার বাগানের দিকে খোলা, শোবারঘরের জানালাগুলোর দিকে তাকালে। হঠাৎ সেখানে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমটা সে চমকে গিয়েছিল, পরক্ষণেই টের পেল যে তার স্ত্রীই জানালা ধরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বামীকে সে লক্ষ্যই করেনি।

ছেলেটি খানিকক্ষণ তার স্ত্রীকে বেশ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলে। দেখতে বেশ সুশ্রী; ছেলেটির চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই মনে হয়। রংটা একটু ফ্যাকাশে কিন্তু বেশ সুস্থ, মুখে কেমন একটা আকুলতা। মেয়েটির চুলগুলি ঘন ও লালচে, কপালের ওপর থেকে থাক-থাক করে সাজান।

মেয়েটি তার স্বামীর জগত থেকে যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে উদাস ভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। এই তন্ময়তা—তার সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য, ছেলেটির কোথায় যেন বিঁধল। গাছ থেকে ক'টা ফল ছিঁড়ে নিয়ে সে জানালায় ছুঁড়ে মারল। মেয়েটি চমকে তার দিকে চেয়ে হেসে উঠে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে এবং প্রায় পরের মুহূর্তেই জানালা ছেড়ে চলে গেল। মেয়েটির হাঁটার দৃপ্ত ভঙ্গীটি চমৎকার, পরনের নরম শাদা মসলিনের পোশাকটিও সুন্দর মানিয়েছে। ছেলেটি স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এবার ভেতরে গেল।

"তোমার জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করছি," বললে ছেলেটি। মেয়েটি ঠাট্টা করে বললে, "অপেক্ষাটা কার জন্যে?—আমার, না সকালের খাবারের? তুমি তো জান আমরা সকাল ন'টার কথা বলেছিলাম। পথের এই ধকলের পর আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমোতে পারবে।"

"আমি তো রোজ সকাল পাঁচটায় উঠি তুমি জান। ছ'টার পর তাই আর বিছানায় থাকতেই পারলাম না। এমন একটা সুন্দর সকালবেলায় বিছানায় পড়ে থাকা, খনির গহ্বরে পড়ে থাকারই সমান।"
"কয়লার খনির কথা তোমার এখানে এসেও মনে হবে তা আমি ভাবিনি।"
মেয়েটি সরে গিয়ে এবার ঘরের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। ছেলেটি আগুনের কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে তার কেমন একটু অস্বস্তি, স্ত্রী সম্বন্ধে আসক্তি ও বিরাগ যেন সে দৃষ্টিতে এক সঙ্গে মিশেছে। ঘরটি যে পছন্দ হয়নি, একটু ভুরু কুঁচকে সে তা বুঝিয়ে দিলে। ছেলেটির হাত ধরে মেয়েটি এবার বললে, "মিসেস্ কোট্‌স্ খাবারের ট্রে আনুক ততক্ষণ চল আমরা বাগানে একটু বেড়াই।"
গোঁফে একবার টান দিয়ে ছেলেটি বললে, "মিসেস্ কোট্‌স্ তাড়াতাড়ি এলে বাঁচি।" মেয়েটি একটু হাসল তারপর ছেলেটির কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে গেল। ছেলেটি তখন পাইপটা ধরিয়েছে।
তারা সিঁড়ি দিয়ে যখন নেমে যাচ্ছে, মিসেস্ কোট্‌স্ ঘরে ঢুকলেন। বয়স অনেক হয়েছে তবুও মিসেস্ কোট্‌স্ এখনও সোজাই আছেন। চেহারাটিও মিষ্টি। তাঁর অতিথিদের ভালো করে দেখবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে ছেলেটি স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের দুজনকে দেখে মিসেস্ কোট্‌সের নীল চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিজের মনেই তিনি বলতে শুরু করেছেন—
"দুজনে ঠিক মাথায়-মাথায়। নিজের চেয়ে মাথায় খাটো হলে মেয়েটি কথ্খনো বিয়ে করত না আমি বলতে পারি। তবে ছেলেটি অবশ্য আর কোনও দিক দিয়ে মেয়েটির সমান নয়!" মিসেস্ কোট্‌সের কথায় ইয়র্কশায়ারের টান। তাঁর নাতনী ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ট্রেটা সাজিয়ে রেখে কাছে এসে বললে, "জান দিদিমা, ঐ ভদ্রলোক আমাদের আপেল খেয়েছেন।"

"খেয়েছে নাকি, সোনা আমার ? খেয়ে যদি খুশি হয়—খাকনা !"
বাইরে ছেলেটি তখন চায়ের পেয়ালার ঠুংঠাং শুনতে শুনতে অধীর হয়ে উঠেছে। যাই হোক খানিক বাদে সত্যিই তাদের খাবার এলো। খানিক নিঃশব্দে খাবার পর ছেলেটি একটু চুপ করে থেকে বললে, "তোমার কি জায়গাটা ব্রিড্‌লিংটনের চেয়ে বেশি পছন্দ হয় ?"
"হয়, অনেক বেশি হয়। তা ছাড়া এ জায়গাটা আমার কাছে অচেনা নয়। আমি এখানে কোনো রকম আড়ষ্টতা বোধ করি না।"
"কতদিন তুমি এখানে ছিলে ?"
"দু বছর।"
ছেলেটি কি যেন ভাবতে ভাবতে খানিক নীরবে আহার করবার পর বললে, "আমি ভেবেছিলাম, নতুন কোনো জায়গায় গেলেই তুমি খুশি হবে।"
মেয়েটি খানিকক্ষণ একেবারে চুপ করে বসে রইল। তারপর সন্তর্পণে যেন পরখ করবার জন্যেই জিগগেস করলে, "কেন বলতো ? তোমার কি মনে হয় আমার এখানে ভালো লাগবে না ?"
ছেলেটি রুটির ওপর পুরু করে মার্মালেড মাখাতে মাখাতে হেসে উঠে বল্‌লে, "আমার তো সেই রকমই আশা।"
এবারেও ছেলেটির কথা গায়ে না মেখে মেয়েটি বললে, "শোন ফ্র্যাঙ্ক, এখানে কিন্তু কাউকে যেন কোনো কথা বলো না ; আমি কে, বা আমি যে এখানে থাকতাম, এসব কোনো কথা এখানে বলবার দরকার নেই। এখানে কারুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না। কেউ যদি আমায় চিনতে পারে তাহলে আর সহজে আমরা ঘোরাফেরা করতে পারবো না।"
"তাহলে তুমি এলে কেন ?"
"কেন ? কেন তা বুঝতে পারছ না ?"
"না, পারছি না। কারুর সঙ্গে যদি দেখাই না করতে চাও তবে আসা কেন ?"

"আমি জায়গাটাই দেখতে এসেছি, লোকেদের নয়।"

ফ্র্যাঙ্ক আর কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটি আবার বললে, "মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের থেকে অনেক তফাৎ। কেন যে আসতে চেয়েছিলাম জানি না কিন্তু তবু এলাম।"

ফ্র্যাঙ্ককে আর এক কাপ কফি তৈরি করে দিয়ে তার স্ত্রী আবার একটু অস্বস্তির সঙ্গে হেসে বললে, "শুধু এখানে আমার কথা কোথাও আলোচনা করো না। আমার আগেকার জীবনের কোনো কিছু আমার বর্তমানের বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়, আমি চাই না।"

আঙুল দিয়ে খুঁটে খুটে মেয়েটি টেবিল-ক্লথের উপরকার খাবারের কণা-গুলো তুলে ফেলতে লাগল। কফি খেতে খেতে তার দিকে চেয়ে ছেলেটি একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "আগেকার জীবনের অনেক কিছু তোমার ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস।"

মেয়েটি টেবিল-ক্লথের দিকে কতকটা অপরাধীর মতোই মাথা নিচু করে তাকাল। তার চোখের এই সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কের আত্মাভিমান যেন খানিকটা তৃপ্ত হল।

আদরের সুরে মেয়েটি বললে, "আচ্ছা বলো, আমি যে কে তা এখানে কাউকে জানিয়ে দেবে না তো?"

ছেলেটি হেসে বললে, "না, দেব না।" সে সত্যিই খুশি।

খানিক চুপ করে থেকে মেয়েটি মাথা তুলে বললে, "আজ সকালটা তুমি একলাই ঘুরে এসো। আমায় মিসেস্ কোট্‌সের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত ছাড়াও অনেক কাজ করতে হবে। দুপুরের খাওয়াটা বরং একটায় এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।"

"কিন্তু মিসেস্ কোট্‌সের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে সারা সকালটাই তোমার লাগবে নাকি?"

"না—তবে কটা চিঠি লিখতে হবে, তা ছাড়া পোশাকে যে দাগটা

লেগেছে সেটাও তুলে ফেলা দরকার। সত্যিই সকালে আমার অনেক কাজ। তোমার একলা বেরুনোই ভালো।"

তার স্ত্রী যে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, ফ্র্যাঙ্কের পক্ষে তা বোঝা কঠিন নয়। তবু স্ত্রী ওপরে চলে যাওয়া মাত্র সে টুপি নিয়ে সমুদ্রের ধারের পাহাড়গুলোর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো ; মনে তার চাপা একটা রাগ।

খানিক বাদে মেয়েটিও বেরিয়ে এল। মাথায় তার গোলাপ-বসানো একটা টুপি, শাদা পোশাকের ওপর একটা লম্বা লেসের স্কার্ফ। একটু ভয়ে-ভয়েই সে তার রঙিন ছাতাটা খুলে নিলে। ছাতার রঙিন ছায়ায় তার মুখ প্রায় তো অর্ধেক ঢাকা পড়ল। পাথর-বসানো যে সরু রাস্তাটা ধরে সে এগিয়ে চললো, সমুদ্রের বহু জেলের পায়ে-পায়ে তা একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছে। নিজের ছাতাটুকুর আড়ালে থেকে, মনে হল, সে যেন তার চারধারের সবাইকে এড়িয়ে যেতে চায়।

গির্জার ধার দিয়ে কিছু দূর যাবার পর রাস্তার ধারে একটা উঁচু দেয়াল দেখা গেল। সে দেয়ালের পাশ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে একটি খোলা দরজার সামনে থামল—অন্ধকার দেয়ালে দরজাটা যেন একটা আলোর ছবি। দরজার ওধারে এক অপরূপ রাজ্য। নীল ও শাদা সমুদ্রের নুড়ি দিয়ে সাজান একটি উজ্জ্বল চত্বর আলো-ছায়ার নক্সায় ঢাকা। আরও দূরে ঘাসে-ঢাকা জমিটা যেন সবুজ শিখার মতো জ্বলছে। একটি 'বে'-গাছের প্রান্ত সেখানে রোদে ঝিকমিক করছে। পা টিপে-টিপে মেয়েটি উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছায়ায় ঢাকা বাড়িটির দিকে তাকাল। বাড়িটির জানালা-গুলোর পরদা নেই, সেগুলো যেন নিষ্প্রাণ অন্ধকার। রান্নাঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। দ্বিধা ভরে এক-পা এক-পা করে পরম আকুলতার সঙ্গে সে দূরের বাগানটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রায় বাড়িটার কোণ বরাবর সে পৌঁছে গেছে এমন সময় বড় গাছ-

গুলোর ভেতর দিয়ে কার ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। লোকটি বাগানের একজন মালী। তার হাতে বেতের একটা চুপড়িতে বড় বড় লাল অত্যন্ত পাকা টঁ্যাপারি। আসতে আসতে মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "বাগান আজ খোলা নেই।" মেয়েটি তখন প্রায় যাবার জন্যে পিছন ফিরেছে। একটু অবাক হয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। খোলা নেই মানে? এ বাগান তো সাধারণের জন্যে নয়? তাড়াতাড়ি কি ভেবে নিয়ে সে জিগগেস করলে, "খোলা থাকে কখন?"

"গির্জার যিনি পাদ্রী তিনি শুক্র আর মঙ্গলবারে দর্শকদের জন্যে খোলা রাখেন।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে মেয়েটি খানিক কি ভাবল। গির্জার পাদ্রী সাধারণের জন্যে এ বাগান খুলে দিচ্ছেন, ভাবতেই যে আশ্চর্য লাগে!

অনুরোধের সুরে মেয়েটি এবার বললে, "কিন্তু সবাই তো এখন গির্জায়, এখানে তো কেউ আসবে না।"

মালী একটু সরে দাঁড়াল। তার চুপড়ির বড় বড় টঁ্যাপারিগুলো এধারে ওধারে একটু গড়িয়ে গেল। মেয়েটিকে চলে যেতে বলতে তার যেন বাধছে। একটু থেমে সে বললে, "নতুন যে রেক্টারি তৈরী হয়েছে গির্জার পাদ্রী সেখানে থাকেন।"

একটু হেসে যেন মালীর মন ভেজাবার চেষ্টা করেই মেয়েটি ভারি মিষ্টি একটি ভঙ্গীর সঙ্গে বললে, "একবারটি গোলাপগুলো উঁকি দিয়ে দেখে যেতে পারি না?"

"তাতে অবশ্য কোনো দোষ নেই। আপনি বেশিক্ষণ থাকবেন না নিশ্চয়ই," বলে মালী রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি এগিয়ে গেল। মালীর কথা আর তার মনে নেই। গতিতে তার ব্যাকুলতা, মুখে কেমন একটা উদ্বেগ। একবার ফিরে সে বাড়িটার দিকে তাকাল। সমস্ত বাড়িটার কেমন একটা বন্ধ্যা চেহারা; যেন সেটা এখনও

ব্যবহার করা হয় কিন্তু বাস তাতে কেউ করে না। মেয়েটির মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। সামনে টকটকে লাল ফুলের একটা রঙীন খিলান, তারই তলা দিয়ে ঘাসের জমিটা পার হয়ে সে বাগানের দিকে গেল। দূরে কোমল নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, সকালের কুয়াশায় ঝাপসা। আরও দূরে সাগর আর আকাশের দুই নীলের মাঝখানে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে তীরের শেষ প্রান্ত-রেখা—কালো পাহাড়ের চূড়ায় প্রসারিত। মেয়েটির মুখে নতুন এক দীপ্তি, বেদনা ও আনন্দের একত্র সমাবেশে সে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তার পায়ের তলা থেকে বাগানটা খাড়া ভাবে অজস্র ফুলের ধাপে ধাপে নিচের ছোট নদী পর্যন্ত নেমে গেছে। ওপর থেকে, যে গাছগুলোয় নদীটি ঢাকা, শুধু তারই অন্ধকার মাথাগুলি দেখা যায়।

সে আবার বাগানের দিকে ফিরল। চারধারে তার উজ্জ্বল ফুলগুলো যেন সূর্যালোকে হাসছে। 'ইউ'-গাছের তলায় একটি কোণে কোথায় একটি বসবার জায়গা আছে সে জানে। রঙিন ছাতাটি মুড়ে ধীরে ধীরে ফুলগুলির ভেতর দিয়ে সে হাঁটতে লাগল। চারধারে তার শুধু অজস্র গোলাপ—কোথাও গোলাপের ঝোপ, কোথাও গোলাপ ঢাকা মাটির ঢিবি, কোথাও বা দেয়াল বা থাম থেকে রাশি রাশি গোলাপ ঝুলছে। মাটির দিকে চাইলে গোলাপ ও অন্যান্য নানা ফুলের এই রঙিন জগত, মাথা তুলে তাকালে চোখে পড়ে নীল সমুদ্র আর সেই কালো পাহাড়ের অন্তরীপ।

ধীরে ধীরে এখানে-সেখানে একটু থেমে-থেমে সে একটা পথ ধরে নেমে চলল—যেন সে তার নিজের অতীতেই ফিরে যাচ্ছে। মখমলের মতো নরম গাঢ় লাল রঙের কটা গোলাপ তার হাতে ঠেকতে সে খানিকক্ষণ সেগুলোর ওপর হাত বুলালো—মা যেমন করে শিশুর হাত ধরে আদর করে। একটু নিচু হয়ে সেগুলোর একটু গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করে সে

আবার অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে গেল। কোথায় আগুনের মতো উজ্জ্বল গন্ধহীন কটা গোলাপ ফুটে আছে। এক দৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে সে খানিক দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে এদের মানেটা খুঁজে পাচ্ছে না। আর এক জায়গায় ফিকে লাল এক রাশ ফুল তার মনে আবার সেই অন্তরঙ্গতার কোমল আবেশ এনে দিলে। অনেকক্ষণ বাগানের এদিক ওদিক সে ঘুরে বেড়ালো—যেন একটা করুণ শ্বেত প্রজাপতি। অবশেষে ছোট একটা ফুলে ঢাকা বাগানের ধাপের কাছে এসে সে থামল। ফুল-গুলির রঙে গন্ধে মনে যেন তার নেশা ধরে গেছে। কি একটা দুর্বোধ উত্তেজনা তার সারা শরীরে। নিজের ভেতর সে যেন আর নেই। বাতাস নয় শুধু যেন অপরূপ এক সুগন্ধই সে প্রতি নিঃশ্বাসে বুকে টেনে নিচ্ছে। শাদা গোলাপের একটা ঝোপের মাঝখানে একটা আসনে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। তার ছাতাটার কড়া লাল রঙ এই গোলাপ-গুলির মধ্যে কেমন যেন বেমানান। একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে সে বসে আছে যেন টের পাচ্ছে তার সত্তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আসছে। সে যেন নিজেই একটা গোলাপ—যে-গোলাপ কিছুতেই সম্পূর্ণ হয়ে ফুটল না, শুধু উৎসুক হয়েই রইল। একটা ছোট মাছি তার হাঁটুর ওপর শাদা পোশাকে এসে বসল। তার মনে হল মাছিটা যেন একটা গোলাপের ওপরই এসে বসেছে। সে যেন সত্যিই রূপান্তরিত।

হঠাৎ নির্মম ভাবে তার চমক ভেঙ্গে গেল। প্রথমে একটা ছায়া এসে পড়ল তার গায়ে, তার পর একটি মূর্তি তার চোখে পড়ল। নিঃশব্দে চটি পায়ে লোকটি কখন এদিকে এসেছে সে দেখতে পায়নি। মধুর আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে এক মুহূর্তে সমস্ত সকালটা তার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কেউ পাছে এসে তাকে কিছু জিগগেস করে এই তার ভয়। লোকটি এগিয়ে আসাতে সে উঠে পড়ল। কিন্তু লোকটিকে ভালো করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল, আবার সে বসে পড়ল।

বয়সে লোকটি যুবক, চেহারাটা সৈনিক ধাঁজের—একটু মোটা হবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। তার কালো উজ্জ্বল চুল মসৃণ ভাবে আঁচড়ান ও গোঁফটা পরিপাটি ভাবে পাকান। কিন্তু তার চলনটা কেমন যেন এলো-মেলো। মেয়েটির ঠোঁটগুলি পর্যন্ত তখন শাদা হয়ে এসেছে। মাথা তুলে তাকাতেই লোকটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটির চোখের তারা কালো কিন্তু তার দৃষ্টি কেমন যেন লক্ষ্যহীন। মানুষের চোখ যেন তা নয়।

লোকটি তার কাছে এসে খানিক এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর এক-বার অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নুইয়ে তার পাশে বেঞ্চিতেই বসে পড়ল। পা দুটো একটু নাড়াচাড়া করে—তার পর সে বললে, "আপনার কোনো অসুবিধা করছি না তো?"—কণ্ঠস্বরটি ভদ্র অথচ সৈনিক-সুলভ রুক্ষতার আভাসও তাতে আছে।

মেয়েটি নিরুপায়, নিরুত্তর। তার যেন নড়বারও ক্ষমতা নেই। লোকটির হাতের কোড়ে-আঙুলে যে আঙটিটা দেখা যাচ্ছে সেটা তার চেনা। তার মনে হল সে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। সমস্ত পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেছে তার কাছে। সবল উরুর ওপর হাত দুটি রেখে লোকটি বসে আছে। মেয়েটির কাছে এই হাত দুটিই একদিন ছিল তাদের উদ্দাম ভালোবাসার প্রতীক কিন্তু এখন যেন সেগুলো তার কাছে বিভীষিকা।

পকেটে হাত দিয়ে লোকটি বললে, "একটু পাইপ খেতে পারি?" প্রশ্নের ধরনটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, প্রায় গোপন কথা জিগগেস করার মতো। মেয়েটি এবারেও উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না কারণ লোকটি এখন সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের। বেদনায় উদ্বেগে শাদা ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে মেয়েটি ভাবতে লাগল—সে কি তাকে চিনতে পেরেছে—চিনতে পারবে কি।

লোকটি চিন্তিত ভাবে বললে, "না আমার কাছে তামাক নেই।"

এ কথা মেয়েটির কানে বুঝি গেল না। তার মনে আরও গভীর এক প্রশ্ন—সত্যিই সে কি তাকে আর চিনতে পারবে না, সব স্মৃতি কি একেবারে হারিয়ে গেছে। নিদারুণ উদ্বেগে সে যেন অসাড় পাথর হয়ে গেছে।

লোকটি বললে, "আমি 'জন কটন' মার্কা তামাক খাই। বড্ড দাম কিনা তাই বুঝে-সুঝে খরচ করতে হয়। জান তো এই সব মামলা-মোকদ্দমার দরুন আমার অবস্থা এখন বিশেষ ভালো না।"

মেয়েটির বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেছে। কোনো মতে সে বললে, "না জানি না।"

লোকটি এবার উঠে অভিবাদনের একটা অস্পষ্ট ভঙ্গী করে চলে গেল। স্তব্ধ হয়ে মেয়েটি বসে রইল। পিছন থেকে লোকটির আকৃতি সে দেখতে পাচ্ছে, আঁট-সাঁট সৈনিকের মতো মাথার গড়ন, শরীরের সুন্দর বাঁধুনি; এখন সে বাঁধুনি একটু যেন ঢিলে হয়ে এসেছে মাত্র। এই মানুষটিকে একদিন সে কি ভালোই বেসেছে। কিন্তু এখন তার চেহারা দেখলে শুধু যেন একটা দুর্বোধ বিভীষিকা মনে জাগে।

আবার হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে লোকটি ফিরে এল। এসে বললে, "আমি যদি একটু তামাক খাই কিছু মনে করবে না তো? তাতে হয়তো মাথাটা আমার পরিষ্কার হবে।"

লোকটি আবার তার পাশে বসে পাইপে তামাক ভরতে লাগল। মেয়েটি তার হাত দুটির দিকে চেয়ে রইল—কি সুন্দর সবল আঙুলগুলি। আঙুলগুলি বরাবরই কেমন একটু কাঁপতো। সেই তখনকার দিনেই মেয়েটি এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অনেক বার অবাক হয়েছে। আঙুলগুলি এখন যেন একেবারেই বশে নেই। তামাকটা পাইপে ঠিক ভরা হচ্ছে না।

লোকটি বলে চলেছে, "অনেক মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির আমাকে করতে

হয়। কি যে হাঙ্গামের ব্যাপার কি বলব। উকিলকে ঠিক আমি যা চাই তা বুঝিয়ে দিই তবু কাজ ঠিক হয় না।"

মেয়েটি তার কথা শুনে যায়। কিন্তু এতো সে নয়। তবু এক দিন ঐ হাত দুটিতে সে তো চুমু খেয়েছে। ঐ অপরূপ উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি সে ভালোবেসেছে। তবু এ সে নয়, সে নয়। ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে মেয়েটি তবুও বসে রইল। সে তাকে চিনতে পারে কিনা না জেনে তার যেন নড়বার উপায় নেই। লোকটির তামাকের থলিটা পড়ে গেছে, সেটা খোঁজবার জন্যে সে মাটিতে হাতড়াচ্ছে। হঠাৎ লোকটি উঠে পড়ে বললে, "আমায় এখুনি যেতে হবে, প্যাচা আসছে।" তার পর ঘনিষ্ঠ ভাবে গোপন কথা জানাবার মতো করে বললে, "তার নাম সত্যিই প্যাচা নয়, তবে আমি ঐ নামে ডাকি। সে এসেছে কিনা এখন গিয়ে দেখতেই হবে।"

মেয়েটিও এবার উঠে পড়ল। লোকটি কেমন একটু দ্বিধা ভরে তার সামনে দাঁড়িয়ে। সুন্দর সৈনিকের মতো চেহারা কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ। তার মনে এখনও কোথাও কোনো স্মৃতির কণা অবশিষ্ট আছে কি না, আকুল হয়ে মেয়েটির চোখ যেন খুঁজে ফিরতে লাগল।

অবশেষে তার অন্তরের গভীর আতঙ্ক থেকে-ই যেন এক প্রশ্ন উচ্চারিত হয়ে উঠল, "আমায় চিনতে পারছ না ?"

লোকটি কি রকম অদ্ভুত ভাবে তার দিকে ফিরে তাকাল। সে দৃষ্টি উজ্জ্বল কিন্তু কোনো চৈতন্য যেন তাতে নেই। লোকটি আরও কাছে এগিয়ে এসে মেয়েটির মুখের উপর স্থির উন্মত্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, "হ্যাঁ, তোমায় তো চিনি।" তার মুখটা মেয়েটির একেবারে মুখের কাছে, বড় বেশি কাছে সরে এসেছে।

আর এক দিক থেকে আর একটি লোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, "আজ বাগান তো খোলা নেই।"

বোঝা গেল সে এই উন্মাদ লোকটির পাহারায় আছে। তামাকের থলিটা পড়েছিল সেখানে গিয়ে পাহারাদার লোকটি সেটা তুলে নিয়ে বললে, "আপনার তামাকটা ফেলে যাবেন না।"

উন্মাদ লোকটি অত্যন্ত ভদ্রভাবে মেয়েটিকে দেখিয়ে বললে, "ইনি আমার একজন বন্ধু। আমি এঁকে দুপুরে খেয়ে যেতে বলছিলাম।"

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে অন্ধের মতো সেই উজ্জ্বল গোলাপের বাগান, ফাঁকা অন্ধকার জানালা দেওয়া সেই বাড়ি, সেই সমুদ্রের নুড়ি দিয়ে সাজান চত্বর পার হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। কোথায় সে যাবে জানে না, শুধু দ্বিধাহীন ভাবে যেদিকে চোখ যায় অন্ধের মতো সে ছুটে চলেছে।

বাড়িতে এসেই উপরে উঠে মাথার টুপিটা খুলে ফেলে সে বিছানায় বসে পড়ল। ভেতরে কি যেন তার ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গেছে। কোনো কিছু ভাববার, অনুভব করবার মতো সম্পূর্ণ সত্তা যেন তার নেই। বাইরে সমুদ্রের বাতাসে একটা আইভিলতা ধীরে ধীরে দুলছে। জানালা দিয়ে সেদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে সে বসে রইল। বাতাসে যেন আজ সূর্যালোকিত সমুদ্রের অলৌকিক দীপ্তির ছোঁয়াচ লেগেছে। নিস্তব্ধ হয়ে সে বসে আছে সত্তার সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে। শুধু তার মনে হচ্ছে সে যেন দারুণ অসুস্থ। কোথায় কোন ছিন্ন নাড়ীতে বেয়ে তার রক্তের স্রোত ঝরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে নিচেরতলার মেঝেতে স্বামীর ভারি পায়ের শব্দ সে শুনতে পেল। কোনো পরিবর্তন তার হল না, তবু যেন স্বামীর প্রত্যেক গতিবিধি সে তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতে পারছে। স্বামীর কেমন একটু অস্থির পায়ের শব্দ বাইরে মিলিয়ে যাওয়া সে টের পেলে, টের পেলে তার গলার স্বর। কথা কইতে, উত্তর দিতে সে স্বরে খুশি ফুটে উঠল। তারপর শোনা গেল তার ভারি পায়ের শব্দ আবার কাছে এগিয়ে আসছে।

স্বামী উজ্জ্বল মুখে, খুশি মনে ঘরে ঢুকল। তার সবল শরীরে আত্ম-প্রসাদের একটা দীপ্তি মাখানো। মেয়েটি কঠিন ভাবে মুখ ফেরাতেই কিন্তু সে কেমন যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

“কি, হয়েছে কি তোমার, শরীর ভালো নেই ?”—স্বামীর স্বরে কেমন যেন একটু অসহিষ্ণুতা।

মেয়েটির কাছে এইটুকু অসহ্য। সে উত্তর দিলে, “প্রায় তাই।”

স্বামীর চোখে বিস্ময় ও বিরাগ ফুটে উঠল। “ব্যাপারটা কি ?” সে জিগগেস করলে।

“কিছুই না।”

স্বামী কয়েক পা এগিয়ে যেন আক্রোশভরেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপর ফিরে জিগগেস করলে, “কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি ?”

মেয়েটি বললে, “আমায় চেনে এমন কারুর সঙ্গে নয়।”

ফ্র্যাঙ্কের হাতগুলো আপনা থেকে কবার কেঁপে উঠল। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার স্ত্রী যে একেবারে নির্বিকার এইটাই তার কাছে সব চেয়ে অসহ্য। তার দিকে আবার ফিরে সে জিগগেস না করে পারল না, “মনটা তোমার কোনো ব্যাপারে খুব চঞ্চল হয়ে উঠছে, কেমন না ?” মেয়েটি নির্লিপ্ত ভাবে বললে, “কই নাতো।” শুধু একটু উত্যক্ত হওয়া ছাড়া স্বামীর উপস্থিতি সম্বন্ধে আর কোনো ভাবে সে সচেতন নয়।

ফ্র্যাঙ্কের রাগ আরও বেড়ে গেল। তার গলার শিরগুলো তখন ফুলে উঠেছে। রাগের সত্যই কোনো কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই রাগটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টা করে সে বললে, “হুঁ, তাই বটে।” এবার সে নিচেরতলায় নেমে গেল।

বিছানায় মেয়েটি চুপ করে বসে রইল। সামান্য যেটুকু অনুভূতি তার

এখনও অবশিষ্ট আছে সেটুকু শুধু ফ্র্যাঙ্কের প্রতি বিরাগের—তাকে এমন করে উৎপীড়ন করবার জন্যে বিরাগ।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। নিচে খাবারের আয়োজন হচ্ছে। তার গন্ধ সে পাচ্ছে, টের পাচ্ছে বাগান থেকে তার স্বামীর পাইপের তামাকের গন্ধ। তবু তার কোনো মতেই নড়বার ক্ষমতা নেই। তার সত্তাই যেন বিলুপ্ত। কোথায় একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। সে শুনতে পেল স্বামী বাগান থেকে বাড়ির ভেতর এসে ঢুকেছে। সিঁড়ি দিয়ে তার ওপরে উঠে আসার পায়ের শব্দ এবার পাওয়া গেল। স্বামীর প্রতি ধাপে ধাপে তার হৃদয় যেন ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে।

স্বামী দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকে বললে, "নিচে খাবার দেওয়া হয়েছে।"

স্বামীর উপস্থিতি সহ্য করা তার পক্ষে সত্যই কঠিন, কারণ সে জানে তার জীবন সে এখন বিড়ম্বিত করে তুলবেই। নিজের সত্যকার জীবন সে আর ফিরে পাবে না। আড়ষ্ট ভাবে উঠে সে নিচে নেমে গেল। খাওয়া তার হল না, সমস্ত খাবার সময়ের মধ্যে কোনো কথাও সে বলতে পারল না। খাবার টেবিলে বসেও তার মনে হল সে যেন সেখানে নেই। তার ছিন্ন-ভিন্ন বিলুপ্ত সত্তার বাইরের খোলসটা যেন সেখানে শুধু পড়ে আছে। স্বামীর ভাবগতিকে মনে হয় কোনো একটা কিছু ঘটেছে বলেই সে স্বীকার করতে চায় না কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ভেতরের রাগ আর চাপা রইল না। একেবারে রাগের বশেই যেন ফ্র্যাঙ্ক নীরব হয়ে গেল।

প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র মেয়েটি উপরে উঠে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে চাবি দিয়ে দিলে। তাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতেই হবে। ফ্র্যাঙ্ক পাইপ হাতে বাগানে বেরিয়ে গেল। স্ত্রীর কাছে চিরদিনই তাকে কেমন ছোট বোধ করতে হয়েছে। সেই জন্যই স্ত্রীর বিরুদ্ধে চাপা রাগে সমস্ত হৃদয় তার যেন ঝলসে যাচ্ছে। সে ঠিক বুঝতে পারেনি বটে তবু তার স্ত্রীকে

সত্য করে সে কখনো জয় করতে পারেনি, তার স্ত্রী কখনো তাকে ভালোবাসেনি। সে যেন অনুগ্রহ করে তাকে গ্রহণ করেছিল। এতেই সে একটুখানি বিমূঢ় হয়েছে। সে কয়লার খনির একজন ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী মাত্র। মেয়েটি তার চেয়ে উঁচু ধাপের। তার কাছে চিরদিনই সে হার মেনে এসেছে। কিন্তু মেয়েটি তাকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি বলে অপমানে ও আঘাতে অনেক দিন থেকেই তার মন বিষাক্ত হয়ে আসছে। এখন তার এতদিনের সমস্ত রাগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে।

সে বাগান থেকে ফিরে আবার বাড়ির ভেতর ঢুকল। তৃতীয় বার সিঁড়িতে তার স্বামীর পায়ের শব্দ। মেয়েটির হৃদ্‌স্পন্দন যেন থেমে গেল। ফ্র্যাঙ্ক হাতলটা ঘুরিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে, দরজায় চাবি দেওয়া। সে আবার আরও জোরে দরজা খোলবার চেষ্টা করলে। মেয়েটি ওধারে একেবারে নিস্পন্দ।

মিসেস্ কোটসের খাতিরেই ফ্র্যাঙ্ক চাপা গলায় জিগগেস করলে, "তুমি কি দরজায় চাবি দিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও।" পাছে দরজাটা স্বামী ভেঙ্গে ফেলে সেই জন্যেই সে তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিলে। তার স্বাধীনতা এমন করে ক্ষুণ্ণ করার জন্যে স্বামীর বিরুদ্ধে একটা আক্রোশই শুধু সে অনুভব করছে। দাঁতে পাইপ চেপে ফ্র্যাঙ্ক ঘরে ঢুকল। মেয়েটি তখন আবার বিছানার ধারে ফিরে গেছে।

দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক কঠিন স্বরে জিগগেস করলে, "ব্যাপার কি ?"

মেয়েটি যেন স্বামীর দিকে চাইতেই পারছে না। অসীম তার ঘৃণা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বললে, "আমাকে একটু একলা থাকতে দিতে পার না ?"

অপমানের আঘাতে একটু শিউরে উঠে ফ্র্যাঙ্ক চকিতে স্ত্রীর ওপর একবার

চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর খানিক কি ভেবে বললে, "তোমার কিছু একটা হয়েছে, কেমন না ?"

"হ্যাঁ, হয়েছে।" মেয়েটি জবাব দিলে, "কিন্তু তাই জন্যে আমায় যন্ত্রণা দেবার কি অধিকার তোমার আছে ?"

"আমি তোমায় যন্ত্রণা দিইনি, কি হয়েছে বল।"

রাগে হতাশায় মেয়েটি এবার চীৎকার করে উঠল, "তোমার জানবার কি দরকার ?"

কোথায় কি যেন একটা ভেঙ্গে গেল। পাইপের মুখটা ফ্র্যাঙ্কের দাঁতের চাপে ভেঙ্গে দুখানা হয়ে গেছে। পাইপটা মুখ থেকে খুলে পড়ে যেতে না যেতে সে ধরে ফেললে তারপর দাঁতে-কাটা টুকরোটুকু জিভ দিয়ে বার করে এনে হাতে করে সেটা তুলে দেখলে। এবার পাইপটা নিবিয়ে জামার ওপর থেকে ছাইগুলো ঝেড়ে ফেললে। তারপর মাথা তুলে দৃঢ়-স্বরে বললে, "আমি জানতে চাই"—ছাইয়ের মতো বিবর্ণ তার মুখে একটা কুৎসিত কাঠিন্য।

কেউ আর কারও দিকে তাকাচ্ছে না। মেয়েটি জানে স্বামী এখন উগ্রতার সীমায় গিয়ে পৌছেচে। ফ্র্যাঙ্কের বুকের স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত। মেয়েটির মনে শুধু অসহ্য ঘৃণা। মাথা তুলে সে স্বামীর দিকে ফিরে জিগগেস করলে, "কি অধিকার আছে তোমার জানবার ?"

ফ্র্যাঙ্ক তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কঠিন মুখ, তার যন্ত্রণা-কাতর দৃষ্টি মেয়েটির মনে যেন বেদনা ও বিস্ময়ের একটা বিদ্যুৎ-চমক দিয়ে গেল। কিন্তু তার হৃদয় আবার কঠিন হয়ে উঠতে দেরি লাগল না। ফ্রাঙ্ককে সে কখনো ভালোবাসেনি, এখনও বাসে না।

আবার সে ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা তুললে—যেন সে বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে। সত্যই সে মুক্ত হতে চায়। শুধু তার স্বামীর কথাই নয়, তারও বেশি আরও কিছু কথা সে ভাবছে—নিজে যে বন্ধন

সাধ করে সে নিয়েছে তাই তার কাছে আজ দুঃসহ বিভীষিকা। নিজেই এ বন্ধন স্বীকার করেছে বলেই এখন তা ছিঁড়ে ফেলা সব চেয়ে শক্ত। কিন্তু এখন তার মন সব কিছুর ওপর বিষিয়ে উঠেছে, সে যেন সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চায়। দরজায় পিঠ দিয়ে তার স্বামী অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে একেবারে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত, চির-কাল, অনন্তকাল তাকে বাধা দিতে প্রস্তুত। ফ্র্যাঙ্কের পরিশ্রম-কঠিন, হাত দুটো দরজার পাল্লার ওপর ছড়ান, মেয়েটি সেদিকে ঘৃণা ভরে তাকাল।

"তুমি তো জান এখানেই আমি থাকতাম।" সে যেন ফ্র্যাঙ্ককে আঘাত দেবার জন্যেই কঠিন স্বরে বললে।

এ আঘাতের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ফ্র্যাঙ্ক মাথা নেড়ে জানালে সে জানে।

মেয়েটি বলে চলল, "আমি তখন টরিল হল-এ মিস্ বার্চের সঙ্গিনী হিসাবে কাজ করি। মিস্ বার্চের এখানকার পাদ্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল— আর্চি পাদ্রীরই ছেলে।" মেয়েটি থামল। ফ্র্যাঙ্ক সবই শুনে যাচ্ছে তবু কি যে হচ্ছে সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। বিমূঢ়ভাবে সে তার স্ত্রীর দিকে তাকালে, শাদা পোশাকে আড়ষ্ট ভাবে তার স্ত্রী বিছানার ওপর বসে বারে বারে পোশাকের একটা প্রান্ত ভাঁজ করছে আর খুলছে।

মেয়েটি আবার তেমনি বিদ্বেষের স্বরে শুরু করলে, "সে সৈন্য-বিভাগের সাব্-লেফ্টেনেণ্ট ছিল। কর্ণেলের সঙ্গে ঝগড়া করে সে কাজ ছেড়ে দেয়। সে যাই হোক, সে আমায় অসম্ভব ভালোবাসতো, আমিও তাই।" মেয়েটি তার পোশাকের প্রান্ত খুঁটছে, স্বামী স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে স্বামী জিগগেস করল, "তার বয়স তখন কত হবে?"

"কখন—যখন তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, না যখন সে চলে যায় ?"

"যখন প্রথম পরিচয় হয়।"

"তখন তার বয়স ছাব্বিশ আর এখন বত্রিশ। সে আমার চেয়ে প্রায় তিন বছরের বড়—"মাথা তুলে সে এবার অন্যদিকের দেয়ালে তাকালে।

স্বামী জিগগেস করলে, "তারপর ?"

নিজেকে শক্ত করে নিয়ে সে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলে, "প্রায় এক বছর আমরা পরস্পরের কাছে একরকম বাগ্‌দত্ত ছিলাম বললেই হয়; যদিও বাইরে কেউ এ কথা জানত না। তবে অবশ্য এ নিয়ে কাণাঘুষা অনেক হয়েছে। তারপর সে চলে যায়।"

তাকে আঘাত দিয়ে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ফ্র্যাঙ্ক নিষ্ঠুরভাবে বললে, "তোমায় সে ভাসিয়ে দিয়ে যায় বল ?"

উন্মত্ত আক্রোশ মেয়েটি আর চেপে রাখতে পারল না। স্বামীর রাগে ইন্ধন দেবার জন্যেই যেন সে বললে, "হ্যাঁ।"

ফ্র্যাঙ্ক এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। দারুণ রাগে তার মুখ দিয়ে অর্থহীন একটা ধ্বনি ছাড়া আর কিছু বার হল না। খানিকক্ষণ তার পর দুজনেই চুপচাপ।

মেয়েটি আবার বলতে লাগল, "তারপর হঠাৎ একদিন সে আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে চলে যায়। ঠিক যেদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় সেদিনই মিস্ বার্চের কাছে তার সর্দিগর্মি হওয়ার খবর পাই। দুমাস বাদে শুনতে পাই যে সে মারা গেছে—"

"তার পরেই বুঝি তুমি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর ?"

মেয়েটির কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া গেল না। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব। মেয়েটির সমস্ত কথার মর্ম ফ্র্যাঙ্কের বোধের বাইরে। কুৎসিত ভাবে তার চোখ দুটি সঙ্কুচিত।

"এই জন্যেই তুমি সকালে একলা বেরুতে চেয়েছিলে? যেখানে-যেখানে একদিন অভিসারে গিয়েছিলে সেই জায়গাগুলো আবার দেখে এসেছ, কেমন?"

মেয়েটি তবুও কোনো উত্তর দিলে না। দরজা ছেড়ে ফ্র্যাঙ্ক এবার মেয়েটির দিকে পিছন ফিরে পিছনে হাত রেখে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি তার দিকে তাকালে। হাতগুলো তার কাছে মনে হল অত্যন্ত স্থূল, পিছন থেকে মাথার যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে কোনো শ্রদ্ধা যেন তার ওপর আসে না।

অবশেষে যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে, "কতদিন তার সঙ্গে এমন চালিয়েছিলে?"

মেয়েটি কঠিন স্বরে জিগগেস করলে, "তার মানে?"

"মানে, কতদিন তোমাদের এ-রকম চলেছিল?"

মেয়েটি মাথা তুলে স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

এ প্রশ্নের উত্তর সে দেবে না। সে শুধু বললে, "চালিয়েছিলাম মানে তুমি কি বলতে চাও আমি জানি না। মিস্ বার্চের কাছে কাজ নেবার দুমাস বাদে তার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন থেকেই তাকে আমি ভালোবাসতাম!"

ফ্র্যাঙ্ক বিদ্রূপ করে বললে, "সেও তোমায় ভালোবাসতো বলে তোমার ধারণা?"

"আমি জানি সে বাসতো।"

"বাসতো! তাহলে তোমায় ছেড়ে গেল কেন?"

একদিকে ঘৃণা আরেক দিকে যন্ত্রনায়, দুজনের মুখেই অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই। অবশেষে ভীত ও অসাড় কণ্ঠে ফ্র্যাঙ্ক জিগগেস করলে, "তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছিল?"

আঘাতে জর্জর হয়ে মেয়েটি চীৎকার করে বললে, "তোমার এই বাঁকা

প্রশ্ন আমি ঘৃণা করি। আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসতাম, হ্যাঁ, ভালোবাসতাম—সত্যি ভালোবাসতাম। তুমি যা খুশি ভাবতে পার আমার কিছু আসে যায় না। তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছি। সে ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কোনো সম্বন্ধ নেই।"

রাগে অন্ধ হয়ে ফ্র্যাঙ্ক বললে, "ভালোবাসতে—ভালোবাসতে! তার মানে তার সঙ্গে ফূর্তি যা করবার তা করেছ; তারপর মজা যখন শেষ হয়েছে তখন এসে আমায় বিয়ে করেছ।"

অসীম তিক্ততা মনের মধ্যে চেপে মেয়েটি চুপ করে বসে রইল। সুদীর্ঘ স্তব্ধতার পর এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি ভাবে ফ্র্যাঙ্ক জিগগেস করল, "কিছুই তোমরা বাকি রাখনি—শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছ?"

মেয়েটি নিষ্ঠুর ভাবে বললে, "তা ছাড়া কি? আর কি তুমি ভেবেছ?"

ফ্র্যাঙ্ক শিউরে উঠে সঙ্কুচিত, বিবর্ণ হয়ে গেল। সে যেন আর নিজের মধ্যে নেই। একটা দীর্ঘ অসাড় স্তব্ধতা। ফ্র্যাঙ্ক যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে অনেকক্ষণ বাদে সে বললে, "আমাদেব বিয়ের আগে এসব কথা তো কিছু বলনি?"

মেয়েটি উত্তর দিলে, "তুমি তো কখনো জিগগেস করনি।"

"জিগগেস করবার দরকার আছে আমি ভাবিনি।"

"তাই নাকি! তাহলে তোমার ভাবা উচিত ছিল।"

ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত হৃদয় যেন যন্ত্রনায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সহস্র চিন্তা পাক খেয়ে যাচ্ছে তার মনের মধ্যে। কিন্তু মুখে তার কোনো বিকার আর নেই। যেন শিশুর মতো সে মুখ শান্ত।

মেয়েটি হঠাৎ আবার বললে, "আজ আমার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে মারা যায়নি, পাগল হয়ে গেছে।"

চমকে ফ্র্যাঙ্ক তার দিকে ফিরে তাকাল। অনিচ্ছায় আপনা থেকে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, "পাগল!"

"হাঁ, উন্মাদ," মেয়েটি বললে। এ শব্দ উচ্চারণ করতে তার মনে হল যেন, তার নিজের চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আবার নীরবতা।

ক্ষীণ কণ্ঠে ফ্র্যাঙ্ক জিগগেস করলে, "তোমাকে সে চিনতে পারলে?"

"না।"

ফ্র্যাঙ্ক নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনের মধ্যে ব্যবধান যে কতখানি এতক্ষণে যেন সে বুঝতে পেরেছে। মেয়েটি আড়ষ্ট ভাবে এখনও বিছানার ওপর বসে। তার কাছে যাওয়া যায় না। সান্নিধ্যের স্পর্শ দিয়ে দুজনে যেন আর পরস্পরকে অপবিত্র করতে পারে না। এ ব্যাপারের মিমাংসা নিজের ভেতর থেকেই হওয়া দরকার। এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত তারা দুজনেই পেয়েছে যে নিজেদের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত যেন লুপ্ত। তারা পরস্পরকে আর ঘৃণাও করে না।

কয়েক মিনিট বাদে ফ্র্যাঙ্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

খেঁকশিয়াল

মেয়ে দুটিকে সবাই সাধারণত তাদের পৈতৃক পদবী ধরেই ডাকে—'ব্যানফোর্ড' আর 'মার্চ'। চাষ-বাড়িটা দুজনে এক সঙ্গেই নিয়েছে। তাদের ইচ্ছে নিজেরাই সেটা চালাবে। তারা কিছু মুরগী পুষতে চায়, তাতেই তাদের জীবিকার সংস্থান হবে। তার ওপর একটা গরু যদি রাখে, আর অন্য দু-চারটে পশু পালনের ব্যবস্থা করে, তাহলে তো কথাই নেই। দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা তাদের আশা মতো ঘটে উঠল না।

ব্যানফোর্ডের রোগা ছোট্ট দুর্বল চেহারা, চোখে চশমা। এ ব্যাপারে বেশির ভাগ টাকা সেই অবশ্য খাটিয়েছে, কারণ মার্চের টাকাকড়ি নেই বললেই হয়। ব্যানফোর্ডের বাবা ইস্‌লিংটনের একজন ব্যবসাদার। ব্যানফোর্ড তাঁর আদরের মেয়ে, তাই তার স্বাস্থ্যের খাতিরে এই ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন। তা ছাড়া ব্যানফোর্ড কোনোদিন বিয়ে-থা করবে বলে মনে হয়না। মার্চ তার চেয়ে অনেক সুস্থ সবল। ইস্‌লিংটনে সে ছুতোরের কাজ শিখেছে। চাষ-বাড়ির দেখা শোনার আসল ভার তারই ওপর। ব্যানফোর্ডের বুড়ো ঠাকুরদাদা গোড়ার দিকে তাদের সঙ্গে ছিলেন। এককালে তিনি চাষের কাজই করতেন। দুঃখের বিষয় বছর-খানেক তাদের সঙ্গে চাষ-বাড়িতে থাকবার পরই বৃদ্ধ মারা যান। সেই থেকে তারা দুটিতেই এখানে আছে।

দুজনের কারুরই বয়স খুব কম নয়, প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। তবে তাদের প্রৌঢ়াও বলা চলে না। খুব উৎসাহের সঙ্গেই তারা কাজ আরম্ভ করলে। গোড়ায় তাদের সম্বল হল কালো শাদা লেঘর্ণ, প্লিমাথ প্রভৃতি নানা জাতের অনেকগুলি মুরগী ও দুটি গরু। একটি গরু কিন্তু কিছুতেই

চাষ-বাড়ির এলাকার মধ্যে থাকতে চায় না। মার্চ যে ভাবেই বেড়া বাঁধুক না কেন, গরুটা সে বেড়া ভেঙ্গে বাইরে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, কখনো বা পাশের কারুর জমিতে গিয়ে চড়াও হয়। মার্চ ও ব্যানফোর্ডের তখন তার পেছনে হায়রানির অন্ত থাকে না। অবশেষে হতাশ হয়ে তারা গরুটা বিক্রি করে দিলে। তার পর বাকি গরুটার সবে যখন প্রথম বাচ্চা হবার সময় হয়েছে, তখন ব্যানফোর্ডের বুড়ো ঠাকুরদা মারা গেলেন। তারা দুজনে ভয়ে ভয়ে সে গরুটাও বিক্রি করে দিয়ে শুধু হাঁস ও মুরগীর কারবার করবে বলে ঠিক করলে।

মনে একটু দুঃখ হলেও আর যে গরুর ঝক্কি পোয়াতে হবে না, এটা যেন তাদের মস্ত বড় একটা নিষ্কৃতি। জীবনটা যে শুধু খেটে মরবার জন্য নয়, এ বিষয়ে তারা দুজনেই একমত। মুরগীগুলো সামলাতেই তো তাদের প্রাণান্ত। খোলা ছাউনিটার একধারে মার্চ তার ছুতোরের কারখানা বসিয়েছে। সেখানে সে দরজা জানালা ইত্যাদি তৈরি করে। আগেকার দিনে যেটা তাদের গোয়াল ও গোলাবাড়ি ছিল, সেই বড় বাড়িটাতেই মুরগীগুলোকে এখন রাখা হয়। বাসা তাদের সুন্দর। সেখানে তাদের পরম সুখেই থাকবার কথা। সত্যি কথা বলতে কি দেখলে তাদের বেশ সুস্থই মনে হয়। কিন্তু ব্যানফোর্ড ও মার্চের তাদের ওপর দিক ধরে গেছে। কোথা থেকে যে তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোগ ধরায়, কেন যে তারা কিছুতেই ডিম পাড়তে চায় না ভেবে কুল পাওয়া যায় না।

বাইরের কাজ বেশির ভাগ মার্চই করে। সে যখন ব্রিচেস্ পরে বেল্ট দেওয়া কোট গায়ে দিয়ে মাথায় আলগা টুপি পরে ঘোরা ফেরা করে, তখন তাকে প্রায় বেশ সুঠাম একটি ছেলের মতো দেখায়। তার কাঁধ-গুলো সোজা, চলাফেরা বেশ সাবলীল, এমন কি তার ভেতর কোথায় যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রতি একটা ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। কিন্তু তা বলে তার মুখ পুরুষের মতো নয়। কোনো কারণে নিচু হলে

তার কালো চুলের গুচ্ছ যখন সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সত্যি তাকে ভারী সুশ্রী দেখায়। চোখ দুটি তার কালো ও ডাগর, একাধারে সেই অদ্ভুত চোখের চকিত দৃষ্টিতে সঙ্কোচ ও বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ ঔদ্ধত্য যেন মেশান। ঠোঁট দুটি তার চাপা, বিদ্রূপে না বেদনায় বলা কঠিন। কি যেন তার ভেতরে একটা রহস্য আছে বোঝা যায় না।

মার্চের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চাষ-বাড়িতে মুরগীগুলো কিছুতেই যেন বাড়তে চায় না। নিয়ম মাফিক সে সকালবেলা তাদের গরম খাবার দেয় কিন্তু তাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা কেমন যেন নিঃসাড় হয়ে ঝিমোয়। মনে হয় খাবার হজম করাটা তাদের পক্ষে এমন কঠিন পরিশ্রম যে ক্লান্তিতে তারা ছাউনির থামগুলোর গায়ে বুঝি হেলেই পড়বে। মার্চ ভালো করেই জানে যে সত্যিকার সুস্থ সবল মুরগী হলে তারা সারাক্ষণ মাটি আঁচড়ে চারধারে চরেই বেড়াত। অনেক ভেবে-চিন্তে সে তাদের রাত্রে গরম খাবার দেওয়া শুরু করলে! ঘুমোতে ঘুমোতেই তারা খাবার হজম করুক। কিন্তু তাতেও কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না।

যুদ্ধের দরুনও মুরগী পোষার অনেক অসুবিধা। খাবার তো পাওয়াই যায় না, যা পাওয়া যায় তাও নিতান্ত নিরেস। ব্যানফোর্ড ও মার্চ দুজনেই শুধু কাজ করার জন্যে বেঁচে থাকার কোনো মানে আছে বলে বিশ্বাস করে না। তারা পড়তে ভালোবাসে, বিকেলে সাইকেল চড়ে একটু ঘুরে আসার শখ তাদের আছে। মার্চের তা ছাড়া নানা রকম অদ্ভুত খেয়াল ও শখ যখন তখন হয়। আহাম্মুক মুরগীগুলোর জন্যে কিছুই তার করবার যো নেই।

তাদের সব চেয়ে জ্বালাতন হতে হয় খেঁকশিয়ালের উপদ্রবে। তাদের চাষ-বাড়ির পর একটা মাঠ পেরুলেই জঙ্গল শুরু। যুদ্ধের পর থেকে খেঁকশিয়ালের দৌরাত্ম্য সেখানে বেড়েই চলেছে। তাদের দুজনের

চোখের সামনে থেকেই মুরগীগুলো খেঁকশিয়ালে ধরে নিয়ে যায়। বড় বড় চশমার ভেতর দিয়ে ব্যানফোর্ড সচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ঠিক তার পেছনেই হয়তো একটা পাখা ঝট্‌পটির ও কাতর আর্তনাদের শব্দ। কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই খেঁকশিয়াল উধাও। আর একটা শাদা মুরগীর পাত্তা নেই। সত্যি হতাশ হবারই কথা।

প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করল। খেঁকশিয়াল মারার নিষেধ উঠে যাবার পর থেকে তারা দুজনে ঠিক সময়মতো বন্দুক হাতে পাহারা দেয়, কিন্তু ফল কিছুই হয় না। খেঁকশিয়াল তাদের চেয়ে অনেক চালাক, অনেক চটপটে। দুবছর এমনি করেই কেটে গেল। লোকসান দিয়েই তাদের দিন যাচ্ছে। একবার গ্রীষ্মের সময় চাষ-বাড়িটা তারা ভাড়া দিলে। মাঠের এক কোণে একটা পুরানো রেলগাড়ির কামরা ছিল, সেইটেই তারা কিছুদিনের মতো ঘরবাড়ি করে নিলে। ব্যাপারটা মজার, কিছু পয়সার সুসারও হলো। তবু অবস্থার সত্যিকার কোনো উন্নতির লক্ষণ কোথাও নেই।

এমনিতে তাদের দুজনের বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ়। ব্যানফোর্ড দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির হলেও মনটা তার অত্যন্ত উদার। মার্চ একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ও কেমন আনমনা গোছের, তবে তার হৃদয়েও কোনো সঙ্কীর্ণতা নেই। এ সব সত্ত্বেও এই কী সুদীর্ঘ নির্জনতায় মাঝে মাঝে তারা পরস্পরের প্রতি কেমন যেন বিমুখ হয়ে ওঠে, পরস্পরের সঙ্গ যেন আর ভালো লাগে না। যা কিছু কাজ—তার বারো আনা মার্চ একাই করে। কাজ করতে সে নারাজ নয়, তবু এক এক সময় যখন মনে হয় কাজের আর শেষ নেই, তখন তার চোখে কেমন একটা জ্বালা দেখা দেয়।

মাসের পর মাস কেটে যায়, তারা যেন আরও হতাশ হয়ে পড়ে। এই বিশাল নির্জনতার মাঝে তাদের যেন বড় বেশি একা একা থাকতে হয়, তাদের ভরসা পাবার কিছুই সেখানে নেই।

খেঁকশিয়ালের জ্বালাতেই তারা সব চেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মের ভোরবেলায় মুরগীগুলো ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্দুক নিয়ে পাহারায় থাকতে হয়। আবার সন্ধ্যার আলো স্তিমিত হয়ে আসতে না আসতেই সেই এক হ্যাঙ্গাম। খেঁকশিয়াল আবার এমন ধূর্ত! বড় বড় ঘাসের ভেতর দিয়ে সাপের মতো এমন সে নিঃশব্দে লুকিয়ে আসে যে দেখাই যায় না। ঘাসের মধ্যে দু-একবার মার্চ তার ল্যাজের শাদা ডগা, কখনো বা তার লালচে শরীরের আভাস দেখতে পেয়েছে, তৎক্ষণাৎ গুলিও করেছে। কিন্তু খেঁকশিয়ালের তাতে ভ্রুক্ষেপও নেই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মার্চ বন্দুক হাতে নিয়ে পূব-মুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে তার দৃষ্টি সজাগ হলেও, ভেতরে সে যেন একান্ত অন্যমনা। এ ধরনের ভাব তার প্রায়ই হয়, বর্তমান তার কাছ থেকে যেন অস্পষ্ট হয়ে যায়। অগাষ্ট মাসের শেষ; বনের ধারের গাছগুলো পড়ন্ত আলোয় গাঢ় সবুজ দেখাচ্ছে। কাছে মোটা ঘাসের ডগাগুলো ঝিকমিক করছে। হাঁসগুলো পুকুরে এখনো সাঁতরাচ্ছে, মুরগীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে আসে-পাশে। মার্চ যেন এসব দেখেও কিছু দেখছে না। কিছু দূরে ব্যানফোর্ড মুরগীগুলোকে ডাকছে। শুনেও যেন সে শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে না। কি যে সে ভাবছে সে নিজেই জানে না।

হঠাৎ চোখ নামিয়ে খেঁকশিয়ালটাকে সে দেখতে পেল। শিয়ালটা তার দিকেই চেয়ে আছে। মার্চ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক মুহূর্তেই বুঝতে পারল যে মার্চকে সে চেনে। চেনে বলেই শিয়ালটার কোনো ভয় যেন নেই।

বিশেষ চেষ্টায় একটু আত্মস্থ হবার পর মার্চ দেখতে পেলে খেঁকশিয়ালটা ধীরে ধীরে একরকম যেন তাচ্ছিল্য ভরেই মাটির ওপরকার কাটা ডালপালাগুলো ডিঙ্গিয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দূরে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

বন্দুকটা মার্চ কাঁধে তুলে নিলে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলে, এখন বন্দুক ছোঁড়ার ভান করার কোনো মানেই হয় না। তাই সে খেঁক শিয়ালটা যেদিকে গেছে সেই দিকে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করলে। তার বিশ্বাস সেটাকে সে খুঁজে পাবেই। আবার তাকে দেখতে পেলে কি যে সে করবে তা সে তখনো ঠিক করেনি। তবু তাকে খুঁজে বার করা তার চাই।

বনের ভেতর অন্যমনস্ক ভাবে এধারে-ওধারে, অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানার পর ব্যানফোর্ড তাকে ডাকছে সে টের পেল। সচেষ্ট হয়ে সেদিকে মনোযোগ দিয়ে সে চীৎকার করে সাড়া দিলে। তার পর সে আবার বাড়ির দিকে ফিরল।

বাইরের কাজ শেষ করে সে যখন ভেতরে গেল তখন ব্যানফোর্ড টেবিলে রাত্রের খাবার সাজিয়ে রেখেছে। ব্যানফোর্ড বেশ সহজ ভাবেই গল্প গুজব করে যাচ্ছে। মার্চ যেন বহুদূর থেকে সেগুলো শুনছে। খাওয়া শেষ হবার পর সে আবার বন্দুক নিয়ে খেঁকশিয়ালের খোঁজে বার হল। তার সেই দৃষ্টি এখনো যেন মার্চের মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে আছে। তার সেই বাদামী-সোনালী, ধূসর-শ্বেত মুখের চেহারা তার মনে মুদ্রিত। বনের ধার দিয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে, দীপ্ত সজাগ চোখে মার্চ অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। রাত গভীর হয়ে পাইন গাছগুলোর ওপর দিয়ে তখন চাঁদ উঠছে। ব্যানফোর্ড আবার তাকে ডাকছে সে শুনতে পেলে।

ফিরে এসে ভেতরকার কাজকর্ম সেরে বাতির আলোয় বন্দুকটা পরিষ্কার করে সে আবার সব কিছুর ঠিকমতো ব্যবস্থা হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে বাইরে গেল। রক্ত-লাল আকাশপটে পাইন গাছগুলোর অন্ধকার চূড়া-গুলো দেখে আবার তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এখুনি যেন বন্দুক নিয়ে সেই খেঁকশিয়ালের সন্ধানে বেরুতে পারলে সে খুশি হয়।

ব্যানফোর্ডকে এ ব্যাপারটা সে কয়েকদিন বাদে জানালে। তারপর

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ বললে, 'শনিবার রাত্রে শিয়ালটা একেবারে আমার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।'

চশমার আড়ালে ব্যানফোর্ডের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে জিগগেস করলে, 'কোথায় ?'

'আমি তখন ঠিক পুকুরটার ধারে দাঁড়িয়ে।'

'গুলি করেছিলে ?' ব্যানফোর্ড জিগগেস করলে।

'না, করিনি।'

'কেন ?'

'বোধহয় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাই।'

ব্যানফোর্ড সবিস্ময়ে বন্ধুর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে জিগগেস করলে, 'তুমি তাকে সত্যিই দেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ, সত্যি ! নির্বিকার ভাবে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

'কি আস্পর্ধা বলতো ! জান নেলী, ওরা আমাদের ভয়ই করে না।'

'তা—করে না,' মার্চ উত্তর দিলে।

'ইস্ একবার যদি গুলি করতে পারতে !'

'সত্যিই দুঃখ হয় ! সেই থেকে আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আর কখনো অত কাছে আসবে বলে মনে হয় না।'

'না, তা আসবে না, ব্যানফোর্ড বললে।

কয়েক দিনের মধ্যে ব্যানফোর্ড এসব কথা ভুলেই গেল। শুধু হতভাগা শিয়ালটার স্পর্ধায় একটু রাগ ছাড়া আর কিছু তার মনে রইল না। মার্চও সজ্ঞানে শিয়ালটার কথা ভাবে না। তবু যখন সে আনমনা হয়ে বসে থাকে তখন তার অচেতন মনের শূন্যতা সে কেমন করে যেন অধিকার করে থাকে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল, মাসের পরে মাস। আপেল পাড়বার জন্যে কখনো সে গাছে ওঠে, কখনো হাঁসেদের জন্যে পুকুর থেকে নালা কাটে। যাই সে করুক না কেন, কাজ শেষ

করার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালের প্রথম দৃষ্টির সেই যাদু যেন তার মন আচ্ছন্ন করে দেয়। যখন-তখন অতর্কিত মুহূর্তে—হয়তো সে রাত্রে শুতে যাচ্ছে, কিম্বা চা করবার জন্যে পট্-এ জল ঢালছে, এমন সময় মার্চ যেন তার গন্ধ পর্যন্ত পায়—কি যেন কুহক তার মনের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

আরও অনেক দিন কেটে গেল, এল অন্ধকার নভেম্বর। চারটে না বাজতেই অন্ধকার হয়ে আসে, দিনের আলো যেন ভালো করে ফুটতেই চায় না। ব্যানফোর্ড ও মার্চ দুজনেই এই সময়টাকে ভয় করে। ব্যানফোর্ডের ভয়টা অনেকটা স্থূল ধরনের। কখন কে চোর, ছ্যাঁচড়, ভিখিরী অন্ধকারে লুকিয়ে এসে হানা দেবে, এই তার ভয়। মার্চের ভয় অন্য ধরনের। সে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। কেমন মনমরা হয়ে যায়। সাধারণত বসবার ঘরে তারা দুজনে চা খায়। সারাদিন ধরে যে কাঠ কেটেছে, তাই দিয়ে সন্ধ্যা না হতে মার্চ আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সামনে তাদের সুদীর্ঘ আর্দ্র অন্ধকার রাত্রি। তাদের নিসঙ্গতা দুর্বহ মনে হয়। মার্চ কথাবার্তা বলতেই চায় না, ব্যানফোর্ড কিন্তু কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না। বাইরের পাইন বনের বাতাসের হাহাকার বা জল পড়ার ঝিরঝির শব্দ নীরবে বসে শোনা তার কাছে অসহ্য।

সেদিন চায়ের বাসন-কোসন ধুয়ে তারা ঘরে বসেছিল। মার্চ ধীরে ধীরে সেলাইয়ের কাজ করে যাচ্ছে। এত আগে থেকে পড়তে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত চোখের কষ্ট হবে বুঝে, ব্যানফোর্ড রক্তাভ আগুনটার দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় দুজনেই চমকে উঠল। বাইরে স্পষ্টই কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যানফোর্ড ভয়ে একেবারে সঙ্কুচিত, মার্চ উঠে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রইল। খিড়কি দরজার দিকে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। মার্চ তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেল। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলতেই ব্যানফোর্ড চীৎকার করে উঠল। পুরুষের মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল, 'হ্যালো।'

মার্চ একটু পিছিয়ে গিয়ে কোণ থেকে একটা বন্দুক তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, 'কি চাও?'

আবার সেই কোমল ঈষৎ কম্পিত পুরুষ কণ্ঠ, 'কি? হল কি?'

'আমি গুলি করব,' মার্চ বলে উঠল, 'কি তুমি চাও?'

'কেন, কি হয়েছে কি? অপরাধটা কি করেছি?' ঈষৎ ভীত বিস্মিত কণ্ঠে কথাগুলো জিগগেস করে, পিঠের ভারী লটবহর সমেত অল্প বয়সী একজন সৈনিক অস্পষ্ট আলোয় এগিয়ে এসে দাঁড়াল। আবার সে জিগগেস করলে, 'কি ব্যাপার? এখানে কে থাকে তাহলে?'

'আমরা থাকি। কি তুমি চাও?' মার্চ বললে।

'ও উইলিয়াম গ্রেনফেল এখানে থাকে না তাহলে?'

'না—থাকে না যে তা তুমিও জান।'

'আমি জানি? বুঝতে পারছ না যে, আমি জানি না? উইলিয়াম গ্রেনফেল আমার ঠাকুরদাদা, তিনি এখানেই থাকতেন। আমি নিজেও পাচ বছর আগে এখানেই ছিলাম। তাঁর কি হয়েছে বলতে পার?'

সৈনিকের অদ্ভুত কোমল কণ্ঠস্বরের প্রভাব ইতিমধ্যেই মার্চকে কেমন অভিভূত করে ফেলেছে। সৈনিকের বয়স বেশি নয়। চোখ দুটি নীল ও উজ্জ্বল। পিঠের ভারী থলিটার দরুন একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যাকাশে মুখে, বিস্ফারিত চোখে মার্চ তখনো বন্দুকটা ধরে আছে। তার পেছনে ব্যানফোর্ড সোফার একটা হাতল ধরে সঙ্কুচিত ভাবে সৈনিককে ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্য করছে।

সৈনিক আবার বললে, 'আমি ভেবেছিলাম আমার ঠাকুরদা এখনো এখানে আছেন। কে জানে মারাই গিয়েছেন কিনা।'

ব্যানফোর্ড এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে উত্তর দিলে, 'আমরা এখানে তিন বছর আছি।' সৈনিকের বালকসুলভ চেহারা দেখেই সে বোধহয় একটু আশ্বস্ত হয়েছিল।

'তিন বছর ! বল কি ? এখানে আগে কে ছিল, তা বোধহয় জানও না ?'
'জানি, এক বৃদ্ধ এখানে একা থাকতেন।'
'ঠিক হয়েছে, তিনিই তাহলে আমার ঠাকুরদা। তারপর তাঁর কি হল ?'
'তিনি মারা গেছেন, আমি জানি।'
'ও ! মারা গেছেন তাহলে।' সৈনিকের মুখে বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। শুধু একটু বিস্ময় ও এই দুটি মেয়ে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ কৌতূহল ছাড়া আর কিছুর আভাস তার মুখে নেই। এই কৌতূহল তীক্ষ্ণ হলেও নৈর্ব্যক্তিক।
কিন্তু মার্চ যেন বুঝতে পারে এই সৈনিকের মধ্যে সেই খেঁকশিয়ালেরই রহস্য প্রচ্ছন্ন। তার ঝুঁকে পড়া মাথাটার ভঙ্গী, কিম্বা তার লালচে গালের ওপর সূক্ষ্ম লোমগুলির চিক্কনতা, কিম্বা তার শানিত উজ্জ্বল দৃষ্টি, কি থেকে এ অনুভূতি তার মনে জাগল বলা যায় না।
ব্যানফোর্ড এবার একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলে, 'তোমার ঠাকুরদা মারা গেছেন না বেঁচে আছেন, তা তুমিই বা জান না কেন ?'
'তা জিগগেস করতে পার বটে। আমি ক্যানাডায় পালিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই যুদ্ধে যোগ দিই। তিন চার বছর তাই কোনো খবর পাইনি।'
'এখন বোধহয় ফ্রান্স থেকে এইমাত্র এসেছ ?'
'সত্যি বলতে কি, স্যালোনিকা থেকেই আসছি।'
সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ, কি বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না।
ব্যানফোর্ড কতকটা অবান্তর ভাবেই জিগগেস করলে, 'এখন তাহলে কোথাও যাবার তোমার নেই ?'
'না, গ্রামের দু-চারজন আমার চেনা আছে। তাছাড়া তেমন হলে আমি সোয়ান-সরাইখানায় গিয়ে থাকতে পারি।'
'এই ট্রেনেই এসেছ বোধহয় ? একটু বসে যাবে নাকি ?'

'তা—আমার আপত্তি নেই।' ভারী বোঝাটা পিঠ থেকে নামিয়ে সৈনিক বসে পড়ল। ব্যানফোর্ড মার্চের দিকে একবার তাকিয়ে সৈনিককে বললে, 'বন্দুকটা নামিয়ে রাখ। আমরা চা তৈরি করছি।'

'হ্যাঁ, বন্দুকে অরুচি ধরে যাবারই কথা।'

মার্চ তখন রান্নাঘরে চা তৈরি করবার জন্যে চলে গেছে। সেখান থেকে সৈনিকের কোমল কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায়—

'কে জানত এইভাবে এখানে ফিরে আসব, আর ফিরে এসে এই দেখব। জায়গাটার অদল-বদলই কত হয়েছে!'

'অদল-বদল তাহলে বুঝতে পারছ?' ব্যানফোর্ড জিগগেস করলে।

'বাঃ, বুঝতে পারছি না?'

রান্নাঘরে চা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে করতে মার্চ সারাক্ষণ সৈনিক সম্বন্ধে সজাগ হয়েই থাকে। ভাঁড়ারে খেতে দেবার মতো বিশেষ কিছুই নেই। ট্রেতে তাই বড় বড় কটা রুটি, জ্যাম ও মার্জারিন চায়ের সঙ্গে সাজিয়ে সে বসবার ঘরে নিয়ে এল। সৈনিক তাকে লক্ষ্য করুক সে তা চায় না। কিন্তু সৈনিকের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে টেবিলে চা ও খাবার সাজাবার সময় হঠাৎ সৈনিক সোজা হয়ে উঠে বসে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালে। এক মুহূর্তে মার্চের সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফিরে দাঁড়িয়ে মার্চ ব্যানফোর্ডকে বললে, 'চা-টা তুমিই ঢালো।' সোজা-সুজি এখনো সে সৈনিকের দিকে তাকাতে পারছে না।

মার্চ আবার রান্নাঘরে চলে যাবার পর ব্যানফোর্ড সৈনিককে বললে, 'টেবিলে যদি না আসতে চাও, তাহলে যেখানে আছ সেখানে বসেই চা খেতে পার।'

'হ্যাঁ, এখানেই বেশ আরামে বসে আছি। কিছু যদি মনে না কর তাহলে চা-টা এখানেই খাবো।'

সৈনিকের পাশে একটা টুলের ওপর প্লেটটা ধরে দিয়ে ব্যানফোর্ড বললে, 'রুটি আর জ্যাম ছাড়া কিন্তু আর কিছুই নেই।' ব্যানফোর্ড এখন বেশ খুশি। লোকজনের সঙ্গ তার ভালো লাগে। সৈনিকের চেহারায় এমন একটা ছেলেমানুষি ভাব আছে, যে আর তাকে ভয় করবার কিছু আছে বলে মনে হয় না। সে যেন তার ছোট ভাইয়ের মতো।

মার্চকে ডেকে ব্যানফোর্ড বললে, 'নেলী, তোমার জন্যেও এক পেয়ালা ঢেলেছি।'

চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে মার্চ আলো থেকে যতদূরে সম্ভব একটা কোণে গিয়ে বসল। হাঁটু পর্যন্ত তার অনাবৃত, পাগুলো সম্বন্ধে তাই সে বড় বেশি সচেতন। পা দুটো সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে বসবার জন্যে তার যেন সঙ্কোচের সীমা নেই। সৈনিক ছেলেটি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে বাঁচে। সৈনিকেরও মনে হয় যেন মার্চকে স্পষ্ট দেখতে পারছে না, ছায়ার মধ্যে সে যেন আর এক ছায়া।

ব্যানফোর্ডের সঙ্গে সে কিন্তু আগাগোড়াই সহজ ভাবে কথা বলে যাচ্ছে। ব্যানফোর্ড গল্পগুজব পেলে আর কিছু চায় না। সৈনিকের খাওয়ারও বিরাম নেই। মার্চ তাই আরও কয়েকটা মোটা মোটা রুটির টুকরো কেটে মার্জারিন সমেত তার সামনে ধরে দিলে।

ছেলেটির কথাবার্তায় জানা গেল কর্নওয়ালে তার জন্ম, সেখানেই সে মানুষ হয়েছে। বারো বছর বয়সে ঠাকুরদার কাছে এই বাড়িতে সে আসে। ঠাকুরদার সঙ্গে কোনোদিন তার ভালো বনেনি। সেই জন্যেই সে ক্যানাডায় পালিয়ে যায়।

মার্চ ও ব্যানফোর্ড সত্যিই এই চাষ-বাড়ি নিয়ে কি করছে, তা জানবার জন্যে তার অত্যন্ত আগ্রহ দেখা গেল। তার প্রশ্নের ধরনে বোঝা গেল যে ক্ষেত-খামার সম্বন্ধে সে বেশ কিছু জানে। একটু বিদ্রূপের

সুরও বুঝি তার প্রশ্নে আছে। নিজেদের লোকসান সম্বন্ধে মেয়ে দুটির মতামত শুনে তার সবচেয়ে মজা লাগে।

মার্চ হঠাৎ বলে উঠল, 'শুধু কাজের জন্যে বেঁচে থাকায় আমরা তা বলে বিশ্বাস করি না।'

'কর না?' ছেলেটি হেসে উঠল। মার্চের ওপর সারাক্ষণই যেন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। আবার সে বললে, 'কিন্তু মূলধন সব ফুরিয়ে গেলে করবে কি?'

'তা জানি না,' মার্চ সংক্ষেপে জবাব দিলে, 'দিন মজুরির কাজ করব আর কি।'

'হুঁ, কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হবার পর চাষের কাজে মেয়েদের চাহিদা আর তো থাকবে না।'

'না থাকে দেখা যাবে, এখনো কিছুদিন আমরা যুঝতে পারব।' মার্চের কথার সুর কতকটা দুঃখের কতকটা বিদ্রূপের।

ছেলেটি কোমল কণ্ঠে বললে, 'এখানে একজন পুরুষ দরকার।'

ব্যানফোর্ড হেসে উঠে বললে, 'কি বলছ, খেয়াল থাকে যেন! আমরা নিজেদের মোটেই আনাড়ী মনে করি না।'

'আনাড়ী কিনা সে কথা এখানে আসে না।' মার্চ ধীরে ধীরে বললে, 'চাষবাসের কাজ করতে হলে সারাদিন-রাত তাতেই লেগে থাকতে হয়। পোষা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ার না হলে চলে না।'

'ঠিক বলেছ,' ছেলেটি বলে উঠল, 'তোমরা পুরোপুরি এ কাজে লাগতে চাও না, কেমন?'

'তা তো চাই-ই না।' মার্চ বললে।

ব্যানফোর্ডও তাতে যোগ দিলে, 'নিজেদের জন্যে কিছু অবসর আমরা চাই।'

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে, 'তাহলে এ কাজে নেমেছিলে কেন?'

'নেমেছিলাম কেন ?' মার্চ জবাব দিলে, 'হাঁস মুরগী গরুগুলোর স্বভাব চরিত্র এমন বদ তখন কি জানতাম !'

'হাঁস মুরগী গরু বাছুর সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা তাহলে খুব উঁচু নয় ?' ছেলেটি জিগগেস করলে।

'উঁচু তো নয়ই, বেশ নিচু ধারণা।' মার্চ বললে।

ব্যানফোর্ড সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'শুধু হাঁস মুরগী কেন, ছাগল গরু মায় এখানকার জল হাওয়া সব সমান।'

সবাই এবার হেসে উঠল। মার্চ হাসিটা যথাসাধ্য লুকোবার জন্যে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিলে।

ছেলেটি সত্যিই এখন খুব খুশি। ব্যানফোর্ড তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলে। জানা গেল তার নাম হেনরি গ্রেনফেল, সবাই তাকে হেনরি বলেই ডাকে

ব্যানফোর্ডের সঙ্গে হেনরি কথা বলে যাচ্ছে, মার্চ কোণ থেকে নীরবে তাকে লক্ষ্য করছে। তার মনের গভীরতায় কেমন একটা অদ্ভুত অটল বিশ্বাস এখন দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, হেনরি সেই শিয়ালের রহস্যময় প্রতীক রূপে আবির্ভূত। আর মার্চকে তার পেছনে ছুটতে হবে না। তবু সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। শুধু হেনরি তাকে ভুলে থাকলেই মার্চ যেন শান্তি পায়। ছায়ার মধ্যে বসে থেকে তার মনে হয় নিজেকে দুভাগ করে চেতনার দুই স্তরে বাস করার আর তার প্রয়োজন নেই।

ব্যানফোর্ডের সঙ্গে হেনরির আলাপ অবশেষে থেমে এল। একটু অনিচ্ছার সঙ্গে সে বললে, 'এবার বোধ হয় আমার ওঠা উচিত, নইলে সরাইখানায় সবাই ঘুমিয়ে পড়বে।'

'তারা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়। তাদের সবাইকারই তো ইনফ্লুয়েঞ্জা।' ব্যানফোর্ড বললে।

'তাই নাকি ? তাহলে তো আর কোথাও আমার জায়গা খুঁজতে হয়।'

ব্যানফোর্ড একটু ইতস্তত করে বললে, 'আমি বলছিলাম কি, তুমি এখানেও থাকতে পার, তবে—'

হেনরি তার দিকে ফিরে মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে বললে, 'তবে কি?'

ব্যানফোর্ড একটু যেন বিব্রত বোধ করলে, বললে, 'সেটা ভালো দেখাবে কিনা ভাবছি।'

হেনরি যেন একটু বিস্মিত হয়ে বললে, 'খুব অন্যায় কিছু হবে কি?'

'আমাদের দিক থেকে তো নয়।' ব্যানফোর্ড জবাব দিলে।

হেনরি গাম্ভীর্যের সঙ্গে বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'আমার দিক থেকেও তো নয়। যাই বল, এক হিসেবে এতো আমারই বাড়ি।'

ব্যানফোর্ড একটু হেসে বললে, 'আমি ভাবছি গ্রামের লোকেরা কি বলবে।'

সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ। ব্যানফোর্ড আবার জিগগেস করলে, 'তুমি কি বল নেলী?'

মার্চ স্পষ্টভাবে জবাব দিলে, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। গ্রামের লোকে কি ভাববে না ভাববে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

'ঠিকই তো, আসবে যাবে কেন? মানে, আমি বলতে চাই কিই বা তারা বলবে।'

মার্চ সংক্ষেপে বললে, 'বলবার মতো তারা ঠিকই কিছু খুঁজে বার করবে। তবে আমরাও কারুর কথার ধার ধারি না।'

হেনরি বললে, 'তা তো বটেই।'

'বেশ, তাহলে থেকেই যাও না। বাড়তি ঘরটা ঠিক করাই আছে,' বললে ব্যানফোর্ড। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।

'তোমাদের খুব বেশি কষ্ট দেওয়া হবে না তো, ঠিক বল।'

ব্যানফোর্ড ও মার্চ দুজনেই বলে উঠল, 'না, না, কষ্ট কিসের।'

হাসি মুখে একে একে দুজনের দিকে চেয়ে হেনরি কৃতজ্ঞ ভাবে বললে, 'আর বাইরে যেতে হবে না জানলে সত্যিই মনটা খুশি হয়ে ওঠে, না ?'

'হয় বলেই তো মনে হয়,' বললে ব্যানফোর্ড।

সে রাত্রে মার্চ অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলে। স্বপ্ন দেখলে বাইরে কে যেন গান গাইছে। সে গানের মানে সে কিছু বুঝতে পারছে না। তবু সে গান সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে মাঠ থেকে মাঠে, অন্ধকারে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। সে গান তার বুকে এমন ভাবে এসে বাজছে যে চোখের জল সে সামলে রাখতে পারছে না। ঘর ছেড়ে সে বাইরে গেল, আর হঠাৎ বুঝতে পারলে, আর কেউ নয়, এ সেই শিয়ালেরই গান। পাকা গমের শীষের মতো উজ্জ্বল হলদে তার রঙ। মার্চ কাছে যেতেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেল, গানও তার গেল বন্ধ হয়ে। আবার মনে হল যেন খুব কাছেই রয়েছে। কিন্তু মার্চ তাকে ছোঁওয়ার জন্যে হাত বাড়াতেই সে তার কব্জিটা কামড়ে দিল, আর মাচ যন্ত্রণায় একটু পিছু হঠতেই ফিরে পালিয়ে যেতে গিয়ে তার লোমশ ল্যাজটা মার্চের মুখের ওপর বুলিয়ে দিয়ে গেল। ল্যাজটায় যেন মনে হল আগুন ধরে গেছে। মার্চের সমস্ত মুখ ঝলসে পুড়ে গেল। যন্ত্রণায় স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেও খানিকক্ষণ তার কাঁপুনি থামতে চায় না।

সকালবেলা কিন্তু এ স্বপ্নের অস্পষ্ট একটা স্মৃতি মাত্র তার মনে রইল। ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজকর্ম, মুরগীদের দেখা-শোনা নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ব্যানফোর্ড তখন সাইকেলে করে গ্রামে কি খাবার কিনতে পাওয়া যায় খুঁজতে গেছে।

সারাদিন ব্যানফোর্ড ও মার্চ নিজেদের কাজকর্ম করে গেল। হেনরি সকালে বন্দুকগুলোর তদারক করেছে। একটা খরগোশ ও একটা বুনো হাঁসও শিকার করেছে। মেয়ে দুটির শূন্য ভাঁড়ারের এতে সুসার হয়েছে সন্দেহ নেই। হেনরি যেন নিজের খোরাক নিজেই উপার্জন করে নিয়েছে।

বিদায় নেবার কোনো লক্ষণই কিন্তু তার নেই। সন্ধ্যায় গ্রাম থেকে ফিরে এসে চায়ের টেবিলে বসে সে বললে, 'তারপর, আমি এখন করব কি?'

'তার মানে? তোমার মতলবটা কি?' জিগগেস করলে ব্যানফোর্ড।

'গ্রামে থাকবার জায়গা আমার কোথায়?' হেনরি বললে।

'তা জানি না। তুমি কোথায় থাকবে ভাবছ?' বললে ব্যানফোর্ড।

একটু ইতস্তত করে হেনরি বললে, 'তাই তো ভাবছি। সোয়ান সরাইখানায় সবাইকার তো ইনফ্লুয়েঞ্জা। প্লাউ-এণ্ড-হ্যারো সেপাই-এ ভর্তি। তারা সৈন্যবাহিনীর জন্য খড় সংগ্রহ করতে এসেছে। গ্রামে যা শুনলাম তাতে সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতেও জায়গা পাব বলে মনে হয় না। দশজন সৈনিক ও একজন কর্পোরাল এর মধ্যেই সেখানে নানা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।'

ব্যাপারটার মীমাংসা তাদের ওপরই যেন ছেড়ে দিয়ে সে চুপ করলে। নিজের যেন তার এ বিষয়ে কোনো দায়িত্বই নেই। সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ হেনরি মুখ তুলে সোজা মার্চের চোখের দিকে তাকালে। দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠল। একদিন সেই খেঁকশিয়ালের চোখ থেকে যে দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ তার গভীর হৃদয় পর্যন্ত ঝলসে দিয়ে গেছে, সেই বিদ্রূপ-মেশান জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন হেনরির চোখ থেকে তার মনে ছিটকে এল বলে মার্চের মনে হল।

ব্যানফোর্ড তখন বলছে, 'আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। তুমি কেন কিছু বলছ না নেলী?'

মার্চ কিন্তু নীরব হয়েই রইল। হেনরি মন্ত্রমুগ্ধের মতো একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কৈ, বল কিছু,' ব্যানফোর্ড আবার তাড়া দিলে। সবে যেন তার চেতনা ফিরে আসছে, এমনি ভাবে ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে সে বললে, 'আমি আর কি বলব?'

'যা তোমার মনে হয় তাই বল,' বললে ব্যানফোর্ড।
মার্চ জবাব দিলে, 'আমার কাছে সবই সমান।'
আবার খানিকক্ষণ সবাই নীরব। হেনরির চোখে ছুঁচের মতো একটা আলোর বিন্দু যেন বিদ্ধ হয়ে আছে। ব্যানফোর্ড খানিক বাদে বললে, 'আমার কাছেও তাই।' তারপর হেনরিকে উদ্দেশ করে বললে, 'তুমি ইচ্ছে করলে এখানে থাকতে পার।'
ধূর্ত একটা হাসিতে সহসা হেনরির মুখ তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটা লুকোবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি মাথাটা নিচু করলে।
ব্যানফোর্ড আবার বললে, 'ইচ্ছে হলে তুমি এখানে থাকতে পার।'
তবু হেনরির মুখ থেকে কোনো উত্তর নেই, মাথা সে নিচু করেই আছে। অনেকক্ষণ বাদে যখন সে মাথা তুলল তখন তার মুখে অদ্ভুত এক দীপ্তি, যেন উল্লাসের।
ব্যানফোর্ড যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেল। মার্চের দিকে এমন স্বচ্ছ স্থির দৃষ্টিতে হেনরি চেয়ে আছে, মুখে তার এমন অস্পষ্ট একটি হাসি, যার মানে সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্যানফোর্ডের দিকে তাকিয়ে হেনরি, কোমল বিনীত কণ্ঠে বললে, 'সত্যি তোমরা বড় ভালো। আমায় নিয়ে মুশকিলে পড়বে না নিশ্চয়।'
ব্যানফোর্ড একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললে, 'নেলী আর এক টুকরো রুটি কাট তো।' তারপর আবার বললে, 'তুমি থাকতে চাইলে মুশকিল কিছু নেই। আমার ছোট ভাই তোমারই মতো। মনে করব যেন সে-ই কয়েকদিনের জন্যে এখানে আছে।'
এবার মার্চের দিকে ফিরে হেনরি জিগগেস করলে, 'কিন্তু মিস মার্চ কি বলেন?'
'ও, আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই।'

হেনরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, 'তোমাদের কাজে যদি সত্যিই সাহায্য করতে পাই, আর আমার খাওয়ার খরচ যদি নাও তাহলে আমার খুশির সীমা থাকবে না।'

'খাবারের কথা ছেড়ে দাও,' বললে ব্যানফোর্ড।

হেনরি চাষ-বাড়িতেই আছে। ব্যানফোর্ড তো তার কথায়বার্তায়, ব্যবহারে মুগ্ধ। হেনরি তাদের কাজকর্মে সাহায্য করে, কিন্তু খুব বেশি নয়। বেশির ভাগ সে বন্দুক হাতে নিয়ে একা একা থাকতেই ভালো-বাসে। কৌতূহল তার অসীম, একা একা অর্ধগোপন অবস্থায় সব কিছু লক্ষ্য করাতেই তার আনন্দ।

বিশেষ করে সে মার্চকে লক্ষ্য করে। সুঠাম যুবকের মতো মার্চের শরীরের গড়ন তার বড় ভালো লাগে। মার্চের কালো চোখের দিকে তাকালে এমন একটা তীব্র গোপন উত্তেজনায় তার সমস্ত হৃদয় দুলে ওঠে, যে সে তা প্রকাশ করতে ভয় পায়।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝির-ঝির করে শেষ নভেম্বরের বৃষ্টি পড়ছে। বনের ধার থেকে বন্দুক হাতে সে ফিরে আসছে, এমন সময় বসবার ঘরের জানালায়, ভেতরকার আগুনের আঁচটা দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে থমকে দাঁড়াল। তার মনে হল এই সমস্ত তার নিজের হলে মন্দ কি হয়। মার্চকে বিয়ে করলেই বা ক্ষতি কি? বেশ খানিকক্ষণ সে মাঠের মাঝখানে এই চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিকার করা খরগোশগুলো তার হাত থেকে ঝুলছে। তার মন কি যেন একটা ভেতরে ভেতরে হিসেব করে চলেছে। অদ্ভুত ভাবে হেসে সে নিজের মনের কথায় যেন সায় দিলে। ঠিকই তো, কেনই বা বিয়ে করবে না? মতলবটা তো খুবই ভালো। ভাবতে একটু হাসি পায়, কিন্তু কি-ই বা আসে যায় তাতে। মার্চ তার চেয়ে বয়সে বড়ই হবে, কিন্তু সেটা ধর্তব্য নয়। মার্চের সচকিত অসহায় কালো চোখ দুটির কথা ভাবতেই তার

মুখে আবার একটু মৃদু হাসি খেলে গেল। না, আসলে সে-ই মার্চের চেয়ে বড়, মার্চ তারই অধীন।

নিজের কাছেও এ সঙ্কল্প ভালো করে সে স্বীকার করতে চায় না। তাকে অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হতে হবে সে জানে। এখনো সব কিছুই অনিশ্চিত। সাবধান না হলে মার্চ হয়তো বিদ্রূপের হাসি হেসে একেবারে সব উড়িয়েই দেবে। সোজাসুজি সে যদি তাকে গিয়ে বলে, 'মিস মার্চ তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই,' তা হলে মার্চ কি উত্তর দেবে তা সে ভালো করেই জানে। মার্চ বলবে, 'সরে পড়। ও-সব ন্যাকামি আমার কাছে চলবে না।' না, তাকে খুব ধীরে ধীরে পথ তৈরি করতে হবে। যেমন করে শিকারে বেরিয়ে হরিণ কি বনের পাখি ধরতে হয়, তেমনি ভাবে মার্চকে ধরা দরকার। হরিণ শিকারে গিয়ে হরিণকে—আমার বন্দুকে তুমি মর—বলা তো চলে না। অনেক বেশি সূক্ষ্ম, অনেক বেশি ধূর্ত বুদ্ধির দরকার। এ শিকার নিয়তির মতো অমোঘ। মনের অদৃশ্য লোকে, সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের এ এক সূক্ষ্ম নিদারুণ সংগ্রাম।

আসলে অন্তরে অন্তরে সে চাষি নয়, সৈনিকও নয়, সে শিকারী। মার্চকে তাই সে শিকার করতে চায়। কি ভাবে কার্যসিদ্ধি করবে তা সে এখনো ঠিক করতে পারেনি। মার্চ আবার খরগোশের মতোই ভীরু, সন্দিগ্ধ। বাইরে তাই একটু অদ্ভুত, অথচ ভদ্র, অচেনা এক সাময়িক অতিথির মতো চেহারাই সে করে রইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় অগ্নিকুণ্ডের জন্যে সে কাঠ চিরছিল। কুয়াশায় ইতি-মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মার্চ কাঠগুলো ভেতরে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সেখানে আসতেই বিদ্যুতের মতো একটা অগ্নিশিখা যেন তার পায়ের স্নায়ুগুলো বেয়ে নেমে গেল।

শান্ত মৃদুকণ্ঠে সে ডাকলে, 'মার্চ—'

কাঠের বোঝা সাজাতে সাজাতে মার্চ মুখ তুলে তাকাল, 'কি ?'
'আমি তোমায় একটা কথা জিগগেস করতে চেয়েছিলাম।'
'তাই নাকি, কি কথা ?' মার্চের কণ্ঠস্বরে ইতিমধ্যেই কি যেন একটা ভয়ের কম্পন দেখা দিয়েছে।
অত্যন্ত মৃদু স্বরে হেনরি বললে, 'তা হলে শোন। তোমায় বিয়ে করতে চাই, এই কথাই তোমায় বলতে চেয়েছিলাম।' শব্দ নয়, হেনরির কথা-গুলো বেড়ালের থাবার মৃদুতম স্পর্শের মতো যেন শুধু অনুভূতি-গোচর। মার্চ বৃথাই মুখটা ফেরাবার চেষ্টা করলে। সমস্ত শরীরে কি একটা গভীর শৈথিল্য তার এসেছে। হেনরি তার দিকে ঝুঁকে পড়ে অদৃশ্য ভাবে হাসছে। তার ভেতর থেকে যেন সূক্ষ্ম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে।
হঠাৎ মার্চ বলে উঠল, 'আমার সঙ্গে এ সব তামাশা করবার চেষ্টা কোরো না।'
হেনরি একটা শিহরণ অনুভব করলে। লক্ষ্য তার ফসকেছে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে, আদর করার মতো অদ্ভুত কোমলতা কণ্ঠে এনে সে বললে, "সত্যি তামাশা আমি করিনি। আমি সত্যিই তোমায় বিয়ে করতে চাই। কেন আমায় অবিশ্বাস করছ ?"
হেনরি যেন অত্যন্ত আহত হয়েছে। এমনি তার কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত প্রভাব যে মার্চের মনে হয়, সে বুঝি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলছে। প্রাণপণ চেষ্টায়, ঘৃণার তীব্রতায় মনকে সজাগ করে তুলে সে বললে, 'কি বাজে কথা তুমি বলছ ? আমি তোমার মা-র বয়সী।'
'কি বলছি আমি জানি,' হেনরি বলে চলল, 'তোমার বয়স মোটেই অত নয়। তা ছাড়া বয়স আমাদের যাই হোক, কি তার মূল্য ? তুমি আমায় অনায়াসে বিয়ে করতে পার।'
মার্চ কোনো উত্তর দিতে পারলে না। হেনরি বুঝতে পারলে এবারে তার জিত হয়েছে। দ্রুত কোমল কণ্ঠে সে বলে চলল, 'আমি তোমায়

বিয়ে করতে চাই, কেনই বা চাইব না। বল তুমি আমায় বিয়ে করবে। বল, বল—'

অনেক দূর থেকে যেন যন্ত্রণায় কাতর স্বরে মার্চ বললে, 'কি বলব ?'

'বল হ্যাঁ।'

অর্ধসচেতন ভাবে অর্ধস্ফুট স্বরে অসহায় ভাবে মার্চ বললে, 'না, না, আমি পারি না। কি করে আমি তা বলতে পারি ?' মার্চ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে হেনরি বললে, 'পার পার তুমি পার। কেন তোমার মনে হচ্ছে তুমি পার না ?' অত্যন্ত কোমল ভাবে মার্চের ঘাড়ের কাছটা সে তার ঠোঁট ছুটি দিয়ে একটু স্পর্শ করলে।

বিকারগ্রস্তের মতো তার কাছ থেকে সরে গিয়ে, ফিরে দাঁড়িয়ে মার্চ অস্ফুট চীৎকার করে উঠল, 'না, না, অমন কোরো না। কি তোমার মনের কথা ?'

'আমার মনের কথাই আমি বলেছি। তুমি আমায় বিয়ে কর এই আমি চাই। তুমি জান আমি চাই। বল তুমি জান। কেমন, জান না ?'

'কি ?' মার্চ বললে।

'তুমি জান,' হেনরি উত্তরে বললে।

'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি তাই বলছ।'

'আমি মন থেকে বলছি। তুমি জান না ?'

'আমি জানি, তুমি বলছ।'

'তুমি আমায় বিশ্বাস কর ?'

খানিক চুপ করে থেকে মার্চ বললে, 'কি আমি বিশ্বাস করি তা আমি নিজেই জানি না।'

ভেতর থেকে এবার ব্যানফোর্ডের ডাক শোনা গেল। 'তোমরা কি ওখানে আছ ?'

'হ্যাঁ, আমরা কাঠগুলো নিয়ে যাচ্ছি,' হেনরি জবাব দিলে।

'আমি তো ভাবলাম তোমরা হারিয়েই গেছ। তাড়াতাড়ি এস। চা খেতে হবে না? কেটলির জল এদিকে ফুটে যাচ্ছে।'

তারা কাঠ নিয়ে ভেতরে আসবার পর ব্যানফোর্ড উনুনের ওপর থেকে কয়েকটা গরম রুটি নিয়ে এসে, একটু বিরক্ত ভাবে জিগগেস করলে, 'তোমরা ওখানে কি করছিলে? কাঠ চেরার শব্দ তো অনেক আগেই থেমে গেছে শুনলাম।'

'ও আমরা গোলা ঘরের ইঁদুর আসবার গর্তটা বন্ধ করছিলাম,' হেনরি বললে।

'বাঃ, আমি তো তোমাদের ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তোমার শার্ট এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল,' ব্যানফোর্ড বললে।

'হ্যাঁ, আমি করাতটা তুলে রাখছিলাম।'

তারা এবার চা খেতে বসল। মার্চ একেবারে নীরব। তার মুখ ফ্যাকাশে, ক্লান্ত।

ব্যানফোর্ড হেনরির দিকে চেয়ে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'শুধু শার্ট গায়ে দিয়ে তোমার শীত করছে না?'

হেনরি প্লেট থেকে মুখ তুলে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ব্যানফোর্ডের দিকে তাকিয়ে, তার স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বললে, 'না, শীত করছে না। বাইরের চেয়ে ঠাণ্ডা এখানে অনেক কম।'

'কম হলেই ভালো,' ব্যানফোর্ডের স্বরে বেশ বিরক্তি।

হেনরি আবার বিনীত ভাবে বললে, 'ও, আমি ভুলে গিয়েছিলাম কোট না গায় দিয়ে চা খেতে বসা তুমি আবার পছন্দ কর না।'

সত্যিই পছন্দ না করলেও ব্যানফোর্ড তাচ্ছিল্যের ভান করে বললে, 'না, ওতে আমার কিছু আসে যায় না।'

'গিয়ে কোটটা আনব নাকি?'

হেনরির দিকে ফিরে মার্চ শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললে, 'না, তার দরকার নেই, এতেই যদি ঠিক আছ মনে হয়, তাহলে কিছু আর করতে হবে না।'

'হ্যাঁ, যদি আমায় অভদ্র না মনে কর, তাহলে বলব আমি এতেই বেশ আছি।'

ব্যানফোর্ড টিপ্পনী কাটলে, 'সাধারণত এটা অভদ্রতা বলেই লোকে মনে করে। তবে আমরা গ্রাহ্য করি না।'

মার্চ হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'কি বলছ, লোকে অভদ্রতা বলে মনে করে ? কে অভদ্রতা বলে মনে করে ?'

'কেন নেলী, তুমিই মনে কর। অবিশ্যি আর কারুর বেলায় হলে।' ব্যানফোর্ড বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে। কিন্তু মার্চের তখন সে কথায় আর কান নেই। আবার সে আনমনা হয়ে গেছে।

সাধারণত চায়ের পর হেনরি কোনো একটা বই নিয়ে পড়তে বসে। গ্রামে সে খুব কমই যায়। একবার বই পড়তে বসলে তার আর কোনো খেয়াল থাকে না। সেদিন 'ক্যাপ্টেন মেনরীডের' একটা বই ব্যানফোর্ডের শেলফ থেকে নিয়ে সে পড়তে বসে গেল। ব্যানফোর্ডের বসবার ঘরটি বেশ পরিপাটি করে সাজান। সেখানে খাকি পোশাক পরা হেনরির উপস্থিতি কেমন একটু বেখাপ্পা লাগে। ব্যাপারটা ব্যানফোর্ডের পছন্দ হয় না।

মার্চ টেবিলের একধারে বসে অন্যমনস্ক ভাবে ক্রুশের কাজ করে যাচ্ছে। ব্যানফোর্ডও একটা নিচু চেয়ারে বসে পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু কি যেন একটা অস্বস্তি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। হঠাৎ এক সময় চোখ দুটো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ব্যানফোর্ড বলে উঠল, 'ওঃ, চোখ দুটো আজ বড্ড কষ্ট দিচ্ছে।'

হেনরি বই থেকে মুখ তুলে তাকাল কিন্তু কোনো কথা বললে না। শুধু মার্চ অন্যমনস্ক ভাবে জিগগেস করলে, 'তাই নাকি জিল ?'

হেনরি ততক্ষণে আবার পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ব্যানফোর্ড কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না। খানিক বাদে মার্চের দিকে চেয়ে একটু কুটিল ভাবে হেসে বললে, 'এক পেনি দর রইল নেলী।'
সচকিত আয়ত চোখে ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ মার্চ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে ক্রমশ সমস্ত বাড়ির চারধারে সেই শিয়ালের মধুর কোমল গান শুনছিল। অস্পষ্ট ভাবে সে জিগগেস করলে, 'কি?'
ব্যানফোর্ড বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, 'একটা পেনি দেব। তেমন গভীর যদি হয় তবে দু'পেনিও দিতে পারি।'
হেনরি তখন তাদের দিকে স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে।
মার্চ অস্পষ্ট ভাবে ব্যানফোর্ডকে জবাব দিলে, 'মিছিমিছি বাজে খরচ করে লাভ কি?'
'বাজে কেন? কাজের খরচই হবে মনে হচ্ছে।'
'বাতাসটা কি ভাবে বইছে শুধু তাই ভাবছিলাম, আর কিছু নয়।' মার্চ জবাব দিলে।
'নাঃ পয়সাটা নষ্টই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে,' ব্যানফোর্ড বললে।
'বেশ,' মার্চ বললে, 'পয়সা তোমায় দিতে হবে না।'
হেনরি হেসে উঠল, 'সত্যি সত্যি তোমরা এ ব্যাপারে পয়সা দেওয়া-নেওয়া কর নাকি?'
'তা করি বৈকি', ব্যানফোর্ড বললে, 'শীতকালে তো কখনো কখনো নেলীকে আমার হপ্তায় এক শিলিং পর্যন্ত দিতে হয়। গরমকালে অবশ্য আমার লোকসান অনেক কম।'
হেনরি বললে, 'এরকম কথা কখনো শুনিনি।'
ব্যানফোর্ড জবাব দিলে, 'একটা শীত আমাদের মতো এই চাষ-বাড়িতে কাটাতে হলে এত অবাক হতে না।'
'তোমাদের তাহলে এখানে এত খারাপ লাগে?' হেনরি জিগগেস করলে।

'বিরক্তি লাগে,' সংক্ষেপে বললে ব্যানফোর্ড।

'কিন্তু বিরক্তি লাগবেই বা কেন? আমার তো এখানে খুব ভালোই লাগে।' বললে হেনরি।

'শুনে খুশিই হলাম,' বলে ব্যানফোর্ড আবার বই পড়ায় মন দিলে। ব্যানফোর্ডের বয়স এখনো ত্রিশ হয়নি। তবু মাথায় অনেকগুলি পাকাচুল দেখা দিয়েছে। মনের বিরক্তিতে নিজের আঙুল কামড়াতে কামড়াতে সে হেনরিকে লক্ষ্য করছিল। হেনরি একদৃষ্টে মার্চের দিকে তাকিয়ে আছে।

মার্চ একমনে ক্রুসের কাজ করে যাচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে সে চমকে উঠে নিজেরই অজ্ঞাতসারে বলে উঠল, 'ওই তো সে।'

ব্যানফোর্ড অবাক হয়ে সোজা হয়ে বসে বললে, 'কি, হয়েছে কি তোমার নেলী?'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠে মার্চ দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কিছু নয়, কিছু নয়। একটা কথা বললেই দোষ?'

'কথার মাথা মুণ্ড তো থাকা চাই? কি তুমি বলছিলে?'

'জানি না কি বলছিলাম,' মার্চ একটু বিরক্ত হয়েই বললে।

এবার ব্যানফোর্ড একটু যেন ভয় পেয়েই বললে, 'আমার ভাবনা হচ্ছে, নেলী। তোমার মাথার ঠিক আছে তো? কথাটা কি হেনরিকে লক্ষ্য করেই বলেছিলে?'

'তাই হবে হয়তো,' সংক্ষেপে বললে মার্চ। শিয়ালের ব্যাপারটা সে কক্ষনো স্বীকার করবে না।

নটার সময় মার্চ একটা ট্রেতে করে কিছু রুটি, পনীর ও চা নিয়ে এল। এক গ্লাশ দুধের সঙ্গে একটু রুটি খেয়ে ব্যানফোর্ড খানিক বাদে বললে,

'আমি শুতে যাচ্ছি, নেলী। মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে আছে। তুমি আসছ নাকি ?'

'হ্যাঁ, এই ট্রেটা রেখেই আসছি,' বললে মার্চ।

'দেরি কোরো না যেন, গুডনাইট হেনরি, তুমি যদি সব শেষে আস তাহলে আগুনটার ব্যবস্থা করে এসো।'

'হ্যাঁ, তা করব,' হেনরি তাকে আশ্বস্ত করলে।

মার্চ রান্নাঘরে যাবার জন্য বাতি জ্বালছিল। ব্যানফোর্ড তার বাতিটা নিয়ে উপরে চলে গেল। মার্চ আগুনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হেনরিকে বললে, 'তুমি আগুন-টাগুন নিবিয়ে, সব দেখে শুনে শুতে যাবে তো ?' কোমরে একটা হাত দিয়ে মার্চ তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মৃদু কোমল স্বরে হেনরি বললে, 'আমার কাছে এক মিনিট বসো।'

'না, আমায় যেতে হবে। জিল অপেক্ষা করে আছে। আমি না গেলে অস্থির হয়ে উঠবে।'

'সন্ধ্যেবেলা অমন চমকে উঠেছিলে কেন ?' জিগগেস করলে হেনরি।

'কখন চমকে উঠেছিলাম ?'

'কেন মনে পড়ছে না ?'

'ও, তখন ?' অদ্ভুত ভাবে একটু হেসে মার্চ বললে, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি সেই শিয়াল।'

'শিয়াল ! কেন, শিয়াল কেন ?' হেনরি আবাক হয়ে জিগগেস করলে।

'গত বছর গরমের সময় ঠিক আমার পায়ের কাছে আমি একটা শিয়াল দেখেছিলাম। শিয়ালটা সোজা আমার চোখে চোখে চেয়ে ছিল। কি জানি তাইতেই মনের ওপর হয়তো একটা ছাপ পড়ে থাকবে।'

'গুলি করেছিলে নাকি ?' জিগগেস করলে হেনরি।

'না, আমার দিকে অমন সোজা-সুজি তাকাতে, এমন চমকে গিয়েছিলাম

—বিশেষ করে চলে যেতে যেতে যখন ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে তাকায়।'

হেনরি হেসে উঠে বললে, 'হাসি মুখে! খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল দেখছি।'

'না, ভয় পাইনি, শুধু মনে একটা ছাপ রেখে গেছে এই পর্যন্ত।'

অদ্ভুত ভাবে হেসে হেনরি বললে, 'তুমি আমায় সেই শিয়াল ভেবেছিলে, কেমন তাই না?'

'হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হয়েছিল। হয়তো আমার অজান্তে তার কথা আমার মনের ভেতর রয়ে গেছে।'

হেনরি হাসতে হাসতে বললে, 'তোমার বোধহয় ধারণা আমি তোমাদের মুরগী বা আর কিছু চুরি করতে এসেছি।'

কোনো জবাব না দিয়ে মার্চ শূন্য দৃষ্টিতে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল।

হেনরি আবার বললে, 'এক মিনিট একটু বসবে না?' তার কণ্ঠস্বরে কোমল মিনতি।

মার্চ বললে, 'না, জিল অপেক্ষা করে আছে।' কিন্তু যাবার তার কোনো লক্ষণ নেই।

হেনরি গলা আরও নামিয়ে বললে, 'আমার কথাটারও কি উত্তর দেবে না?'

'কি কথা, আমি বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, খুব পারছ। তুমি আমায় বিয়ে করবে কিনা, সে কথার উত্তর দাও।'

'উত্তর আমি দেব না,' সোজাসুজি মার্চ বললে।

'দেবে না?' তেমনি হেসে হেনরি বললে, 'আমি সেই শিয়ালের মতো বলে? বল, তাই তো?'

নীরবে মার্চ হেনরির দিকে চেয়ে রইল। হেনরি আবার বললে, 'আমার

বিরুদ্ধে তোমার ঐ কল্পনা আমি বাধা হয়ে থাকতে দেব না। দাঁড়াও আলোটা একটু কমিয়ে দিই। আমার কাছে এসে একমিনিট বসো।'
হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলোটা সে কমিয়ে দিলে। ছায়ার মতো সেই আবছা আলোয় মার্চ তখনো নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে। হেনরি ধীরে ধীরে উঠে তার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পর তার কাঁধের উপর হাত রেখে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'একটু খানি থাক, শুধু একটু। সত্যিই আমায় শিয়ালের মতো তুমি নিশ্চয়ই ভাব না ? বল, ভাব কি ?' তার কোমল কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অস্পষ্ট বিদ্রূপের হাসির স্পর্শ যেন আছে। মার্চ তখন মুখটা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে এনে হেনরি তার গ্রীবাদেশে চুম্বন করলে। মার্চ একটু কেঁপে উঠল কিন্তু সরে যেতে পারল না, হেনরি সবল হাতে তাকে ধরে আছে। আবার তার গ্রীবার উপর চুম্বন করে সে বললে, 'আমার কথার উত্তর দেবে না ? এখনো দেবে না ?' মার্চের অধর স্পর্শ করবার জন্যে সে তাকে আরও কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করছে। কানের কাছে গালের উপর সে আর একবার চুম্বন করল।
সেই মুহূর্তে উপর থেকে ব্যানফোর্ডের ডাক শোনা গেল—তার কণ্ঠস্বরে বেশ বিরক্তি।
মার্চ চমকে উঠে বললে, 'ওই জিল ডাকছে,' ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের মতো চকিতে হেনরি মার্চের মুখের উপর তার অধর বুলিয়ে নিয়ে গেল। মার্চের মনে হল তার দেহের সমস্ত তন্তু যেন দগ্ধ হয়ে গেল। সে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল।
হেনরি তখনো কোমল স্বরে বলে চলেছে, 'বল, বল তুমি রাজী ? বল, বল।'
বাইরের অন্ধকার থেকে ব্যানফোর্ডের ডাক শোনা গেল, 'নেলী, নেলী এত দেরি করছ কেন ?'

কিন্তু হেনরি তাকে জোর করে ধরে রেখে সেই একই কথা গুঞ্জন করে চলেছে, 'বল, বল তুমি আমায় বিয়ে করবে। বল, হ্যাঁ।'

মার্চের মনে হল যে তার ভেতর পর্যন্ত পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কোনো ক্ষমতা আর তার নেই। অস্পষ্ট স্বরে সে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা তুমি চাও তাই আমি বলছি। শুধু আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, জিল আমায় ডাকছে।'

হেনরি বললে, 'তুমি কথা দিয়েছ যেন মনে থাকে।' তার গলার স্বরে যেন শিকার ধরার উল্লাস।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার মনে আছে।' হঠাৎ সে তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করে বললে, 'জিল আমি আসছি।'

চমকে উঠে হেনরি তাকে ছেড়ে দিলে। মার্চ সোজা উপরে উঠে গেল।

সকালে খাবার টেবিলে বসে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হেনরির মনে হল, এখানে একজনের বেশ সুখেই কেটে যেতে পারে। ব্যানফোর্ডকে হঠাৎ সে বললে, 'ব্যাপারটা জান তো?'

'কি?' ব্যানফোর্ড জিগগেস করলে।

মার্চ তখন রুটিতে জ্যাম মাখাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে হেনরি যেন অনুমতি চাইলে, 'বলব?'

মার্চ তার দিকে মুখ তুলে তাকাল। তার সমস্ত মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে। 'হ্যাঁ, জিলকে বলতে পার। তবে আশা করি গ্রামের সবাইকে বলে বেড়াবে না।' মার্চের রুটিটা মনে হল গলা দিয়ে আর নামছে না।

ব্যানফোর্ড ক্লান্ত চোখে তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিগগেস করলে, 'কি, ব্যাপারটা কি?'

হেনরি যেন মস্ত বড় একটা গোপন কথা চাপবার ভান করে হেসে বললে, 'তোমার কি মনে হয়?'

'কি করে আমি জানব?' বললে ব্যানফোর্ড।

'কিছু একটা আঁচ করতেও পারছ না ?'

'না, পারছি না,' বললে ব্যানফোর্ড, 'তা ছাড়া আমি চেষ্টা করতেও চাই না।'

হেনরি সোল্লাসে বললে, 'নেলীর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে।' ব্যানফোর্ড ছুরিটা নামিয়ে রেগে বিমূঢ় ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলে, 'কি হচ্ছে ?'

'আমাদের বিয়ে হচ্ছে, হচ্ছে না নেলী ?'

'তুমি অন্তত তাই বলছ,' মার্চ জবাব দিলে। কিন্তু তার মুখ তখন আবার লাল হয়ে উঠেছে।

ব্যানফোর্ড অসহায় কাতর ভাবে মার্চের দিকে তাকাল। সে যেন দুর্বল ছোট্ট একটা পাখি, এইমাত্র গুলিতে বিদ্ধ হয়েছে। ব্যাকুল ভাবে সে বলে উঠল, 'কক্ষনো তা হতে পারে না। এ মিথ্যে !'

'না, সম্পূর্ণ সত্যি।' হেনরির মুখ উজ্জ্বল, উল্লসিত।

ব্যানফোর্ড টেবিলের ধারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারব না। এ একেবারে অসম্ভব।'

হেনরি তার সেই মখমলের মতো কোমল অথচ উদ্ধত কণ্ঠে বললে, 'কেন তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না ?'

'কেন ?' ব্যানফোর্ড ধীরে ধীরে বললে, 'এত বড়ো নির্বোধ নেলী কিছুতেই হতে পারে না। তার আত্মসম্মান সে কিছুতেই হারাতে পারে না।'

'আত্মসম্মান সে হারাচ্ছে কি করে ?' জিগগেস করলে হেনরি।

ব্যানফোর্ড চশমার ভেতর দিয়ে তার শূন্য দৃষ্টি হেনরির দিকে নিবদ্ধ করে বললে, 'যদি ইতিমধ্যেই না সব হারিয়ে থাকে।'

হেনরি আরক্ত মুখে গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি তোমার কথা বুঝতেই পারছি না।'

'না পারবারই কথা। পারবে আমি আশাও করি না।' ব্যানফোর্ডের গলার স্বরের সুদূর অস্পষ্টতাই যেন আরও অপমানজনক।

হেনরি কঠিন ভঙ্গীতে চেয়ারে বসে আছে। তার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক। ব্যানফোর্ড তখন বলছে, 'কি যে সে করতে যাচ্ছে তা মার্চ নিজেই জানে না।'

এবার রাগ সামলাতে না পেরে হেনরি বলে উঠল, 'যাই করুক তাতে তোমার কি আসে যায়?'

'তোমার চেয়ে অনেক বেশি আসে যায়,' ব্যানফোর্ড জবাব দিলে। তার কণ্ঠ একদিকে যেমন করুণ তেমনি বিষাক্ত।

মার্চ হঠাৎ চেয়ারটা ঠেলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'যাই হোক এ নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ নেই।' রুটি আর টি-পট নিয়ে সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সেদিন বিছানায় শুয়ে হেনরির কিছুতেই যেন ঘুম আসতে চায় না। ওপরের ঘরে ব্যানফোর্ড ও মার্চ কথা বলছে, সে শুনতে পাচ্ছে। বিছানায় উঠে বসে সে কান খাড়া করে তাদের কথা ভালো করে শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু এতদূর থেকে কিছুই বোঝা গেল না।

তুষার-ঝরা শান্ত শীতের রাত। বাইরে পাইন গাছগুলোর মাথার ওপরে তারাগুলো ঝকমক করছে। দূরে কোথায় একটা খেঁকশিয়ালের ডাক শোনা গেল, কুকুরগুলো তার জবাবে ডাকতে শুরু করেছে।

নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে সে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকেও কিছু শোনা যায় না। অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজাটা খুলে সে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাদের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ভেতর থেকে ব্যানফোর্ডের গলা শোনা যাচ্ছে, 'এ, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। এক মাসের মধ্যেই আমি মারা যাব, আর ও তাই চায় আমি জানি। না নেলী, ওকে বিয়ে করলে তুমি এখানে থাকতে

পাবে না। আমি কিছুতেই ওর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারব না। ওর পোশাকের গন্ধ আমার কাছে অসহ্য। ও টেবিলে বসলে আমি খেতে পর্যন্ত পারি না। কেন যে আহাম্মুকের মতো আমি ওকে এখানে থাকতে দিয়েছিলাম জানি না। কারুর ভালো কিছু করতে গেলে এমনি আঘাতই পেতে হয়।'

'ও তো আর দুদিন মাত্র আছে,' বললে মার্চ।

'হ্যাঁ সেই সান্ত্বনা। একবার গেলে আর যেন ও এ বাড়িতে না ঢোকে। আমি জানি ও তোমার কাছ থেকে কি শুষে নিতে পারবে, তাই শুধু মনে মনে হিসেব করছে। মিসেস্ বার্জেসের কাছে আমি ওর সব কথা শুনেছি। ওকে দিয়ে কোনো দিন ওর ঠাকুরদাদা কোনো কাজ করাতে পারেনি। এখনকার মতো ও যখন-তখন শুধু বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তোমায় বিয়ে করে ও ঠিক একদিন ফেলে পালাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, এ চাষ-বাড়ি আমি ওর হাতে যেতে দেব না। ওকে এখানে ঢুকতেই দেব না। এখনি ও মনে করে, ও যেন আমাদের দুজনেরই মনিব। ও যেন তোমাকে বশ করে ফেলেছে।'

'কিন্তু তা তো করেনি।'

'ও অন্তত তাই মনে করে। না, ওকে কিছুতেই এখানে থাকতে দেওয়া হবে না। তুমি দেখো এ জায়গা যদি ও হাত না করতে পারে, ও তাহলে ঠিক ক্যানাডা কি আর কোথাও পালিয়ে যাবে। যেন তোমায় চেনেই না এমনি ভাবে।'

'আমরা ওকে বলেই দেব যে এখানে থাকা ওর চলবে না।'

'সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, যা বলবার আমিই বলব। যতক্ষণ শরীরে আমার শক্তি আছে, ততক্ষণ যা খুশি করতে ওকে দেব না। আমি তোমায় বলছি নেলী ওর কাছে যদি তুমি ধরা দাও, তাহলে ও তোমায় ঘৃণাই করবে—এমনি ও জঘন্য পশু।'

'অত খারাপ ও নয় বলেই আমার মনে হয়,' বললে মার্চ।

"হ্যাঁ মনে হয়, কারণ ও তোমার কাছে অভিনয় করছে। কিন্তু আর একটু ভালো করে জানলেই তুমি টের পাবে। না নেলী, আমি এটা ভাবতেই পারছি না।'

হেনরি বাইরে থেকে ব্যানফোর্ডের চাপা কান্না শুনতে পেল, সেই সঙ্গে মার্চের সান্ত্বনার স্বর। ঠাণ্ডায় ইতিমধ্যে সে জমে এসেছে। সন্তর্পণে সে আবার বিছানায় ফিরে গেল। কিন্তু কিছুতেই সে ঘুমোতে পারল না। মাথার খুলিটা যেন তার ফেটে যাবে। উঠে পোশাক পরে সে বন্দুকটা নিয়ে, গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বাতাস থেমে আছে, তারাগুলো উজ্জ্বল, পাইন গাছগুলোর মৃদু মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কিছু একটা শিকার করা যায় কিনা খোঁজবার জন্যে একটা বেড়ার ধার দিয়ে সে সন্তর্পণে হাঁটতে শুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তার মনে পড়ল যে, এখন বন্দুক ছুঁড়লে মেয়ে দুটি ভয় পেতে পারে।

তাই এধার-ওধার ঘুরে সে বনের দিকে এগিয়ে গেল। একটা প্রকাণ্ড ওকগাছের চারধারে একটা প্যাঁচার করুণ ডাক শোনা যাচ্ছে। বন্দুক হাতে বনের ধারে সেই ওক গাছটার তলায় গিয়ে সে দাঁড়াল। হঠাৎ কাছের একটা বাড়ির কুকুরগুলো সশব্দে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি সমস্ত গোলাবাড়ি থেকে কুকুরগুলো জেগে উঠে তাতে যেন সায় দিলে। সেই মুহূর্তে হেনরির মনে হল, ইংল্যাণ্ড যেন বড্ড ছোট, বড্ড সঙ্কীর্ণ। এই অন্ধকারেই ইংল্যাণ্ডের সেই বেড়া দেওয়া সঙ্কীর্ণতা সে যেন অনুভব করতে পারছে। রাত্রে এখানে কুকুর যেন বড় বেশি। তাদের ডাক যেন শব্দের বেড়া। খেঁকশিয়ালটাই যে এই সব সোরগোলের মূল তা বুঝে তার মনে হল যে খেঁকশিয়ালটার কোনো আশা-ভরসা এখানে নেই।

যাই হোক একটু সজাগ থাকলে ক্ষতি কি? খেঁকশিয়ালটা হয়তো এদিকেই আসতে পারে। বনের ধারের ছাউনিটার দিকে সে নেমে গেল। সেখানে অন্ধকারে লম্বা ছাউনিটার এক কোণে নিচু হয়ে বসে সে শিয়ালটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তার মনে হল অসংখ্য ছোট ছোট বাড়িতে ঠাসা, কুক্কুর-কণ্ঠ নিনাদিত এই ইংল্যাণ্ডের সেই বুঝি শেষ খেঁকশিয়াল। বন্দুকটা হাঁটুর উপর নিয়ে অনেকক্ষণ একটা গুঁড়ির উপর সে বসে রইল। একবার একটা মুরগীর বাচ্চা তার ওপরকার ঘর থেকে নিচে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ তার পাখা ঝটপটি ও কাতর ডাকে বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হল। হয়তো কোনো ধেড়ে ইঁদুর হানা দিয়েছে ভেবে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কিছু নয় বুঝে আবার বসে পড়ল। ছাউনির বাইরের গেটটার দিকে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ। হাতগুলো গরম রাখবার জন্যে সে পকেটে ভরে রেখেছে, বন্দুকটা তার হাঁটুর ওপরে।

হঠাৎ বাইরের গেটটার কাছে একটা ছায়া যেন সরে যাচ্ছে। পেটে ভর দিয়ে সাপের মতো শিয়ালটা গেটের তলা দিয়ে গলে আসছে। হেনরি নিজের মনেই একটু হেসে বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিলে। এখন কি হবে সে জানে। সে জানে মুরগীদের খাঁচার বাইরের দরজাটার কাছে এসে খেঁকশিয়ালটা মিনিট খানেক তাদের গন্ধ শুঁকবে। তারপর আবার ছাউনিটার চারধারে ঢোকবার আশায় ঘুরে বেড়াবে। একটা ঈষৎ ঢালু ঢিবির ওপরে মুরগীদের খাঁচা থেকে বেরুবার দরজা। ছায়ার মতো শিয়ালটা সেই ঢালু জমিটা বেয়ে উঠে কাঠগুলোতে নাকটা ঠেকিয়ে দিয়ে ভেতরের গন্ধ প্রাণ ভরে শোঁকবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে অতর্কিত বন্দুকের আওয়াজে সমস্ত রাত্রি যেন চুরমার হয়ে গেল। হেনরির কিন্তু অন্য কোনো দিকে লক্ষ্য নেই। মরণ যন্ত্রনায় শাদা পেটটা বার করে শিয়ালটা মাটিতে পা ছুঁড়ছে। হেনরি সে দিকে এগিয়ে গেল।

চারধারে ইতিমধ্যে বেশ গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। মুরগী হাঁস সব কিছুর মিলিত ভীত চীৎকারে সে এক দারুণ হট্টগোল। ওপরের একটা জানালা খুলে গেল, শোনা গেল মার্চ চীৎকার করে জিগগেস করছে, 'কে, কে ওখানে?'

'আমি,' হেনরি জবাব দিলে, 'আমি শিয়ালটা মেরেছি।'

'কি কাণ্ড! আমরা তো ভয়ে আধমরা।'

'তাই নাকি? আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'তুমি হঠাৎ উঠেছিলে কি বলে?'

'শিয়ালটার আসা আমি টের পেয়েছিলাম যে।'

'গুলি করে ওটাকে মেরেছ?'

'হ্যাঁ, এই যে,' বলে হেনরি সদ্য মৃত শিয়ালটার উষ্ণ দেহটা তুলে ধরলে। তারপর 'দেখতে পাচ্ছনা বুঝি, এখুনি দেখাচ্ছি,' বলে পকেট থেকে টর্চ বার করে সেটা জ্বেলে ফেললে।

হেনরি ল্যাজটা ধরে খেঁকশিয়ালটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। অন্ধকারের মধ্যে মার্চ শুধু তার লালচে গায়ের লোম তার পেটের শাদা চামড়াটা দেখতে পেলে। কি যে বলবে সে ভেবে পেল না।

'ভারি সুন্দর দেখতে না?' বললে হেনরি, 'তোমার গলার খুব ভালো ফার হবে।'

'ফার পরবার মেয়ে আমি নই,' জবাব দিলে মার্চ।

'ও!' বলে টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে হেনরি জিগগেস করলে, 'ক'টা বেজেছে?'

মার্চ ব্যানফোর্ডকে জিগগেস করলে, 'ক'টা বেজেছে জিল?' রাত তখন পৌনে একটা।

সেই রাত্রে মার্চ আবার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলে। সে স্বপ্ন দেখলে যে ব্যানফোর্ড যেন মরে গেছে, আর সে যেন কিছুতেই কান্না থামাতে

পারছে না। ব্যানফোর্ডের জন্যে একটা শবাধার দরকার। কিন্তু জ্বালানি কাঠ-কুটো রাখবার জন্যে যে কাঠের বাক্সটা আছে, তা ছাড়া আর কিছু সে খুঁজে পাচ্ছে না। বাক্সের ধারে নরম কিছু একটা আবরণ সে দিতে চায়, কিন্তু খেঁকশিয়ালের চামড়াটা ছাড়া আর কিছুই কোথাও নেই। তাই শিয়ালের ল্যাজটা মুড়ে ব্যানফোর্ডের মাথা রাখবার জন্যে সে একটা বালিশ তৈরি করে দিয়েছে, আর শিয়ালের ছালটা দিয়ে ব্যানফোর্ডের সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়েছে। এই আগুনের মতো লাল আবরণটা দেখে চোখের জলের যেন তার আর বিরাম নেই। কাঁদতে কাঁদতেই সে ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল।

সকালে উঠে প্রথমেই ব্যানফোর্ড আর মার্চ শিয়ালটাকে দেখতে গেল। হেনরি সেটাকে পাগুলো ওপর দিকে করে ছাউনিতে বেঁধে রেখেছে। ভারি সুন্দর একটা জোয়ান মদ্দা শিয়াল। সোনালী লাল তার পিঠের রঙ, পেটটা একেবারে শাদা, ধূসর-কালচে ল্যাজটা ডগার দিকে একেবারে রূপোর মত শাদা।

ব্যানফোর্ড বলে উঠল, 'আহা বেচারা! বড় শয়তান আর চোর। নইলে সত্যিই ওর জন্যে মায়া হয়।'

মার্চ কিছুই বলল না। সে তখন বরফের মতো সাদা ও নরম শিয়ালটার পেটের ওপর কোমল ভাবে হাত বুলোচ্ছে। লোমশ মোটা ল্যাজটার ওপরেও সে কয়েকবার হাত বুলোলে। তারপর শেয়ালের মাথাটা সে হাতে নিলে।

হেনরি পায়চারি করে সে দিকে এগিয়ে আসছে দেখে ব্যানফোর্ড তখন সরে গেছে। শেয়ালের মাথাটা হাতে নিয়ে মার্চ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে। হেনরি কাছে এসে বললে, 'ভারি সুন্দর দেখতে, না?'

'হ্যাঁ, যেমন বড় তেমনি সুন্দর। কতগুলো মুরগী ইনি সাবাড় করেছেন কে জানে!' মার্চ জবাব দিলে।

'অনেকগুলিই করেছেন হয়তো। আর বছর গ্রীষ্মকালে এইটিকেই কি দেখেছিলে মনে হয়?' হেনরি জিগগেস করলে।

'খুব সম্ভব এইটিকেই,' মার্চ বললে।

মার্চকে অনেক করে লক্ষ্য করেও হেনরি যেন তার কুল পায় না। একদিকে কুমারীর মতো সে এমন লাজুক, আর একদিকে এমন কঠিন সাংসারিক রূঢ়। তার বড় বড় কালো চোখে যা ফুটে ওঠে, আর সে মুখে যা বলে, দুইয়ের মধ্যে কোনো মিল নেই।

মার্চ জিগগেস করলে, 'তুমি কি এটার ছাল ছাড়াবে?'

'হ্যাঁ, সকালের খাওয়ার পর এটা টাঙ্গাবার একটা কাঠ পেলেই ছাড়াব।'

'উঃ, কি বিশ্রী গন্ধ। কেন যে হাত দিয়েছিলাম তাই ভাবছি।' মার্চ নিজের ডান হাতটার দিকে চেয়ে বললে। তার হাতে এক ফোঁটা জমাট রক্তও লেগেছে।

হেনরি জিগগেস করল, 'মুরগীগুলো ওর গন্ধ পেলে কিরকম ভয় পায় দেখেছ? দেখ, ওর গায়ের পোকা তোমার গায়ে গিয়ে না ওঠে।'

মার্চ তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, পোকা!'

সেদিন খানিক বাদে একটা তক্তার ওপর ক্রুশ বিদ্ধের মতো শিয়ালের চামড়াটা পেরেক মারা রয়েছে সে দেখতে পেলে। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল তার।

হেনরি রেগেই আছে দেখা গেল। বাইরের ভদ্রতা বজায় রাখলেও ভেতরে ভেতরে কি যেন একটা আগুন তার মধ্যে জ্বলছে। নীরবে একমনে সে নিজের কাজ করে গেল। মার্চের সঙ্গেও আলাপ করবার চেষ্টা করল না।

সেদিন সন্ধ্যায় তারা খাবার ঘরে বসে যে যার কাজ করছে, এমন সময় ব্যানফোর্ড বললে, 'হেনরি তুমি কোন ট্রেনে যাচ্ছ?'

হেনরি কি একটা শেলাই করছিল। তা থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'সকালের ট্রেনে।'

'আটটা দশ, না এগারটা কুড়ির ?'

'এগারটা কুড়ির ট্রেনেই যাব ঠিক করেছি।'

'কাল বাদে পরশু, না ?'

'হ্যাঁ, পরশু।'

'হুঁ,' বলে ব্যানফোর্ড আবার তার চিঠি লেখা শুরু করলে। চিঠি লেখা শেষ হবার পর খামে ভরতে ভরতে সে আবার জিগগেস করলে, 'ভবিষ্যতে কি করবে ঠিক করেছ, জানতে পারি ?'

'কি করব, মানে ?' হেনরির মুখ ক্রোধে বেশ একটু আরক্ত।

'এই তোমার আর নেলীর কথা বলছিলাম। বিয়েটা কখন হবে আশা কর,' ব্যানফোর্ডের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

'ও, বিয়ে!' হেনরি বললে, 'জানি না।

'জান না? তুমি শুক্রবারে চলে যাচ্ছ অথচ ব্যবস্থা কিছুই করে যাচ্ছ না।'

'ব্যবস্থা কি করব ? চিঠিপত্র লিখতে তো আমাদের কোনো বাধা নেই !'

'তা নেই বটে।' তবে আমি এই চাষ-বাড়ির কথা ভেবেই ব্যাপারটা জানতে চাইছিলাম। নেলী যদি হঠাৎ বিয়ে করে বসে, তাহলে আমাকে নতুন একজন অংশীদার খুঁজে বার করতে হবে তো !'

উত্তর কি হবে ভালো করে জানলেও, হেনরি জিগগেস করলে, 'বিয়ে করার পর ও এখানে থাকতে পাবে না ?'

'না, এখানে এত কাজ নেই যে একজন পুরুষ আর তার স্ত্রীর চলে যেতে পারে। বিয়ে যদি করো তবে এখানে থাকবার কথা মনেও এনো না।'

'এখানে থাকবার কথা আমি ভাবছি-ই না,' হেনরি বললে।

'বেশ, তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নেলীর কি হবে ? কতদিন সে আমার সঙ্গে এখানে থাকবে তাহলে ?'

দুজনেই দুজনের দিকে চাইল। হেনরি ও ব্যানফোর্ড, দুজনেরই চোখে সুস্পষ্ট বিদ্বেষ। হেনরি বললে, 'তা আমি বলতে পারি না।'

'বলতে নিশ্চয়ই পার। একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যখন চেয়েছ, তখন কি করতে যাচ্ছ সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা তোমার নিশ্চয় আছে। অবশ্য যদি আগাগোড়াই ধাপ্পা না হয়।'

'ধাপ্পা হবে কেন? আমি ক্যানাডায় ফিরে যাচ্ছি।'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

ব্যানফোর্ড বললে, 'শুনলে নেলী?'

মার্চ এতক্ষণ মাথা নিচু করে শেলাই করে যাচ্ছিল। এবার ঈষৎ আরক্ত মুখ তুলে অদ্ভুত ভাবে হেসে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে সে বললে, 'এই প্রথম শুনলাম যে আমি ক্যানাডায় যাচ্ছি।'

'সব কথাই প্রথম একবার শুনতে হয়, হয় না?' বললে হেনরি।

'হ্যাঁ, তা হয় বটে।' মার্চ আবার শেলাই করতে লাগল।

ব্যানফোর্ড জিগগেস করলে, 'ক্যানাডায় যাবার জন্যে তুমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, না নেলী?'

মার্চ শেলাই বন্ধ করে ছুঁচটা কোলের ওপর রেখে, মুখ তুলে বললে, 'কি ভাবে যাচ্ছি, তা জানলে বলতে পারি। সেপাইএর বৌ হিসেবে জাহাজের খোলে গাদাগাদি হয়ে যেতে পারব না। আমি তাতে অভ্যস্ত নই।'

হেনরি তার দিকে চেয়ে জিগগেস করলে, 'তাহলে আমি আগে চলে যাই আর তুমি আপাতত এখানে থাক, কেমন?'

'আর কোনো উপায় যদি না থাকে তাহলে তাই করতে হবে,' মার্চ বললে।

'এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভালো,' ব্যানফোর্ড বললে, 'একেবারে কিছু ঠিক

করে ফেল না। ও তোমার জন্যে কোনো আস্তানা ঠিক করে ফিরে এলেও তুমি যাবে কি যাবে না তা ঠিক করবার স্বাধীনতা যেন তোমার থাকে। আর কিছু যদি কর তা পাগলামি ছাড়া আর কিছু হবেনা।'

হেনরি বললে, 'তোমার কি মনে হয় না, যাবার আগে মার্চকে আমার বিয়ে করে যাওয়া উচিত? তারপর যেমন সুবিধে হবে এক সঙ্গে, বা আগে পরে এখান থেকে যাব?'

ব্যানফোর্ড বলে উঠল, 'এটা কোনো একটা ব্যবস্থাই নয়।'

হেনরি কিন্তু মার্চের দিকেই চেয়ে আছে। 'তোমার কি মনে হয়?' সে মার্চকে জিগগেস করল।

শূন্য দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে মার্চ বললে, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না, আমায় ভাবতে হবে।'

'কেন?'

'কেন?' ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে হেনরির প্রশ্নটাই আবার উচ্চারণ করে হেসে মার্চ বললে, 'আমার তো মনে হয় ভাববার অনেক কারণ আছে।'

নীরবে হেনরি মার্চের দিকে চেয়ে রইল। সে যেন আবার হেনরির হাত এড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে ব্যানফোর্ডের দলে যোগ দিয়েছে।

'অবশ্য তোমার ইচ্ছে যদি না থাকে তাহলে জোর করে তোমায় কিছু করাতে চাই না।'

ব্যানফোর্ড তিক্ত কণ্ঠে বললে, 'করান উচিত নয় বলেই তো মনে করি।'

শোবার সময় ব্যানফোর্ড কাতর ভাবে মার্চকে অনুরোধ করলে, 'আমার গরম জলের বোতলটা ওপরে নিয়ে আসবে নেলী?'

'যাচ্ছি,' বলে মার্চ ব্যানফোর্ডের সঙ্গে বোতলটা নিয়ে ওপরে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে সিঁড়ির ওপর থেকে মার্চের গলা শোনা গেল, 'গুডনাইট হেনরি, আমি আর নিচে নামছি না। তুমি আলো ও আগুনের ব্যবস্থা কোরো, কেমন?'

পরের দিন হেনরি সারাক্ষণই মুখ ভার করে কাটালে। তার চিন্তার আর বিরাম নেই। সে মার্চকে চেয়েছিল, চেয়েছিল তাকে বিয়ে করে ক্যানাডায় নিয়ে যেতে। মার্চও তার সঙ্গে নিশ্চয়ই যেত। কেন যে সে মার্চকে চেয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। তবু সত্যিই তাকে পাবার পণ সে করেছিল। এমন ভাবে তার সঙ্কল্প ব্যর্থ হওয়ায় তার রাগের আর সীমা নেই। কিন্তু তবু একেবারে হাল সে ছাড়েনি। এখনো চাকা একেবারে ঘুরে যেতে পারে।

ব্যানফোর্ড এগারটা কুড়ির ট্রেনে কাছের ছোট শহরটায় বাজার করতে গিয়েছিল। চারটে পঁচিশের ট্রেনে সে ফিরে এল। একটা বুনো পিয়ার গাছের তলায় হেনরি দাঁড়িয়েছিল। দূরের একটা মাঠে অনেকগুলো জিনিসপত্র হাতে ব্যানফোর্ডকে সেই দিকেই আসতে দেখা গেল। ব্যানফোর্ডকে দেখলেই এখন হেনরির সমস্ত মন যেন বিষিয়ে ওঠে। দৃষ্টির বিষে যদি সত্যিই কোনো কাজ হত, তাহলে ব্যানফোর্ড আর একটুও বোধহয় এগুতে পারত না। মার্চ দূরে একটা টিবির ওপর কি কাজে গিয়েছিল, সেখান থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে এসে ব্যানফোর্ডের হাতের সমস্ত জিনিসপত্র সে নিজে তুলে নিলে। ব্যানফোর্ডের হাতে রইল শুধু একগুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা। পিয়ার গাছের তলায় তাদের অগোচরে দাঁড়িয়ে, মার্চের এই বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পেয়ে হেনরির মন যেন আরও তিক্ত হয়ে গেল। হেনরি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছ দিয়েই দুই বন্ধু এখন পার হয়ে যাচ্ছে। শোনা গেল ব্যানফোর্ড বলছে, 'জিনিসগুলো সব তুমি একাই বইছ কেন? আমিও তো দুএকটা নিতে পারি।'

'কিছু দরকার নেই,' মার্চ বললে, 'আমার জন্যে ভেব না।'

ব্যানফোর্ড ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, 'তা তো বুঝলাম। তুমি মুখে বল—আমার জন্যে ভেবনা—অথচ মনে মনে কেউ তোমার জন্যে ভাবে না বলে নালিশও পুষে রাখ।'

'কখন আমি আবার নালিশ পুষে রাখলাম ?' জিগগেস করলে মার্চ।

'সব সময়। মনে মনে তুমি সব সময়ই ক্ষুণ্ণ। আমি হেনরিকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দিতে চাই না বলে তোমার মনে যথেষ্ট বিক্ষোভ আছে।'

'না, কোনো বিক্ষোভ নেই,' বললে মার্চ।

'আমি জানি আছে। ও চলে গেলে তুমি মনে মনে এই নিয়ে গুমরে মরবে তাও আমি জানি।'

'মনে মনে আমি গুমরে মরব ?' বললে মার্চ, 'আচ্ছা দেখা যাবে।'

'হ্যাঁ, দেখা তো যাবেই। কি করে তুমি নিজেকে এত সস্তা করলে তা আমি ভেবে পাই না, কি করে এত নিচে নিজেকে নামালে !'

'আমি নিজেকে নিচে নামাই নি।'

'তাহলে যা তুমি করেছ তার কি নাম দেব আমি জানি না। তোমার ওপর ভবিষ্যতে ওর কোনো শ্রদ্ধা থাকবে তুমি মনে কর ? সত্যিই আমার ধারণা ছিল তোমার আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট আছে। ওর মতো লোকের কাছে মেয়েদের মাথা উঁচু করে থাকতে হয়। কি রকম স্পর্ধা ওর দেখেছ ? প্রথম যখন উড়ে এসে এখানে জুড়ে বসে, তখনই তা বোঝা গিয়েছিল।'

মার্চ বললে, 'আমরাই ওকে থাকতে বলেছিলাম।'

'বলতে সে বাধ্য করেছিল বলেই।' জবাব দিলে ব্যানফোর্ড, 'আমি সত্যিই ভেবে পাইনা, তোমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার আস্কারা কি বলে তুমি ওকে দাও।'

'আস্কারা আমি মোটেই দিইনি। কাউকে আমি আস্কারা দিই না, তোমাকে পর্যন্ত নয়।' মার্চের গলার স্বর সামান্য একটু বাঁকা।

ব্যানফোর্ড তিক্তস্বরে বললে, 'জানি শেষ পর্যন্ত আঘাতটা আমার ওপরেই ফিরে আসবে।'

নীরবে ঢালু ঘাসের জমিটার ওপর দিয়ে তারা দুজনে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে খানিক তফাতে হেনরি তাদের অনুসরণ করলে।

তাহলে হেনরি সম্বন্ধে এই তাদের ধারণা। যা শুনেছে তাতে সে খুব বিস্মিত অবশ্য হয়নি। গোপনে লোকের কথা শোনা তার স্বভাব। তার সম্বন্ধে যে যাই বলুক তাকে বিশেষ বিচলিত করে না। শুধু কথাগুলো শোনবার পর ব্যানফোর্ডের ওপর তার বিদ্বেষ আরও যেন বেড়ে গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে মার্চের প্রতি আকর্ষণ। তার মনে হয় তাদের দুজনের মধ্যে কি যেন একটা গোপন বন্ধন আছে—এমন এক বন্ধন যার দ্বারা আর সকলের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। এই বন্ধনের জোরে তারা যেন গোপনে পরস্পরকে পেয়েছে।

এখনো তার আশা হয় মার্চ হয়তো তাকে শিগগিরই বিয়ে করতে রাজী হবে, হয়তো এই ক্রিসমাসেই। ক্রিসমাসের আর দেরি নেই। যেমন করে হোক মার্চকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিয়েতে রাজী করিয়ে সে পরম চরিতার্থতা চায়। তারপর ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাবলেই চলবে। এখন তো সে যেমনটি চায় তাই ঘটুক। আজ রাত্রে ব্যানফোর্ড ওপরে চলে যাবার পর যদি মার্চ একটু তার সঙ্গে থাকে, যদি তার কোমল অদ্ভুত সেই ভয়-চকিত মুখ হেনরিকে একটু স্পর্শ করতে দেয়। হেনরি তার সেই আয়ত শঙ্কিত কালো চোখদুটি আরও কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে চায়, তার সেই কোমল বুক একটু স্পর্শ করতে চায়। এই চিন্তায় তার সমস্ত রক্তে যেন আগুন ধরে।

সেদিন চা খাবার জন্যে ঘরে ঢুকে সে একেবারে অবাক হয়ে গেল। মার্চ তার পুরুষালী বেশ ছেড়ে একটা ক্রেপ সিল্কের পোশাক পরে বসে আছে। অবাক হয়ে হেনরি জিগগেস করলে, 'মেয়েলী পোশাক তুমি পর তাহলে?'

মার্চের চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল। হেসে সে বললে, 'নিশ্চয় পরি। মেয়ে হয়ে মেয়েলী পোশাক ছাড়া কি পরব?'

'কেন, যে পোশাক পরতে?'

'ও, সে তো শুধু এখানকার নোংরা কাজ করবার জন্যে।' মার্চের মুখ তখনো কিন্তু রাঙ্গা হয়ে আছে। হেনরি চেয়ার টেনে বসল। কিন্তু সে যেন মার্চের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। ব্যানফোর্ড টেবিলের ওধারে বসে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার অস্তিত্বই যেন হেনরি ভুলে গেছে। হেনরি সবিস্ময়ে বললে, 'সামান্য একটা পোশাকে এত তফাৎ হতে পারে আমি ভাবিনি।'

মার্চ আরও রাঙ্গা হয়ে উঠে বললে, 'কি যা তা বকছ? আমি যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার!' টেবিল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে সে উনুনের ওপরকার কেটলি থেকে টি-পটে জল ঢেলে নিয়ে আসতে গেল।

উনুনের ধারে সে নিচু হয়ে বসেছে। হেনরির মনে হয় সে যেন আর একজন। এতদিন তাকে পুরুষালী যে পোশাকে দেখে এসেছে, তাতে তার মধ্যে নারীত্বের এত কোমল মাধুর্য যে গোপন ছিল তা হেনরি ভাবতেই পারেনি। হেনরির মনের ভেতর এক মুহূর্তে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। তারুণ্যের সীমা ছাড়িয়ে সে যেন জীবনের গুরুভার দায়িত্ব বহন করবার যোগ্য পরিণত-পৌরুষে এসে পৌঁছেচে। একটা অদ্ভুত শান্তি ও গাম্ভীর্য তার মনে।

হঠাৎ ব্যানফোর্ড অধৈর্যের সঙ্গে বলে উঠল, 'দোহাই তোমাদের কেউ কিছু বল। মনে হচ্ছে যেন শবযাত্রায় এসেছি।'

'শবযাত্রা?' মার্চ একটু হেসে বললে, 'যাক আমার স্বপ্ন তাহলে কেটে গেল।'

কাঠের বাক্সে ব্যানফোর্ডের মৃতদেহের কথা হঠাৎ তার মনে পড়েছিল। ব্যানফোর্ড বিদ্রূপ করে বললে, 'তুমি কি বিয়ের স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?'

'হবে বোধহয়।'

'কার বিয়ে?' জিগগেস করলে হেনরি।

'মনে পড়ছে না,' মার্চ জবাব দিলে। আজ সে যেন একটু বেশি আড়ষ্ট বোধ করছে। এই পোশাকে ঠিক সহজ হতে কিছুতেই পারছে না।

পরের দিন সকালে হেনরিকে চলে যেতে হবে, সেই কথাই তারা খানিক আলোচনা করলে। কিন্তু মনের ভেতর আসল যে কথা তাদের রয়েছে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ নীরব।

রাত নটার সময়, রাত্রের শেষ খাওয়া হয়ে যাবার পর হেনরি আশা করছিল ব্যানফোর্ড আগেই শুতে যাবে। কিন্তু সে আজ নীরবে তার চেয়ারে বসেই আছে। অনেকক্ষণ বাদে মার্চ মৃদুস্বরে জিগগেস করলে, 'কটা বেজেছে জিল?'

হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে ব্যানফোর্ড বললে, 'দশটা বেজে পাঁচ।'

অনেকক্ষণ তার পর ঘরে আর কোনো শব্দ নেই। অবশেষে মার্চই আবার বললে, 'এবার তো শুতে গেলে হয়।'

'তুমি গেলেই আমি যাই,' বললে ব্যানফোর্ড।

'বেশ, আমি তোমার গরম জলের বোতল ভরে নিচ্ছি।'

গরম জলের বোতল নিয়ে একটা বাতি জ্বেলে মার্চ ওপরে চলে গেল। ব্যানফোর্ড তখনো তার চেয়ারে বসে আছে। মার্চ আবার নিচে নেমে এসে জিগগেস করলে, 'কই, ওপরে যাবে?'

'হ্যাঁ, এক মিনিট বাদেই যাচ্ছি,' বললে ব্যানফোর্ড। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল ব্যানফোর্ড চেয়ারে বসেই রইল।

হেনরির চোখ যেন বেড়ালের মতো জ্বলছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সে উঠে দাঁড়িয়ে আর এক ফিকির করে বললে, 'আমি যাই। মাদি শিয়ালটা এসেছে কিনা দেখি। ঘুরে ফিরে সেটা এদিকে আসতেও

পারে। তুমি যাবে নাকি নেলী, এক মিনিটের জন্যে? যদি কিছু দেখতে পাই।'

মার্চ বিস্মিত মুখে বললে, 'আমি যাব?'

'হ্যাঁ, চল,' হেনরির কণ্ঠস্বর এমন আশ্চর্য রকমের কোমল, তার মিনতি করার ধরন এমন মধুর! আবার সে মার্চের দিকে চেয়ে বললে, 'এক মিনিটের জন্যে এস!'

হেনরি ওপর থেকে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টির আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মার্চ উঠে দাঁড়াল। ব্যানফোর্ড বলে উঠল, 'এত রাত্রে তুমি নিশ্চয় বাইরে যাচ্ছ না নেলী?'

হেনরি তার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'হাঁ যাচ্ছে এই এক মিনিটের জন্যে।'

মার্চ দ্বিধা ভরে একবার হেনরি একবার ব্যানফোর্ডের দিকে তাকালে। ব্যানফোর্ড যেন সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এর কোনো মানেই হয় না, বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা। ওই পাতলা পোশাকে ঠাণ্ডা লেগে তোমার সাংঘাতিক অসুখ করবে। তা ছাড়া ওই চটি পায় দিয়ে? না, যাওয়া তোমার কিছুতেই হতে পারে না।'

এক মুহূর্ত সবাই নীরব। হেনরি তার পর বললে, 'তোমার অত ব্যস্ত হবার কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। বাইরে তারার আলোয় এক মিনিট দাঁড়ালে এমন কোনো সর্বনাশ কারুর হবে না। আমি খাবার ঘরের সোফা থেকে কম্বলটা নিচ্ছি। চল নেলী।' ব্যানফোর্ডকে উদ্দেশ করে যে কথাগুলো সে বললে, তাতে রাগ ও বিদ্বেষ যত বেশি, নেলীকে অনুরোধ করায় তেমনি কোমলতা তার কণ্ঠস্বরে।

'চল আমি যাচ্ছি,' বলে মার্চ হেনরির সঙ্গে দরজার দিকে ফিরল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ব্যানফোর্ড ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রোগা দুর্বল হাতে নিজের মুখ সে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু তার কাঁধ দুটো

কান্নার আবেগে কাঁপছে। মার্চ দরজা থেকে ফিরে আকুল ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'জিল!' সে ব্যানফোর্ডের দিকে আসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু হেনরি তাকে জোর করে ধরে রেখেছে, তার যেন আর নড়বার ক্ষমতা নেই। স্বপ্নে যেমন হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা নিয়েও শরীর নড়তে চায় না সেই রকম তার অবস্থা।

হেনরি কোমল স্বরে বললে, 'কাঁদুক না, ওকে কাঁদতে দাও। দুদিন আগে বা পরে ওকে কাঁদতেই হবে। কেঁদে মন খানিকটা হাল্কা হলে ওর ভালই হবে।'

মার্চকে ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে সে বার করে নিয়ে গেল। যেতে যেতে মার্চ শেষ পর্যন্ত ব্যানফোর্ডের দিকেই চেয়ে রইল। ঘরের মাঝখানে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে তখনো সে কান্নার আবেগে কাঁপছে।

খাবার ঘর থেকে কম্বলটা তুলে নিয়ে হেনরি মার্চকে বললে, 'এটা গায়ে জড়িয়ে নাও।' সেটা গায়ে জড়িয়ে খিড়কি দরজা পর্যন্ত এসে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে কিন্তু মার্চ পিছু হটে দাঁড়িয়ে বললে, 'জিলের কাছে আমায় যেতেই হবে, আমি যাবই।' হেনরি তাকে ছেড়ে দিলে। কিন্তু সে ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই আবার তাকে ধরে ফেলে বললে, 'একটু দাঁড়াও, এক মিনিট।'

'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' মার্চ বলে উঠল, 'জিলের কাছে আমার যেতেই হবে, কান্নায় বেচারার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

হেনরি তিক্ত স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, যাচ্ছে, তোমার আমার সবাইকারই বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

'তোমার বুক?' মার্চ বলে উঠল।

তেমনি ভাবে তাকে ধরে থেকে হেনরি বললে, 'হ্যাঁ, আমার বুকের মূল্য ব্যানফোর্ডের চেয়ে কি কিছু কম? তোমার কি ধারণা আমার হৃদয় নেই?' মার্চের একটা হাত ধরে সে তার বুকের বাঁ ধারে চেপে

রেখে আবার বললে, 'বিশ্বাস যদি না কর তো নিজেই আমার হৃদয় অনুভব করে দেখ।'

অবাক হয়েই মার্চ যেন সেদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হল। হেনরির হৃদপিণ্ডের গভীর সবল ধকধকানি সে অনুভব করছে। এ যেন বহু দূর থেকে এই জীবনের অতীত কোনো অদৃশ্য লোক থেকে ভয়ঙ্কর এক সঙ্কেত। এই আঘাত তার গভীর অন্তরে গিয়ে যেন বাজছে। সে একেবারে অসহায়। জিলের কথা সে আর ভাবতে পারছে না, জিলকে সে ভুলে গেছে। মার্চের কোমর একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে আস্তে আস্তে বললে, 'চল আমার সঙ্গে, চল আমাদের যা বলবার আছে বলি।' তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে হেনরি দরজাটা বন্ধ করে দিলে। মার্চের যেন কোনো কিছু ভাববারই ক্ষমতা নেই।

বাইরের ছাউনির একটা অন্ধকার কোণে একটা লম্বা নিচু ডালা দেওয়া বাক্সের ওপর পাশাপাশি বসে হেনরি বললে, 'তোমার হাতটা আমায় দাও।'

মার্চ দুটো হাতই তার দিকে এগিয়ে দিলে। হেনরি সে দুটো নিজের হাতে নিয়ে একটু কেঁপে উঠল, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে? বল, আমি চলে যাবার আগে আমায় বিয়ে করবে,' সে মিনতি করে বললে।

'আচ্ছা, আমরা দুজনই নেহাৎ বোকা, নয়?' মার্চ বলে উঠল।

'বোকা কেন?' হেনরি জিগগেস করলে, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে ক্যানাডায় যাও, সেখানে একটা ভালো চাকরি আমার জন্য মজুত আছে। পাহাড়ের কাছে ভারি সুন্দর জায়গা। কেন আমাদের বিয়ে হবে না? সেখানে আমি তোমায় আমার কাছে পেতে চাই, সারা জীবন আমার পাশে তুমি আছ এইটুকু আমি অনুভব করতে চাই।'

'ঠিক তোমার মনের মতো আর কাউকে তুমি অনায়াসে পেতে পার,' বললে মার্চ।

'হ্যাঁ, আমি জানি আমি অনায়াসেই আর কোনো মেয়ে পেতে পারি। কিন্তু যাকে আমি সত্যিই চাই তাকে নয়। এ পর্যন্ত এমন কারুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি যাকে চিরদিনের জন্যে আমি চাই। আমি আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছি। বিয়ে যদি করি তো সারা জীবনের জন্যেই করছি বলে আমি বুঝব। আরও অনেক মেয়ে আছে বটে কিন্তু তারা শুধু সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবার বা দুদণ্ড একটু খেলা করবার মতোই মেয়ে। তাদের কাউকে সারা জীবনের জন্যে বিয়ে করবার কথা আমি ভাবতেই পারি না।'

'তুমি বলতে চাও স্ত্রী হিসেবে তারা ভালো হবে না?'

'হ্যাঁ, তাই বলতে চাই। এমন কথা অবশ্য আমি বলি না যে, তারা তাদের কর্তব্য করবে না। আমার বক্তব্য হল—না, কি যে আমি বলতে চাই আমি জানি না। শুধু যখন তোমার কথা, আমার জীবনের কথা আমি ভাবি তখন বুঝতে পারি এই দুইয়েতে যেন আশ্চর্য মিল খায়।'

'মিল যদি না খায়?'

'আমার তো মনে হয় মিল হবেই।'

অনেকক্ষণ তারা চুপ করে বসে রইল। মার্চের হাত দুটি হেনরি ধরে আছে, কিন্তু অনুরাগের আর কোনো প্রকাশ তার মধ্যে নেই। মার্চ আর দুর্লভ নয় জেনেই যেন এক অসীম দায়িত্বের গুরুভার তাকে সঙ্কুচিত করে রেখেছে।

অনেকক্ষণ বাদে মার্চ বলে উঠল, 'না, আমি বুঝতে পারছি আমি নেহাৎ বোকা।'

'কেন?' হেনরি জিগগেস করলে।

'এই ব্যাপারটার জন্যে।'

'তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করে বলছ?' জিগগেস করলে হেনরি।

'না, নিজেকে লক্ষ্য করেই। আমি খুব আহাম্মুকি করছি।'

‘কেন বলতো ? তুমি সত্যিই আমায় বিয়ে করতে চাও না বলে ?’
‘আমি সত্যিই জানি না। বিয়ে করার আমি বিরুদ্ধে কিনা তা আমি নিজেই ঠিক বলতে পারি না।’
অন্ধকারে হেনরি বিস্মিত ভাবে মার্চের দিকে তাকাল। কি যে সে বলতে চায় তা হেনরি সত্যই বুঝতে পারছে না। সে জিগগেস করলে, ‘এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে তোমার বসে থাকতে ভালো লাগছে কিনা, তাও তুমি জান না ?’
‘না, সত্যিই জানি না। এখানে, না আর কোথাও থাকলে আমি খুশি হতাম তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।’
‘তুমি কি মিস ব্যানফোর্ডের কাছে থাকতে চাও ? তার সঙ্গে শুতে যাওয়াই কি তোমার ইচ্ছে ছিল ?’
খানিক চুপ করে থেকে মার্চ বললে, ‘না, তাও ইচ্ছে ছিল না ?’
হেনরি আবার বললে, ‘সারা জীবন, বুড়ো হয়ে চুল পেকে যাওয়া পর্যন্ত ব্যানফোর্ডের সঙ্গে তুমি কাটাবে বলে ভাবছ ?’
এবারে বিশেষ ইতস্তত না করেই মার্চ বললে, ‘না, জিল আর আমি একসঙ্গে বুড়ি হয়েছি, ভাবতে পারি না।’
হেনরি বললে, ‘যখন আমি বুড়ো আর তুমি বুড়ি হয়ে যাবে তখনো আমরা এইভাবে পাশাপাশি বসে আছি, তুমি ভাবতে পার ?’
‘না, এই ভাবে নয়,’ মার্চ জবাব দিলে, ‘তবে আমি ভাবতে পারি—না, না, আমি পারি না। তুমি বুড়ো হয়েছ আমি ভাবতেই পারি না। সত্যি তা ভয়ঙ্কর !’
‘কি, আমার বুড়ো হওয়া ?’
‘হ্যাঁ, তা ছাড়া কি ?’
‘সময় যখন আসবে তখন অন্তত নয়। তবে সময় তো এখনো আসেনি ? যখন আসবে তখন তুমি আমার কাছে আছ, এই আমি ভাবতে চাই।’

মার্চ বলে উঠল, 'বার বার তুমি বার্ধক্যের কথা কেন তুলছ জানি না। আমি তো আর নব্বুই নই।'

ক্ষুণ্ণস্বরে হেনরি বললে, 'কে বলছে তুমি তাই,' খানিক চুপ করে থেকে হেনরি আবার বললে, 'আমি চাই না যে তুমি আমায় নিয়ে ঠাট্টা কর।'

'তাই নাকি?' বললে মার্চ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেনরি বললে, 'তুমি আমায় বিশ্বাস কর, কর না?'

'হ্যাঁ, করি,' মার্চ যেন ক্লান্ত হয়েই তার কথায় সায় দিলে।

'তা হলে আমি যাওয়ার আগে তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজী?'

'হাঁ, রাজী।'

'বেশ, তাহলে এই ঠিক রইল,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেনরি বলে উঠল।

তারপর অনেকক্ষণ নীরবে আচ্ছন্ন অবস্থায় মার্চের হাত দুটি ধরে বসে রইল। আগুনে যেমন গাছের ডালপালা পুড়ে যায়, তেমনি তার শরীরে সমস্ত শিরা-উপশিরায় রক্ত যেন জ্বলে যাচ্ছে। একবার নিজের অজ্ঞাতে সে মার্চের হাত দুটি বুকের কাছে চেপে ধরলে, তারপর তার অদ্ভুত কামনা-বেগ যখন শান্ত হয়ে এল তখন আবার বাইরের জগত সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠে সে বললে, 'চল আমরা ভেতরে যাই।' বাইরের ঠাণ্ডার কথা এতক্ষণে বুঝি তার মনে পড়েছে।

কোনো কথা না বলে মার্চ তার সঙ্গে উঠল।

'যাবার আগে আমায় একটা চুমু দিয়ে যাও,' বলে হেনরি ধীরে ধীরে মার্চের ঠোঁটের ওপর একটি চুমু খেলে—সে চুম্বনে কেমন একটা ভয়-কম্পিত উত্তেজনা। মার্চও সেই উত্তেজনা, সেই ভীরু কম্পন নিজের মনের মধ্যে অনুভব করলে। তবু সে যেন ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, এখুনি যেন সে ঘুমিয়ে পড়বে।

তারা ভেতরে গেল। বসবার ঘরে আগুনের কাছে একান্ত সঙ্কুচিত

ব্যানফোর্ডের শীর্ণ চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। তারা ঘরে ঢুকতেই সে ফিরে তাকাল। কেঁদে কেঁদে চোখ তার লাল হয়ে গেছে। হেনরির মনে হল ব্যানফোর্ডের চেহারা যেন অস্বাভাবিক ভীতিকর। তার দৃষ্টিতে যেন অমঙ্গলের ইঙ্গিত।

হেনরির উজ্জ্বল উৎসাহদীপ্ত মুখের দিকে ব্যানফোর্ড চাইল। তাকে যেন আরও উজ্জ্বল, আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছে। মার্চের মুখে একটা অদ্ভুত কোমলতা, সে যেন তার মুখ ঢেকে রাখতে চায়।

ব্যানফোর্ড কুৎসিত ইঙ্গিতের সঙ্গে বললে, 'তোমরা শেষ পর্যন্ত এলে তাহলে?'

'হ্যাঁ, এলাম,' বললে হেনরি।

'যতক্ষণ বাইরে ছিলে, তাতে অনেক কিছুই হতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমরা সব ঠিক করে ফেলেছি। যত শিগগির সম্ভব আমরা বিয়ে করব।'

ব্যানফোর্ড বিদ্রূপ করে বললে, 'ও, তোমরা ঠিক করে ফেলেছ তাহলে? আশা করি ভবিষ্যতে আফসোস করবে না।'

'আমিও তাই আশা করি।'

'নেলী এখন শুতে আসছ তো?' ব্যানফোর্ড জিগগেস করলে।

'হ্যাঁ, এইবার যাব।'

'দোহাই তোমার, তাহলে তাড়াতাড়ি এস।'

মার্চ হেনরির দিকে চাইল। উজ্জ্বল চোখে সে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

মার্চের মনে হল এখন যেন সে হেনরির কাছে থাকতে পারলেই বাঁচে। হেনরির সঙ্গে এখুনি যদি বিয়ে হয়ে সব চুকে যেত তাহলেই যেন সে শান্তি পেত। হঠাৎ মার্চ অনুভব করে যে হেনরির কাছেই যেন সে সবচেয়ে নিরাপদ। জিলকে তার ভয় হয়। জিলের সঙ্গে এখন গিয়ে

শোয়া যেন যন্ত্রণা। তাকে সাহায্য করবার জন্যে সে হেনরির দিকে করুণ ভাবে তাকায়।

হেনরি তার মনোভাব কতকটা বুঝতে পারে।

'তুমি আমায় কি কথা দিয়েছ তা আমি ভুলব না,' সে মার্চের দিকে তাকিয়ে বলে।

মার্চ উত্তরে একটু হাসে। সত্যিই হেনরির কাছে সে যে নিরাপদ, তা সে আবার অনুভব করে।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও হেনরির এ সৌভাগ্য রইল না। যাবার দিন সকালে মার্চকে নিয়ে ছয় মাইল দূরের শহরে গিয়ে সে তাদের নাম ভাবী-বিবাহের জন্য রেজেস্ট্রী করে এল। ক্রিসমাসে সে ফিরে আসবে, বিয়েটা হবে সেই সময়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে সুতরাং আগামী বসন্তকালে সে মার্চকে ক্যানাডায় নিয়ে যেতে পারবে আশা করে। বয়স বেশি না হলেও কিছু টাকা সে জমিয়েছে।

হেনরির সামরিক শিবির সল্‌স্‌ব্যরী প্লেন-এ। মার্চ তাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেল। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, জীবনের সব কিছুই যেন তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। ট্রেনের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে হেনরি তার কাছে বিদায় নিচ্ছে। হেনরির দৃষ্টি তারই ওপর নিবদ্ধ, কিন্তু মুখে তার কোনো ভাবান্তর নেই। ট্রেন দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্চের মনে হল শারীরিক উপস্থিতি না থাকলে, হেনরির যেন কোনো কিছুই আর তার কাছে থাকে না। শুধু তার গোলগাল রাঙা মুখটা মার্চের মনে মুদ্রিত হয়ে আছে। কুকুর ছানার খেলার ছলে গর্জন করবার সময় যেমন নাকটা কুঁচকে যায়, হাসবার সময় হেনরি নাকের তেমনি কুঞ্চনটুকু তার মনে পড়ে। কিন্তু হেনরি আসলে যে কি তা সে কিছুই জানে না। হেনরি তাকে ছেড়ে গেলে কিছুই মার্চের মনে অবশিষ্ট থাকে না।

মার্চের কাছে বিদায় নিয়ে যাবার পর আট দিনের দিন হেনরি মার্চের একটা চিঠি পেল। মার্চ লিখেছে—

'প্রিয় হেনরি,

সমস্ত ব্যাপারটা আমি আবার ভেবে দেখলাম। আমার কাছে এখন এটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। তুমি কাছে না থাকলেই আমি বুঝতে পারি, আমি কত বড় বোকা। তুমি কাছে থাকলে সব কিছুর সত্যকার রূপ যেন আমার চোখে ঝাপসা হয়ে যায়। জিলের সঙ্গে থাকলেই তারপর আমার জ্ঞান যেন ফিরে আসে। তখন বুঝতে পারি কি বোকামি আমি করছি। তোমার প্রতিও আমি অন্যায় করছি। আমি মন থেকে যখন বুঝি যে তোমায় আমি সত্যিই ভালবাসি না তখন এই ব্যাপারে তোমাকে অগ্রসর হতে দেওয়া আমার উচিত নয়। লোকে প্রেম সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা বলে আমি জানি, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। যা বাস্তব সত্য তাই মেনে আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে চাই। তোমায় বিয়ে করবার কি কারণ যে আমার থাকতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি জানি, ছেলেমানুষ যখন ছিলাম তখন অনেকের প্রেমে যে রকম হাবুডুবু খেয়েছি তোমার প্রতি সে রকম কোনো ভালোবাসা আমার নেই। আমার কাছে তুমি একেবারে অচেনা এবং চিরকাল তাই থাকবে মনে হয়। সুতরাং কেন আমি তোমায় ।বয়ে করতে যাচ্ছি? জিলের কথা যখন ভাবি তখন তোমার চেয়ে সে দশগুণ স্পষ্ট বাস্তব বলে মনে হয়। আমি তাকে জানি, তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। তার কড়ে আঙুলে যদি কখনো আমার জন্যে ঘা লাগে, তাহলে নিজের ওপর আমার ধিক্কারের অবধি থাকবে না। আমাদের দুজনের একটা মিলিত জীবন আছে, চিরকাল তা না থাকলেও যতদিন তা থাকবে ততদিন তা সত্যকার জীবন বলেই জানব। কে জানে কতদিন আমরা বাঁচব? জিল অত্যন্ত দুর্বল, অসহায়, কত যে দুর্বল তা আমিই জানি। আমি কি ছিলাম

আর তোমার সঙ্গে আমি কি করেছি তা যখন আমি ভাবি তখন আমার সত্যিই ভয় হয় আমার মাথার ঠিক নেই। তুমি আমার সম্পূর্ণ অচেনা শুধু নও, আমাদের দুজনের কোনোখানে কোনো মিল নেই। আর ভালোবাসার কথা যদি বল, শব্দটাই আমার কাছে নিরর্থক। ভালোবাসা কাকে বলে জিলের বেলায় আমি বুঝি, আর এও আমি জানি, তোমার বেলায় সেটা অসম্ভব। ক্যানাডা যাবার কথায় যখন আমি রাজী হয়েছিলাম তখন আমার সমস্ত বুদ্ধি-শুদ্ধি যে লোপ পেয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে কথা মনে হলে নিজের সম্বন্ধে আমি বেশ ভীত হয়ে উঠি। আমার ভয় হয়, হয়তো যা খুশি আমি করে বসতে পারি, আর শেষ পর্যন্ত পাগলা গারদেই আমায় কাটাতে হতে পারে। জিল যে এখানে আছে এ আমার পরম সৌভাগ্য। সে না থাকলে কি যে আমি করে বসতাম আমি জানি না। বন্দুকটা থেকে একটা দুর্ঘটনাও হয়ত ঘটে যেতে পারত। জিলকে আমি ভালোবাসি, তার কাছে থাকলে আমি প্রকৃতিস্থ থাকি। নিজেকে আমার নিরাপদ মনে হয়। এখন যা আমি বলতে চাই তা এই যে, সমস্ত ব্যাপারটা কি আমরা মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না? আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না এবং যা আমার কাছে অন্যায় মনে হয় তা আমি কখনো করব না। সমস্ত ব্যাপারটা ভুল। আমি শুধু তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে এই অনুরোধ করতে পারি যে তুমি সব ভুলে যাও, আর আমায় মনে রেখো না। তোমার খেঁকশিয়ালের চামড়াটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, ঠিকই হয়েছে মনে হয়। আমি তোমার সঙ্গে উন্মাদের মতো যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার এই ঠিকানায় এখনো আছ কিনা জানালে চামড়াটা তোমার কাছে ডাকে পাঠিয়ে দেব।

জিল তোমায় সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। তার মা ও বাবা ক্রিসমাসে আমাদের সঙ্গে থাকছেন। —তোমারই এলেন মার্চ।'

ক্যাম্পে বসে তার জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে করতে হেনরি চিঠিটা পড়লে। কিছুক্ষণের জন্যে মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটা নিদারুণ অযৌক্তিক রাগ ছাড়া আর কোনো অনুভূতি তার নেই। বাধা! আবার বাধা! এই মেয়েটিকে সে চেয়েছে, মরণ পণ করেছে তাকে পাবার জন্যে। এই পৃথিবীতে সেই তার স্বর্গ সেই তার নরক। আর কাউকে কোনোখানে সে চায় না। কোনো রকমে সকাল সে কাটাল। মনের মধ্যে গভীর একটা মতলব ভাঁজায় তন্ময় হয়ে না থাকলে, সে যা খুশি একটা করে বসত। গভীর অন্তর থেকে তার গর্জন করে উঠতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা হয় দাঁতে দাঁত ঘসে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করতে। কিন্তু সে নির্বোধ নয়, সে জানে সমাজ তার ওপরে, তাকে চক্রান্ত করতে হবে। তার মনে এখন ব্যানফোর্ড ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। মার্চের উচ্ছ্বাস সে গ্রাহ্যই করে না। একটি মাত্র কাঁটা তার মনে বিঁধে আছে—ব্যানফোর্ড। তার মনে, তার হৃদয়ে, তার সমস্ত সত্ত্বায় শুধু একটি কাঁটা উন্মত্ততায় বিষিয়ে উঠেছে। এ কাঁটা তাকে বার করতেই হবে। তার জন্যে যদি প্রাণ যায় সেও স্বীকার।

মাথায় এই এক চিন্তা নিয়ে সে চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি চাইতে গেল। ছুটি তার পাওনা নেই সে জানে, তবু ছুটি তাকে নিতেই হবে। ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন সে বোঝে, কিন্তু কাঠের আর তাঁবুর এই বিরাট সৈন্য-শিবিরে ক্যাপ্টেনকে কোথায় যে পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে কোনো ধারণা তার নেই।

অবশেষে অফিসারদের ক্যান্টিনে ক্যাপ্টেনের দেখা সে পেল।

'কি চাও তুমি?' ক্যাপ্টেন জিগগেস করলে।

'আপনি আমায় নিরাশ করবেন না তো?' জিগগেস করলে হেনরি।

'কি চাও, তার ওপর সেটা নির্ভর করছে।'

'চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি আমি পেতে পারি?'

'না, ছুটি চাইবার কোনো অধিকার তোমার নেই।'

'অধিকার নেই আমি জানি। তবু না চেয়েও আমি পারছি না।'

'তোমার জবাব তুমি পেয়েছ।'

'দোহাই আপনার আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।' হেনরি যেন আর দরজা থেকে নড়বে না। এমন একটা অদ্ভুত কি তার চেহারায় রয়েছে যাতে ক্যাপ্টেন খানিকক্ষণ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিগগেস করলে, 'কি, ব্যাপার কি?'

'আমি একটু মুস্কিলে পড়েছি। ব্লুবেরী আমায় যেতেই হবে,' হেনরি বললে।

'বটে, ব্লুবেরী? মেয়েদের পেছনে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' হেনরির মুখ হঠাৎ অত্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার মুখে গভীর যন্ত্রণার রেখা।

ক্যাপ্টেন তা লক্ষ্য করে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে যাও। কিন্তু দোহাই কোনো গোলমাল বাধিও না।'

'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন, কোনো গোলমাল আমি বাধাব না।'

হেনরি কোনোরকমে একটা সাইকেল ভাড়া করলে। ষাট মাইল ভিজে কর্দমাক্ত রাস্তা তাকে পার হতে হবে। পথে কি খাবে কিছুই না ভেবে, বারোটার সময় সে শিবির ছেড়ে সাইকেল চড়ে বার হলো।

মার্চদের গোলাবাড়ির কিছুদূরে কয়েকটা স্কচ 'ফার' গাছ আছে। একেবারে শেষের গাছটি গত গ্রীষ্মেই মরে শুকিয়ে গেছে। জমির গাছ কাটার তাদের অধিকার নেই, তবু জ্বালানি কাঠের এত অভাব যে মার্চ সেটি লুকিয়ে কাটবার ব্যবস্থা করেছে।

হপ্তাখানেক ধরে যখন সুবিধে হয় লুকিয়ে সে দুচারটে কুড়ুলের ঘা তার ওপর দেয়। কেউ যাতে দেখতে না পায় এই ভাবে কখন-সখন দুপাঁচ

মিনিট চোপ দিতেও থাকে। একলা পারবে না বলে করাত দিয়ে কাটবার চেষ্টা সে করেনি। গুঁড়ির দিকে বেশ খানিকটা ফাঁক হলেও গাছটার এখনো পড়বার কোনো লক্ষণ নেই।

ডিসেম্বরের ভিজে স্যাঁতসঁ্যাতে বিকেলবেলা। বনের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে কুয়াশা উঠে সব ছেয়ে দিচ্ছে, ওপর থেকেও অন্ধকার যেন নামবার অপেক্ষায় আছে। দূরের নিচু বনটার ওপারে সূর্য যেখানে অস্ত যাচ্ছে সেখানে আকাশে একটু ফিকে হলুদ ছোপ লেগেছে।

মার্চ কুড়ুলটা নিয়ে গাছটা কাটতে গেল। ব্যানফোর্ডও তার মোটা কোটটা পরে তার সঙ্গে এসেছে। মাথায় তার 'হ্যাট' নেই, পাতলা চুল-গুলো এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে। মার্চ কয়েকবার কুড়ুল দিয়ে ঘা দেবার পর ব্যানফোর্ড বললে, 'আমার ভয় হয় গাছটা শেষ পর্যন্ত ছাউনিটার ওপরেই না পড়ে, আবার তাহলে ছাউনি মেরামত করতে আমাদের ডবল খাটুনি হবে।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাত দিয়ে ভিজে কপালটা মুছে মার্চ বললে, 'না, তার দরকার হবে বলে মনে হয় না।' তার মুখ পরিশ্রমে রাঙা হয়ে উঠেছে।

ছোটখাটো একটি মোটাসোটা গোছের লোক কালো একটা ওভারকোট গায়ে মাঝের মাঠটুকু পার হয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বয়সে খুব বৃদ্ধ নয় তবে দাড়ি সব শাদা হয়ে গেছে, চলাফেরায় কেমন একটু আড়ষ্টতা।

'তোমার কি মনে হয় বাবা? গাছটা ছাউনিটায় এসে পড়তে পারে না?' জিগগেস করলে ব্যানফোর্ড।

বৃদ্ধ বললেন, 'ছাউনি? না ছাউনিটায় পড়তেই পারে না, বরং ওধারের বেড়াটায় পড়তে পারে বলতে পারো।'

'বেড়ায় পড়লে কিছু আসে যায় না, মার্চ বললে।

উড়ো চুলগুলো ব্যানফোর্ড মুখের ওপর থেকে সরিয়ে বললে, 'তাহলে আমার ধারণাই ভুল !'

গাছটা যেন মূলের সঙ্গে সামান্য একটা টুকরো দিয়ে জোড়া আছে মাত্র। বাতাসে নুয়ে পড়ে থেকে থেকে মড়মড় করে উঠছে। একটি লাল পশমের শাল গায়ে দিয়ে মোটাসোটা বেঁটেখাটো একজন মহিলা তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনিই ব্যানফোর্ডের মা। তিনি জিগগেস করলেন, 'এখনো গাছটা পড়েনি ?'

ব্যানফোর্ডের বাবা বললেন, 'পড়বো-পড়বো করছে।' ব্যানফোর্ডের বাবার কথাবার্তার ধরন একটু বাঁকা। তিনি সামনে থাকতে মার্চ কুড়ুল চালাতে নারাজ। ব্যানফোর্ডের বাবাও নিজে পারতপক্ষে কুটোটি নাড়তে চান না। মেয়ের মতোই তাঁর কাঁধে বাতের ব্যথা। সকলেই তাই চুপ করে গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বহু দূরে একটা শব্দ শুনে সবাই সেদিকে তাকাল। মাঠের ওপর দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো ঘাসের জমিতে টক্কর খেতে খেতে সাইকেলে চড়ে কে আসছে।

ব্যানফোর্ডের বাবা বললেন, 'আমাদেরই কেউ হবে মনে হচ্ছে—জ্যাক বোধহয়।'

'হতেই পারে না,' ব্যানফোর্ড বললে।

মার্চও ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে। খাকিপরা লোকটিকে সে-ই একমাত্র চিনতে পারলে। মুখ রাঙা হয়ে উঠলেও সে কোনো কথা বললে না।

ব্যানফোর্ডের বাবা বললেন, 'না, ওতো জ্যাক নয় !'

খানিক বাদেই সাইকেল থেকে ঘর্মাক্ত কাদামাখা অবস্থায় হেনরি গেটের কাছে নামল।

ব্যানফোর্ড যেন একটু ভীতভাবে বলে উঠল, 'সেকি ! এতো হেনরি !'

ব্যানফোর্ডের বাবা কানে একটু কালা। মোটাগলায় একটু তাড়াতাড়ি কথা বলা তাঁর স্বভাব। তিনি বললেন, 'কি, কি ? কে এসেছে বললে ? সেই ছোকরা ? নেলীর সেই ছোকরা ? ও !' তাঁর মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি।

কপাল থেকে ঘামে-ভেজা চুলগুলো সরিয়ে হেনরি তখন তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধের শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়ে তার মুখ যেন আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠল। তবু সে হেসে উঠে বললে, 'এই তো তোমরা সবাই এখানে !' এতখানি পথ সাইকেল করে এসে সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। সমস্ত শরীর দিয়ে তার আগুন বেরুচ্ছে, মাথাটা এমন ঝিম-ঝিম করছে যে কোথায় সে আছে যেন ভালো করে বুঝতে পারছে না। সাইকেলটা বেড়ার ধারে হেলান দিয়ে রেখে সে কাছের একটা ঢিবির ওপর গিয়ে দাঁড়ালো।

'তোমায় অন্তত দেখবার আশা করিনি এটুকু বলতে পারি,' ব্যানফোর্ড মন্তব্য করলে।

হেনরি মার্চের দিকে চেয়ে জবাব দিলে, 'তা করনি বলেই মনে হচ্ছে।'

মার্চ কুড়ুলটা এক হাতে ধরে শিথিল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। হেনরির উজ্জ্বল আরক্ত মুখটা দেখবার পরই তার সব শেষ হয়ে গেছে। তাকে যেন কে বেঁধে ফেলেছে এমনি সে অসহায়।

ব্যানফোর্ডের বাবার মুখে সেই ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি। তিনি জিগগেস করলেন, 'তারপর ইনি কে ? কে ইনি শুনি ?'

ব্যানফোর্ড একটু অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, 'যার কথা তোমায় বলেছি বাবা, সেই মিস্টার গ্রেনফেল।'

'হুঁ, যার কথা বলেছ-ই বটে। সত্যি কথা বলতে কি আর কোনো কথাই তো তোমাদের কাছে শুনিনি।' হঠাৎ তিনি হাত বাড়িয়ে হেনরির সঙ্গে করমর্দন করলেন। মুখে কিন্তু সেই বিদ্রূপের হাসি।

হেনরি চমকে উঠে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলে। তারপর দুজনেই সরে দাঁড়াল। ব্যানফোর্ডের বাবা আবার জিগগেস করলেন, 'সলস্‌বেরি প্লেন থেকে সাইকেল করে আসছ, না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলে হেনরি।

'হুঁ, রাস্তা তো বড় কম নয়। কতক্ষণ লাগল? ঘণ্টা কয়েক নিশ্চয়।'

'ঘণ্টা চারেক প্রায়।'

'বটে? চার ঘণ্টা! হুঁ, তাই তো হবে। কখন ফিরে যাচ্ছ তাহলে?'

'কালকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার সময় আছে।'

'কালকে সন্ধ্যা পর্যন্ত? হুঁ! তোমার আসবার কথা এরা জানত না, জানত কি?' ব্যানফোর্ডের বাবা মেয়েদের দিকে ফিরে তাকালেন। হেনরিও সেদিকে চাইল। সে এইবার একটু অপ্রস্তুত বোধ করছে। গাছটা লক্ষ্য করে সে জিগগেস করলে, 'এটা কাটছিলে দেখছি।'

মার্চ যেন শুনতেই পায়নি, সমস্ত মন তার আচ্ছন্ন। ব্যানফোর্ডই জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, হপ্তা খানেক ধরে এই চেষ্টা করছি।'

'তোমরা নিজেরাই এতটা কেটেছ?'

'একা নেলীই সব করছে, আমি কিছুই করিনি,' ব্যানফোর্ড বললে।

হেনরি মার্চের দিকে ফিরে বললে, 'তাই নাকি? খুব খাটুনি গেছে তাহলে।' মার্চ কিন্তু কোনো জবাব দিলে না। মুখ ফিরিয়ে তখন সে বনের দিকে চেয়ে আছে।

ব্যানফোর্ড তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'জবাব দিচ্ছ না কেন নেলী?'

'কে, আমি?' মার্চ চমকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'কেউ আমায় কিছু জিগগেস করেছে নাকি?'

মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে ব্যানফোর্ডের বাবা বললেন, 'স্বপ্ন দেখছিলে। প্রেমে পড়েছে নিশ্চয়, নইলে দিনে স্বপ্ন দেখে?'

মার্চ যেন অনেক দূর থেকে হেনরির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে জিগগেস করলে, 'তুমি কি আমায় কিছু বললে ?'

'হ্যাঁ, বললাম, গাছটার পেছনে খুব খেটেছ নিশ্চয় !'

'হ্যাঁ, একটু একটু। এতদিনে গাছটার পড়ে যাওয়ার কথা।'

ব্যানফোর্ড বললে, 'আমাদের ভাগ্য ভালো যে গাছটা রাত্তিরে পড়েনি। তাহলে ভয়ে আধমরা হয়ে যেতাম।'

'কাজটা আমি তোমাদের হয়ে শেষ করে দেব ?' জিগগেস করলে হেনরি। কুড়ুলের হাতলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে মার্চ বললে, 'শেষ করতে চাও ?'

'হ্যাঁ তোমাদের ইচ্ছে থাকলে,' বললে হেনরি।

'গাছটা কোনো রকমে পড়লেই আমি বাঁচি,' বললে ব্যানফোর্ড। ব্যান-ফোর্ড জিগগেস করলে, 'কোন দিকে গাছটা পড়বে বল দেখি ? ছাউনিটায় লাগবে নাকি !'

'না, ছাউনিটায় পড়বে না।' হেনরি জবাব দিলে, 'আমার মনে হয় এই দিকে ফাঁকাতেই পড়বে। তবে পাক খেয়ে বেড়াটায় গিয়েও পড়তে পারে।'

'বেড়াটায় লাগতে পারে !' ব্যানফোর্ডের বাবা বলে উঠলেন, 'বেড়াটা তো ছাউনি থেকেও দূরে ! তা ছাড়া যেদিকে গাছটা হেলে আছে তাতে বেড়ায় লাগতেই পারে না।'

'না, আমারও মনে হয়, লাগবে না। ফাঁকায় পড়বার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, সুতরাং ফাঁকায় পড়বে বলেই মনে হয়।'

ব্যানফোর্ডের বাবা বিদ্রূপ করে বললেন, 'পিছন দিকে উল্টে আমাদের মাথায় পড়বে না তো !'

হেনরি তার ওভারকোটটা খুলে রেখে বললে, 'না, তা পড়বে না।' তারপর সামনের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরে যা, সরে যা।'

বাদামি সবুজে মেশানো একটা মদ্দা হাঁসের পেছনে বাদামির ছিটে দেওয়া চারটে মাদী হাঁস প্রাণপণে ডাকতে ডাকতে ওধারের মাঠ থেকে এই দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের উত্তেজনা দেখলে মনে হয় বুঝি 'স্প্যানিস আর্মাডার'-ই খবর তারা নিয়ে আসছে।

ব্যানফোর্ড তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে এগিয়ে গেলো। কিন্তু হাঁস-গুলোর ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন মস্ত কি একটা কথা বলবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করে তারা ব্যানফোর্ডের দিকেই এগিয়ে এলো।

'যা, যা ঘুরে যা, এখানে খাবার-দাবার কিচ্ছু নেই।' ব্যানফোর্ড তাদের কোনো রকমে তাড়াতে না পেরে বেড়াটার ওপর গিয়ে উঠল। গেটটার তলা দিয়ে উঠোনে তাদের পাঠিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। এবার হাঁস-গুলো আবার সার বেঁধে পেছন দিকটা দোলাতে দোলাতে গেটের তলা দিয়ে বার হয়ে গেলো। বেড়াটার পাশে উঁচু ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে তাদের দিকে ফিরে তাকাতে ব্যানফোর্ডের সঙ্গে হেনরির চোখাচোখি হয়ে গেলো।

হেনরি এখন একেবারে স্থির। হেলেপড়া গাছটাকে একবার সে দেখলে, তারপর উড়ন্ত পাখিকে শিকারী যেভাবে বিচার করে সেইভাবে গাছটার দিকে চেয়ে সে ভেবে নিলে—গাছটা যদি ঠিক এই দিক দিয়ে পড়তে পড়তে এইভাবে এতটা পাক খায়, তাহলে ওই ডালটা ঠিক ব্যানফোর্ডের মাথায় গিয়ে লাগবে।

আবার সে ব্যানফোর্ডের দিকে তাকালো। ব্যানফোর্ড তার অভ্যাস-মতো কপাল থেকে চুল সরাচ্ছে। মনে মনে হেনরি তার মৃত্যু হওয়াই যে দরকার তা স্থির করে ফেলেছে। নিজের ভেতরে ভয়ঙ্কর একটা শান্ত শক্তি সে অনুভব করছে। এক চুল এদিক-ওদিকে ভুল করে ফেললেই সে শক্তি তার থাকবে না।

নিজের সমস্ত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সে বললে, 'সাবধান মিস্

ব্যানফোর্ড,' নিজের হৃদয় সে কঠিনভাবে শান্ত করে রেখেছে। ব্যানফোর্ড যাতে না নড়ে তাই তার আসল উদ্দেশ্য।

বাপের বিদ্রূপের স্বর নকল করে ব্যানফোর্ড বললে, 'কে, আমি? আমি সাবধান হব? তোমার কুড়ুলটা আমার গায়ে লাগবে ভাবছ নাকি?'

'না, তবে গাছটা লাগতেও পারে,' গম্ভীর ভাবে হেনরি বললে। কিন্তু তার গলার স্বরে মনে হল, সে যেন মিছিমিছি ব্যানফোর্ডের জন্য ভাবিত হওয়ার ভান করছে।

'কক্ষনো লাগতে পারে না,' ব্যানফোর্ড বললে।

ব্যানফোর্ডের কথা হেনরি শুনলে, কিন্তু পাছে শক্তি হারিয়ে ফেলে তাই সে নিজেকে বরফের মতো শীতল শান্ত করে রেখেছে। 'যদি ধর লেগে যায়। তোমার এদিকে নেমে আসাই ভালো,' সে বললে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখাই যাক না। দেখি ক্যানেডিয়ান কাঠুরের ওস্তাদি।'

কুড়ুলটা হাতে নিয়ে চারদিকে একবার চেয়ে হেনরি বললে, 'তৈরি তাহলে।'

একটি অদ্ভুত স্পন্দহীন উদ্বিগ্ন মুহূর্ত, সমস্ত পৃথিবী যেন স্থির হয়ে আছে। তারপর তার দেহটা যেন আগুনের হল্কার মতো অসম্ভব রকম দীর্ঘ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে মনে হল। তারপর তাড়াতাড়ি সে দুবার গাছটায় কুড়ুলের ঘা দিলে। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকাশে অদ্ভুত ভাবে পাক খেতে খেতে আকস্মিক অন্ধকারের মতো গাছটা মাটিতে এসে পড়ল। ব্যাপারটা যে ঠিক কি ঘটল তা সে ছাড়া কেউই দেখতে পেল না। গাছের ডালের একটা প্রান্ত ব্যানফোর্ডের ওপর এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অদ্ভুত অস্ফুট চীৎকার কেউ শুনল না। কেউ দেখল না কি ভাবে নিচু হয়ে পালাবার চেষ্টা করবার সময় ডালটা ব্যানফোর্ডের ঘাড়ের পেছনে এসে লাগল, কি ভাবে ছিটকে গিয়ে বেড়াটার কাছে তাল-গোল পাকিয়ে ব্যানফোর্ডের দেহটা গিয়ে পড়ল। শুধু হেনরি সব কিছু লক্ষ্য করে

দেখল। দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, যেন একটা বুনো হাঁসকে গুলি করে সে লক্ষ্য করছে। পাখিটার শুধু ডানাই কি ভেঙেছে, না একেবারে গেছে মরে? মারাই গেছে!

তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে মার্চও এমন আর্তনাদ করলে, সন্ধ্যার আকাশ পর্যন্ত যাতে কেঁপে উঠল। ব্যানফোর্ডের বাবার গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুধু বার হল।

হেনরি বেড়াটা ডিঙ্গিয়ে ব্যানফোর্ডের দেহটা যেখানে পড়ে আছে, সেখানে ছুটে গেল। ঘাড় ও মাথার পেছনটা রক্তে মাখামাখি হয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছে। দেহটাকে সে উলটে ধরল, এখনও থেকে থেকে সেটা কেঁপে উঠছে। তবে মারা যে সে গেছে তা হেনরি ভালো করেই জানে। তার জীবনের গভীরতায় এই চরিতার্থতার প্রয়োজন ছিল। এবার সে-ই বাঁচবে। তার অন্তর থেকে কাঁটা বার হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে ব্যানফোর্ডের দেহটাকে নামিয়ে রেখে সে দাঁড়িয়ে উঠল। প্রস্তর কঠিন মূর্তির মতো মার্চ সেখানে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ মড়ার মতো শাদা, চোখ দুটো যেন কালো গভীর জলের কুণ্ড। ব্যানফোর্ডের বৃদ্ধ বাবা পাগলের মতো বেড়াটা ডিঙিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন।

'বোধহয় মরেই গেছে,' হেনরি বললে।

মার্চ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে চীৎকার করে উঠল, 'কি?'

'হ্যাঁ, মারাই গেছে।'

মার্চ এগিয়ে আসছিল। হেনরি তার আগেই বেড়াটা ডিঙিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'কি বললে? মারা গেছে?' তীক্ষ্ণস্বরে মার্চ জিগগেস করলে।

'হ্যাঁ, মারাই গেছে,' হেনরি মৃদুস্বরে বললে।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মার্চের কালো

চোখের দৃষ্টিতে দুর্বল প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা যেন একবার ঝিলিক দিয়ে উঠে ধীরে ধীরে নিভে গেল। মার্চ এই চরম পরাজয়ের পর কেঁপে উঠে অস্ফুট ভাবে ফোঁপাতে শুরু করলে। কান্না ঠিক তা নয়, যে শিশু কাঁদতে চায় না অথচ ভেতর থেকে আঘাত পেয়ে কান্না দমন করবার চেষ্টায় শিউরে ওঠে, এ তারই মতো অশ্রুহীন কান্নার একটা বিকৃত পূর্বাভাষ।
হেনরিই জয়ী হয়েছে। খানিকক্ষণ আত্মসংবরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মার্চ শেষ পর্যন্ত আকুল ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। হেনরি তখনো তার সামনে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই দৃশ্যের সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যে তার নিজের হৃদয়ের সমস্ত বেদনা সত্বেও মনে মনে সে খুশি। এই জেনে খুশি যে সে জয়ী।
অনেকক্ষণ বাদে নিচু হয়ে মার্চের হাত দুটো ধরে সে কোমল স্বরে বললে, 'কেঁদো না, কেঁদো না।'
অশ্রুসিক্ত কাতর অসহায় মুখে মার্চ তার দিকে তাকাল—সে দৃষ্টি অন্ধ চেতনাহীন আত্মসমর্পণের। আর সে হেনরিকে ছেড়ে যেতে পারবে না, হেনরি তাকে জয় করে নিয়েছে। হেনরিও তা জানে, আর তাই সে খুশি। কারণ সে মার্চকে তার নিজের জীবনের জন্যে চেয়েছে, তার জীবনে মার্চকে একান্ত প্রয়োজন।
কিন্তু তাকে জয় করলেও এখনো হেনরি সম্পূর্ণ ভাবে তাকে পায়নি।
যেমন তার মতলব ছিল সেই অনুযায়ী ক্রিসমাসে তাদের বিয়ে হল। দশদিনের ছুটি নিয়ে সে কর্ণওয়ালের সমুদ্রের ধারে তার নিজের গ্রামে গেল। মার্চের পক্ষে আর চাষ-বাড়িতে থাকা যে অসহ্য সেটা সে বুঝেছিল।
মার্চ এখন একান্ত ভাবে হেনরির, তার কাছ থেকে চলে যাওয়ার ক্ষমতাই যেন তার নেই এমনি ভাবে মার্চ হেনরির ছায়ায় ছায়ায় থাকে, তবু সে সুখী নয়। হেনরিকে সে ছাড়তেও চায় না, অথচ তার কাছে সহজও

হতে পারে না। হেনরি এখনো কেমন সম্পূর্ণ সার্থক যেন হতে পারছে না। যদিও সে মার্চকে বিয়ে করেছে, সমস্ত দিক দিয়ে তাকে অধিকারও করেছে, যদিও বাহ্যত মার্চ তারই হতে চায়, তবু হেনরি এখনো যেন সম্পূর্ণ সফল নয়।

কি একটা বাদ থেকে যাচ্ছে। কোথায় মার্চের হৃদয় নতুন জীবনের প্রেরণায় আন্দোলিত হয়ে উঠবে, না, তা যেন আহত রক্তাক্ত হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। বহুক্ষণ ধরে হেনরির হাতে হাত রেখে সে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকে। তার কালো শূন্য চোখে কি যেন একটা গভীর ক্ষত। কথা বললে হেনরির দিকে অস্পষ্ট ভাবে অদ্ভুত এক নতুন ধরনের হাসি নিয়ে তাকায়, প্রেমের পুরানো রীতিতে যে নারীর মৃত্যু হয়েছে, অথচ নতুন রীতি এখনো যে গ্রহণ করতে পারেনি, এ যেন তারই কম্পিত হাসি। এখনো মার্চের মনে হয় ভালোবাসার জন্যে কিছু তার একটা করা উচিত, কিন্তু হেনরি সে ধরনের ভালোবাসাও যে চায় না, তা সে বোঝে। হেনরি চায় একান্ত আত্মসমর্পণ। মার্চের স্বাধীন সত্বা যেন তার প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। নৌকো থেকে জলের তলার শৈবাল-গুলোকে যেমন দেখা যায়। ঠিক তেমনি সে শুধু ছায়াচ্ছন্ন সাগরজলে কোমল পত্রপুঞ্জ মেলে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হবে, কিন্তু কখনো জলের ওপর মাথা তুলে তাকাবে না। হয়তো সমুদ্রের তলায় এই শৈবাল ডাঙার যে কোনো গাছের চেয়ে অনেক বেশি সবল, হয়তো ধ্বংসহীন। কিন্তু জলের তলাতেই তাদের থাকতে হবে, শুধু জলেরই তলায়। নারী বলে তাকেও এই শৈবালেরই মতো হতে হবে।

কিন্তু তার মনের অভ্যাস সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনের ও ভালোবাসার যা কিছু দায়িত্ব, যা কিছু দুর্ভাবনা তাকেই এতদিন ভাবতে হয়েছে, দিনের পর দিন জিলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য নিয়ে সে মাথা ঘামিয়েছে, পরের দিন, পরের বছর কি হবে সেই ভাবনা ভেবেছে। তার নিজের ছোট্ট

পরিধির মধ্যে এক হিসেবে সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের দায়িত্ব সে বহন করেছে। তার নিজের ক্ষুদ্র জগতে সেও সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে দায়ী—এই ছিল তার জীবনের সব চেয়ে বড় প্রেরণা।

কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের দায়িত্ব সে পালন করতে পারেনি। যা অতি সহজ প্রথমে মনে হয়েছিল তাই ক্রমশ চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে, আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। একটি মাত্র ভালোবাসার মানুষকে সুখী করা কি সহজই না মনে হয়েছিল। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করেছে ততই যেন আরও ব্যর্থ হয়েছে। সারা জীবন সে এমনি করে চেষ্টাই করে আসছে কিন্তু যতই সে হাত বাড়িয়েছে, তার কামনার বস্তু ততই যেন দূরে তার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে।

একটা কোনো সমাপ্তি, একটা কোনো লক্ষ্যে পৌছুতে সে চেয়েছিল—কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। শুধু এই অর্থহীন ব্যর্থ চেষ্টা, শুধু যা নাগালের বাইরে তারই জন্য হাত বাড়ান। জিলকে সুখী করতে চাওয়ার ব্যাপারেও তাই। জিল যে মারা গেছে তা ভালোই হয়েছে সে মনে করে, কারণ সে এখন বোঝে জিলকে কোনোদিন সে সুখী করতে পারত না। ভেবে ভেবে মন খুঁত খুঁত করে জিল আরও রোগা আরও দুর্বলই হয়ে যেত। জিলও যদি কাউকে বিয়ে করত তাহলে তার অবস্থাও এই রকমই হত। স্বামীকে সুখী করবার স্ত্রীর এই চেষ্টা, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণ সাধনের এই আকুলতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয়। অর্থ কি যশের দিক দিয়ে ছোটখাটো সাফল্য হয়তো হতে পারে, কিন্তু সাফল্য যেখানে একান্ত কাম্য—কোনো এক প্রিয়জনকে সুখী ও সম্পূর্ণ করার সেই আকুল প্রয়াস নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। মনে হয় শুধু এইটে বা ওইটে করলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ভালোবাসায় হৃদয় যদি শতধাও হয়ে যায়, প্রাণান্ত প্রয়াসে নিজেকে যদি ক্ষয় করেও ফেল, তবু সম্পূর্ণ সুখের মরীচিকা তেমনি নাগালের বাইরেই থাকবে।

সুখের সন্ধানের এ-ই চিরন্তন ইতিহাস। তবু মেয়েদের সুখ ছাড়া, নিজেদের ও সমস্ত পৃথিবীর জন্যে আর কিইবা কাম্য হতে পারে। তাই সেই ভারই নিজেদের কাঁধে নিয়ে মেয়েরা তাদের লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করে। মনে হয় রামধনুর ঠিক তলাতেই কিংবা নীল দিগন্তের কাছাকাছি তাদের লক্ষ্য যেন তারা দেখতে পাচ্ছে। বেশি দূর তা নয়। কিন্তু রামধনুর তলাতেই অতল শূন্যতা। নীল দিগন্ত শূন্যময় সর্বগ্রাসী এক গহ্বর, যেখানে তোমার সমস্ত চেষ্টা, তোমার সমস্ত সত্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যায়।

বেচারা মার্চ! কি উৎসাহ নিয়েই না সে তার নীল লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করেছিল। কিন্তু যত সে অগ্রসর হয়েছে, শূন্যতার উপলব্ধি ততই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত একটা নিদারুণ বেদনা, একটা উন্মত্ততা। ভালোই হয়েছে, সব শেষ হয়ে গেছে। সমুদ্রের তীরে বসে, পশ্চিম দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে সমস্ত চেষ্টার শেষ হয়েছে, এটুকু উপলব্ধি করতে তার ভালোই লাগছে। আর সে ভালোবাসা বা সুখের জন্যে ব্যর্থ সাধনা করবে না। জিল মারা গেছে বলে সে নিশ্চিন্ত। মৃত্যু নিশ্চয়ই মধুর।

কিন্তু মৃত্যু তার নিজের নিয়তি নয়। তার নিয়তি হেনরির ওপরেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু হেনরি যেন আরও বেশি কিছু চায়। হেনরি চায় মার্চ তার মধ্যে অবাধে অসংকোচে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আর মার্চ চায় শুধু চুপ করে বসে থাকতে, পথের শেষ সীমায় বসে শুধু দেখে যেতে। সে দেখতে চায় জানতে চায়, বুঝতে চায়। সে একলা থাকতে চায়; শুধু হেনরি তার পাশে থাক।

আর হেনরি! মার্চ আর কিছু দেখুক আর কিছু বুঝুক—সে চায় না। প্রাচ্যে যেমন মেয়েদের মুখ অবগুণ্ঠনে ঢেকে দেয় তেমনি সে মার্চের নারী-হৃদয় ও আত্মা ঢেকে দিতে চায়। তদ্গত হয়ে মার্চের স্বাধীন

সত্ত্বা যেন ঘুমিয়ে পড়ে। সজাগ সচেষ্ট চেতনা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে গিয়ে মার্চ একান্ত ভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করুক এই হেনরির কামনা। সে শুধু তারই নারী হোক, আর কিছু নয়।

আর মার্চ এত ক্লান্ত। ঘুমকে মৃত্যু বলে জেনে যে শিশু তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তার মতো সে ক্লান্ত। জেদ করে জেগে থাকবার কঠিন চেষ্টায় তার চোখ যেন আরো সে বিস্ফারিত করে রাখে। জেগে সে থাকবেই—সে জানবে, বিচার করবে, মীমাংসা করবে। নিজের জীবনের লাগাম সে নিজের হাতে নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত তার স্বাধীন নারীত্ব সে বজায় রাখবেই। কিন্তু সে যে বড় ক্লান্ত, আর ঘুম এত আসন্ন—আর হেনরির মধ্যে এমন গভীর বিশ্রামের স্বাদ।

তবু পশ্চিম কর্ণওয়ালের উঁচু এলোমেলো পার্বত্য চুড়ার একটা খাঁজের মধ্যে বসে, পশ্চিম সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার দৃষ্টি দূর থেকে আরো দূরে প্রসারিত হয়ে যায়—সেই সুদূর ক্যানাডায়, আমেরিকায়। কি আছে সামনে সে জানবে, দেখবে। হেনরি তার পাশে বসে সিন্ধু-কপোতগুলিকে লক্ষ্য করছে। তার দৃষ্টিতে অসন্তোষের ছায়া, ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা। মার্চ তার মধ্যে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ুক এই সে চায়। কিন্তু মার্চের জেগে থাকবার কি নিদারুণ প্রাণান্তকর প্রয়াস। সে কিছুতেই ঘুমোবে না, কখনও নয়। এক এক সময় তার মনে হয় মার্চকে তার ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। ব্যানফোর্ডকে মেরে না ফেললেই সে পারত। ব্যানফোর্ড আর মার্চ পরস্পরকে মারবে—সেই জন্যেই তাদের ছেড়ে দিলে ভালো হত।

কিন্তু এ শুধু অধৈর্য! সে জানে, সে শুধু পশ্চিমে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। মার্চকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে আছে। শুধু এই ইংলণ্ডের তীর যদি ছেড়ে যেতে পারে। কি ভাবে যেন, ইংল্যাণ্ড তার মধ্যে বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। এই ইংল্যাণ্ড ছেড়ে

সমুদ্র পার হলেই তার বিশ্বাস মার্চ ঘুমিয়ে পড়বে। চোখ বুজে অবশেষে মার্চ তার কাছে ধরা দেবে।

মার্চকে তখনই সে পাবে, সেই সঙ্গে তার নিজের জীবন। নিজের জীবন সে পায়নি বলে তার মনে কেমন একটা জ্বালা ধরে। যতদিন না মার্চ তার কাছে ধরা দিয়ে, তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, ততদিন সে নিজের জীবন পাবে না। নারী হিসেবে মার্চের যা প্রাপ্য, আর যৌবনের পৌরুষের দিক দিয়ে তার যা কাম্য সেই সম্পুর্ণ জীবন তখনই তার আয়ত্ত হবে। এই প্রয়াসের যন্ত্রণা আর তখন থাকবে না। মার্চ নারী হয়ে পুরুষের দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছে—তার মধ্যে পুরুষের এই ছায়া আর থাকবে না। না, নিজের অন্তরের সমস্ত দায়িত্বও মার্চ তার উপর অর্পণ করবে। সেই পরম আত্মসমর্পণের আশাতেই এখনো সে মার্চের সঙ্গে যুঝছে।

পাহাড়ের চূড়ার ধারে বসে থাকতে থাকতে সে মার্চকে বললে, 'একবার সাগর পার হয়ে ক্যানাডায় যাই, দেখবে তোমার অনেক ভালো লাগবে।'

মার্চ সমুদ্র-সীমার দিকে চেয়ে রইল, তার কাছে যেন সব অবাস্তব। তারপর ঘুমে ঢুলে-পড়া শিশু যখন জেগে থাকবার চেষ্টা করে, তার তখনকার সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেনরির দিকে ফিরে তাকিয়ে জিগগেস করলে, 'ভালো লাগবে?'

শান্ত ভাবে হেনরি জবাব দিলে, 'হ্যাঁ।'

মার্চের চোখের পাতা গাঢ় নিদ্রার ভাবে মুদ্রিত হয়ে এল। কিন্তু জোর করে সে আবার চোখ খুলে বললে, 'হয়তো লাগবে। বলতে পারি না। ওখানে যে কি রকম হবে তা আমি জানি না।'

ব্যথিত কণ্ঠে হেনরি বললে, 'শুধু যদি আমরা তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম!'

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

ক্রিসান্থিমাম-এর গন্ধ

ছোট লাইনের ছোট্ট চার নম্বর এঞ্জিন সাতখানা বোঝাই-করা মালগাড়ি টেনে নিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে সেলস্টন্এর দিক থেকে গড়িয়ে আসছে। গতির চাইতে শব্দ বেশি। ঘর্ঘর শব্দে মোড় ঘুরতেই একটি বাচ্চা ঘোড়া লাইনের পাশের ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে, আচমকা ছুট দিয়ে এঞ্জিনকে হারিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝুড়ি হাতে একটি মেয়ে দুটো লাইনের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলছিল আণ্ডার-উড্এর দিকে। এঞ্জিন কাছাকাছি এসে পড়াতে ও একধারে নেমে গেল; দেখতে লাগল একটির পর একটি মালগাড়ি গড় গড় শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে পালাল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ঝোপঝাড় পেরিয়ে এঞ্জিন খোলা জায়গায় পৌঁছে গেছে। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া লাইনের দুধারে ঘাসের সঙ্গে আঠার মতো লেপটে যাচ্ছে। মাঠগুলো শব্দহীন, জনহীন মরুভূমির মতো। মাঠের একপ্রান্তে একটা ডোবা সরগাছে ভর্তি। ডোবার একটা ধার পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। তারই অপর পাশে সন্ধ্যার বাসি আলোয় দেখা যাচ্ছে ব্রিন্সলে কলিয়ারির সরু লম্বা চিমনি। চানক মোয়ানের একধারে আগুন জ্বলছে। পুঞ্জীভূত অঙ্গারস্তূপের ওপর আগুনের শিখা দেখাচ্ছে ডগ্ডগে লাল ঘায়ের মতো। আকাশের গায়ে পুলি-চাকা দুটি ক্রমাগত ঘুরছে, পুলি-এঞ্জিনের ধক্ধকানির সঙ্গে তাল রেখে। খনির মজুরের দল ওপরে উঠে আসছে। আজকের দিনের মতো ওদের ছুটি।

এঞ্জিনটা হুইস্ল্ দিতে দিতে কলিয়ারির কাছগোড়ায় এসে থামল। এখানে অনেকগুলি লাইন পর পর পাতা; লাইনের ওপর সারি সারি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে।

খনির মজুরেরা বাড়ি ফিরছে, কেউ বা একা, কেউ কেউ আবার দল বেঁধে। আবছা আলোয় ওদের দেখাচ্ছে ছায়ার মতো। রেলরাস্তার সাইডিংএর ঠিক তিন ধাপ নিচে একটা নিচু ছাদওয়ালা বাড়ি; টালির ছাদ আঁকড়ে ধরে একটা লতানে গাছ উঠেছে। পাকা উঠোনের আশেপাশে কয়েকটা বিবর্ণ প্রিম্‌রোজ্‌এর ঝোপ। উঠোন ছাড়িয়ে লম্বা বাগান ঢালু হয়ে নেমে গেছে সরু নদীর দিকে। বাগানে কয়েকটা কঙ্কালসার আপেল গাছ আর কিছু শুকনো বাঁধাকপি। বাগানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, রাস্তার দুধারে ক্রিসান্থিমাম-এর সার। শুকনো ডালে এলোমেলো কতকগুলো পাটকিলে-রঙা ফুল ধরেছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন ঝোপের ওপর ছেঁড়া কাপড় শুকোতে দিয়েছে। বাগানের মাঝখানে মুরগীর ঘর। মুরগীর ঘরের দরজা দিয়ে নিচু হয়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। দরজা ভেজিয়ে তালা দিয়ে, মেয়েটি তার কাপড় থেকে খড়কুটো সব ঝেড়ে ফেলে, সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ এলিজাবেথের হাবভাবে প্রভুত্বের ভাব ফুটে আছে, সুন্দর মুখের ওপর ভ্রূ দুটো যেন তুলি দিয়ে টানা। চিকণ চুল পরিপাটি করে বিন্যস্ত। কিছুটা সময় সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল—ছায়ামূর্তির মতো খনির মজুরেরা লাইন ধরে চলেছে। তারপর ও নদীর দিক করে ঢালু পথ ধরল। ওর মুখখানা শান্ত নির্বিকার—দেখলেই মনে হয় জীবনের কাছ থেকে উপরি পাওনার দুরাশা ওর নেই। কিছুটা রাস্তা হেঁটে ও ডাকল: "জন্‌!" সাড়াশব্দ নেই। খানিকক্ষণ চুপ করে আবার বলল, "কোথায় তুমি?"

দুষ্টু একগুঁয়ে ছেলের গলায় জবাব এল, "এই তো আমি!"

এলিজাবেথ ঝোপের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল, "আবার তুমি জলের দিকে গেছ বুঝি?"

এবার আসামী স্বয়ং হাজির—গাট্টাগোট্টা ছোট্ট একটি পাঁচ বছরের

ছেলে। মা-র কাছে এমন ভাবে দাঁড়াল যেন সে কাউকে পরোয়া করে না।

মা তার গলা খানিকটা মোলায়েম করে বলল, "আমি ভেবেছিলুম তুমি আবার সেই জলকাদায়—তোমায় সেদিন বলেছি—মনে আছে তো—খবরদার······"

ছেলেটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, মুখে রা নেই।

এবার মা তার গায়ে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলল, "চলো, বাড়ি ফেরা যাক। অন্ধকার হয়ে আসছে। ওই দেখ তোমার দাদুর এঞ্জিন আসছে।"

ছেলেটি অনিচ্ছায় ছোট ছোট পা ফেলে চলতে লাগল—একগুঁয়েমির প্রতিমূর্তি! পরনে ওর ট্রাউজার ও ওয়েষ্টকোট; সাইজের তুলনায় দুটোরই কাপড় যেমন পুরু তেমনি শক্ত। বেশ বোঝা যায় বড়দের জামা কেটে ওর পোশাক তৈরি হয়েছে।

বাড়ির পথে চলতে চলতে ও মুঠো মুঠো শুকনো ক্রিসান্থিমাম ছিঁড়তে লাগলো, পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দিল রাস্তার ধুলোয়।

ওর মা বাধা দিয়ে বলল, "ছিঃ জন্ অমন করে না।" এলিজাবেথ তিন-চারটে ফুল-শুদ্ধ একটি ডাল ছিঁড়ে নিয়ে গালের কাছে সস্নেহে ধরল। মায়ে ছেলেতে যখন উঠোনের কাছে এসে গেছে, তখন ও একটু ইতস্তত করে ফুলগুলো ফেলে না দিয়ে কোমরের ফিতেতে আটকে রেখে দিল। ওরা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ঘরমুখো মজুরদের দেখছে। ছোট এঞ্জিনটাও ইতিমধ্যে গড় গড় করতে করতে কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে এঞ্জিন ওদের বাড়ির গেটের উলটো দিকে দাঁড়াল।

এঞ্জিনের ড্রাইভার লোকটি বেঁটে, গালে পাকা দাড়ি—ঝুঁকে এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে বেশ খোশমেজাজে হাঁক দিয়ে বলল, "এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?"

এঞ্জিন-ড্রাইভার ওর বাপ। বুড়ো বললে, "গত রবিবার তোকে দেখতে আসতে পারিনি..."

"তা আসতে পারবে না আমি জানতাম।" মেয়ে জবাব দিল।

কথাটা শুনে ওর বাবা যেন একটু আহত হল। পরক্ষণেই আবার হাল্কাস্বরে বলতে লাগল, "ও হো, সৎমার খবরটা পেয়ে গেছিস বুঝি? কী রকম লাগলো ব্যাপারটা— ?"

"কেমন আবার লাগবে—শুভস্য শীঘ্রম্।"

মেয়ের কাছে খোঁচা খেয়ে বাপ বেশ একটু বিরক্ত হল। রাগ ও ক্ষোভ এই দুয়ে মেশা এই বিরক্তি; বলল—"বেঁচে থাকতে হবে তো। এই বয়সে নিজের বাসায় পরবাসীর মতো বাস করতে কার ভালো লাগে। আর, আবার বিয়ে যদি করতেই হয় তবে দেরি করে কি লাভ। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। আমার ব্যাপার নিয়ে অন্য লোকের মাথা ঘামানো কেন বাবু?"

এলিজাবেথ কিছু না বলে ঘর থেকে এক কাপ চা ও এক প্লেট রুটি মাখন নিয়ে এসে এঞ্জিনের পাদানির ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

"আবার রুটি মাখন আনতে গেলি কেন? খালি এক কাপ চা হলেই তো···" চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বাবা বলল, "চমৎকার চা হয়েছে।" আরো দু-একটা চুমুক দিয়ে বলল, "শুনছি, ওয়াল্টার আবার নাকি এক কাণ্ড বাধিয়েছে।"

"সে আবার নতুন কথা কি?"

"সেদিন লর্ড নেলসন্-এ গিয়ে শুনি ও নাকি বাজী রেখে পুরো দশ শিলিংএর মদ গিলেছে।"

"কবে?"

"এই তো গত শনিবার।"

"তা হবেও বা। আমায় তো সপ্তাহান্তে তেইশ শিলিংএর বেশি দেয় না।"

"বেশ লোক যা হোক। টাকা খরচ করার বেড়ে উপায় বের করেছে। ঢক ঢক মদ গেলো, শুয়োরের মতো রাস্তায় গড়াগড়ি দাও!"
এলিজাবেথ মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশেষে চাটুকু শেষ করে ওর বাবা ওকে কাপটা ফেরত দিল। মুখ মুছে বলল, "যাক শোধবোধ হয়ে গেল..."
হাতলটা উঠিয়ে দিতেই ছোট এঞ্জিনটা আবার গোঙাতে গোঙাতে গড়াতে গড়াতে চলতে শুরু করে দিল। এলিজাবেথ লাইনের ওদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে, মজুরের দল ছায়া-মূর্তির মতো বাড়ির পথে চলেছে। পুলি-এঞ্জিন মাঝে মাঝে থামছে আবার ধক্ ধক্ শব্দ করে উঠছে। ডুলি নামছে আর উঠছে। কাতারে কাতারে মজুরেরা চানকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। মেয়েটি ঘরে ফিরে গেল। ওর স্বামী এখনো ফেরেনি।
ওদের ছোট্ট রান্নাঘরটি অগ্নিস্থলীর আগুনে উজ্জ্বল। চায়ের জন্য টেবিল পাতা হয়েছে, চায়ের পেয়ালাগুলো অন্ধকারে ঝকঝক করছে। রান্নাঘরের যে কোনাটা সব চাইতে অন্ধকার, সেখানে বসে জন্ ছুরি দিয়ে একখণ্ড কাঠ কাটবার বৃথা চেষ্টা করছে। এখন সাড়ে চারটা। বাবা এসে পড়লেই ওরা চা শুরু করে দিতে পারে। মাকে জন্ দেখছেই না, কাঠের টুকরোটা কাটতেই ব্যস্ত। ওর একগুঁয়ে মুখটার দিকে তাকিয়ে ওর মা-র মনে হতে লাগল এ ছেলে একেবারে ওর বাপের মতো হয়েছে, নিজেকে ছাড়া কাউকে চেনে না, চায়ও না। ওর স্বামীর ভাবনা ওকে যেন আজ পেয়ে বসেছে। ভাবছে ওয়াল্টার বোধ হয় নিজের বাড়ির দুয়োরের গোড়ায় এসে, ফিরে গেছে মদ খেতে। সেই রাত্তিরে যখন আসবে তখন সব খাবার ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে। একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও আলু সেদ্ধ করার পাত্রটি তুলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে গেল— গরম জলটা ছেঁকে ফেলে দেবার জন্য। সস্‌প্যান্ নিয়ে ও যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে তখন

দেখল বড় রাস্তার হলদে আলোগুলো জ্বালানো হয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারে এখনো মজুরেরা বাড়ি ফিরছে। আগের মতো দল বেঁধে নয়—একটি দুটি করে।

ঘরে ফিরে এসে দেখে আগুন অনেকটা নেমে গেছে—ঘরের রঙ গাঢ় লাল। সসপ্যানটা উনুনের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে, এলিজাবেথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে দ্রুত পা ফেলার শব্দ। দরজা খুলে একটি ছোট মেয়ে ঘরে ঢুকল, বাইরের পোশাকগুলো টেনে খুলে ফেলতেই একরাশ কোঁকড়া চুল ওর মুখ ঢেকে দিল— সোনালি চুলে সবে বাদামি রঙের পাক ধরেছে।

স্কুল থেকে দেরি করে ফেরার দরুণ এলিজাবেথ বকতে লাগল—বলল দেরি করে এলে পর ওকে আর স্কুলে যেতে দেবে না, বড় তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়।

'কই মা, কোথায় অন্ধকার? তুমি তো এখনো আলোও জ্বালাওনি, বাবাও তো বাড়ি ফেরেনি।"

'তা তো ফেরেনি। কিন্তু কটা বেজেছে দেখেছ—পাঁচটা বাজতে মাত্র পনেরো মিনিট। বাবাকে রাস্তায় কোথাও দেখেছ নাকি?"

"না মা দেখিনি তো। বাবা কি বাড়ি ফিরতে ফিরতে আবার ওল্ড ব্রিন্সলের দিকে চলে গেছে নাকি? কই সেখানে তো বাবাকে দেখিনি।"

"তোমার বাবাটি তো আর কচি খোকাটি নন। তুমি যাতে না দেখে ফেল তাই বোধ হয় 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'এ বসেছে। তা না হলে আর এত দেরি হয়?"

মেয়েটি করুণ মুখে মার দিকে তাকাল। বলল, "এসো মা, ততক্ষণ আমরা আমাদের চা খাওয়া সেরে নিই।"

মা জনকে ডাকল টেবিলে। আবার একবার দুয়োর খুলে অন্ধকারে

লাইনের দিকে তাকিয়ে দেখে এল। কোথাও কেউ নেই, পুলি-এঞ্জিনের ধক্‌ধকানিও ইতিমধ্যে থেমে গেছে। আপন মনেই বলল, "নিশ্চয় কোথাও আড্ডা জমাতে গেছে।"

ওরা তিনজনে চায়ে বসল। জন্‌ টেবিলের একপ্রান্তে ঠিক দরজার মুখে অন্ধকার অংশে বসেছে। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটি আগুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে একখণ্ড পাঁউরুটি টোস্ট করছে, লাল আগুনে ওর মুখখানি অদ্ভুত দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। জন্‌ তার অন্ধকার কোণ থেকে দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, "আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে আমার ভারি ভালো লাগে।"

মা জিগগেস করলে, "কেন?"

"কী রকম গনগনে লাল ছোট্ট ছোট্ট গুহা গহ্বর দেখা যায়। আগুন পোহাতে ভালো লাগে না? আমার তো আগুনের গন্ধটাও বেশ লাগে।"

"নাঃ, আর আমাদের চিমনিটা মেরামত না করলেই নয়," মা বলল, "আর তাও কি হাত দেবার জো আছে? তোমাদের বাবা বাড়ি ফিরেই বলতে শুরু করবে 'এমন হতচ্ছাড়া বাড়ি, খেটে-খুটে খনি থেকে একটা লোক এল, আগুনটুকুও পোহাবার উপায় নেই। কেন রে বাপু, সরাবখানাগুলো তো দিব্বি গরম।' "

আবার সব চুপচাপ। ছেলেটি এবার অধীর হয়ে বলে উঠল, "একটু তাড়াতাড়ি করো না, অ্যানি।"

"আমি কি বসে আছি। রুটি সেঁকা হবে তবে তো আনবো।"

মুখখানা বেজার করে জন্‌ বলল, "ও ইচ্ছে করে দেরি করছে।"

"তোমার মনটা তো ভারি ছোট; নিজে যেমন, সবাইকে তেমনি ভাবছো," ওর মা বলল।

একটু পরেই কুড়ুর-মুড়ুর আওয়াজ পাওয়া গেল টোস্ট চিবানোর। মা প্রায় কিছুই খেল না। চা খেতে খেতে ভাবতে লাগল। চেয়ার ছেড়ে

ও যখন উঠে দাঁড়িয়েছে ওর স্পর্ধিত ভঙ্গীতে রাগের ভাব পরিস্ফুট। চুল্লির ওপর পুডিংএর পাত্রটির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল : "বাড়ি ফেরার নাম নেই। পুড়ে ছাই হয়ে যাক সব—ভারি বয়ে গেছে আমার। বাড়ির দরজার সুমুখ দিয়ে চ'লে গেল কিনা মদ গিলতে, আমি এখানে ওঁর খাবার কোলে করে বসে থাকি আর কি…"

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে এক চুবড়ি কয়লা নিয়ে এল। লাল আগুনে একটার পর একটা কয়লার টুকরো ছুঁড়ে দিতে লাগল। উনুনের আলো ঢাকা পড়ায় সমস্ত ঘরটা অন্ধকার। জন্ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল : "বা রে! আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

মা এবার আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। হাসতে হাসতে বলল, "অন্ধকারে মুখের রাস্তাটুকুও হারিয়ে ফেলেছ বুঝি।" কয়লার চুবড়িটা ঘরের বাইরে রেখে এসে ও যেই আবার ঢুকছে অমনি জন্ ফের চেঁচাল : "আমি দেখতে পাচ্ছি না যে!"

"একেবারে বাপকা বেটা! একটু অন্ধকার হয়েছে কি ঘ্যান-ঘ্যান আরম্ভ করে দিয়েছে।"

এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে জনের মা এবার বাতি ধরাতে গেল। ছাদের কড়ি থেকে বাতি ঝুলছে ঠিক ঘরের মাঝখানটাতে। নাগাল পাবার জন্য বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেই দেখা গেল ও সন্তানসম্ভবা।

"মা গো…" অ্যানি চীৎকার করে উঠল।

চিমনিটা লাগাতে লাগাতে মা জিগগেস করল, "কী হল আবার?" তামার চাকতি থেকে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে এলিজাবেথের সুন্দর মুখের ওপর। ও ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে অ্যানির দিকে চাইল।

"তোমার কোমরের ফিতেয় একটা ফুল বাঁধা!" সচরাচর এমনটি ঘটে না বলে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত।

মা এবার হাঁপ ছেড়ে বলল, "তাই বলো। আমি ভাবলুম বাড়িতে

আগুন লাগল নাকি।" চিমনি লাগিয়ে দিয়ে ও সল্‌তেটা একটু উসকে দিল। মেঝের ওপর ওর ছায়াটা ম্লান হয়ে পড়েছে।

অ্যানির মুখে খুশি উপছে পড়ছে। এগিয়ে এসে মা-র কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, "ফুলটা একটু শুঁকি!"

"যাও আর ন্যাকামি করতে হবে না!" বাতির আলোয় দেখা গেল তিনটি প্রাণীই যেন বাড়ির কর্তার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে, অ্যানি তখনো ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। ওর মা একটু বিরক্ত হয়েই ফুলগুলো খুলে নিল।

"ফুলগুলো ফেলে দিও না মা—লক্ষ্মীটি।" অ্যানি ওর মা-র হাত থেকে ফুল কেড়ে নিল।

মা অ্যানির হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, "কী পাগলামোই না করে।"

শুকনো ক্রিসান্থিমামগুলোতে চুমো দিয়ে অ্যানি বলল, "কী মিষ্টি গন্ধ!"

মা একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, "ছাই গন্ধ! ও বিশ্রী ফুলটার কথা আমায় বোলো না। বিয়ে হল যখন, তখন ওর কোটে লাগানো ছিল ক্রিসান্থিমাম, মেয়ের মুখ দেখতে এল, বোতাম-ঘরে ক্রিসান্থিমাম গুঁজে—আর প্রথম যেদিন মদে চুর বেহুঁস লোকটাকে ধরাধরি করে ওরা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, সেদিনও ওর কোটে ক্রিসান্থিমাম গোঁজা।"

জন্ ও অ্যানির দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা মা-র কথা শুনে অবাক হয়ে বসে আছে। দোল-চেয়ারে চুপচাপ কিছুক্ষণ ও বসে রইল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল: "ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট! টেনে হিঁচড়ে না আনলে তো আসবে না। ওইখানেই পড়ে থাকবে। কালিঝুলি মেখে ভূত সেজে এখন যেন আর না ফেরে। ওকে নাইয়ে-ধুইয়ে দিতে আমি পারব না। মেঝেতে পড়ে থাক! কী বোকামি না করেছি। এই যদি কপালে আছে জানতাম তবে কি আর আসতাম এই পচা বাড়িতে। কী বাড়টাই বেড়েছে। নিজের বাড়ির দরজার সুমুখ দিয়ে চোরের মতো

পালায়। গত হপ্তায় দু-দুটো দিন সময় মতো বাড়ি ফেরেনি। আবার শুরু করেছে…"

ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে ও চুপ করে গেল। চেয়ার থেকে উঠে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল।

জন্ আর অ্যানি মেঝের ওপর বসে খেলা করছে। আজ আর ওদের হৈ চৈ নেই, ঝগড়াঝাঁটিও নেই। মার রাগের কথা ও বাবা বাড়ি ফিরলে পর কী কাণ্ডই না হবে এসব নানা কথা ভেবে ওদের খেলায় অন্যদিনকার মতো উৎসাহ নেই। মিসেস বেট্স ইতিমধ্যে হলুদ-রঙা একখণ্ড ফ্ল্যানেল নিয়ে বসেছে— ওয়াল্টারের জন্যে গরম জামা সেলাই করছে। ছেলেদের কথা শুনছে ও দ্রুত সেলাই করে চলেছে। আস্তে আস্তে ওর রাগ কমে আসছে। রাগের স্থান নিয়েছে উদ্বেগ। সেলাই থামিয়ে বাইরের রাস্তায় পায়ের শব্দ শুনছে, চমকে মাথা উঠিয়ে ছেলেদের বলছে "চুপ।" পায়ের শব্দ দরজা পেরিয়ে চলে যেতেই মিসেস বেট্স নিজেকে সামলে নিচ্ছে। ক্ষণিকের ব্যাঘাতের পর জন্ আর অ্যানি আবার তাদের খেলা শুরু করছে।

অ্যানির চোখ ঘুমে ঢুলে আসছে। খেলায় ওর আর মন নেই। জুতো পর পর সাজিয়ে রেলগাড়ি খেলা আর ওর ভালো লাগছে না। নিচু গলায় ডাকল, "মা!"

জন্ ইতিমধ্যে সোফার তলা থেকে থপ থপ ব্যাঙ-লাফ দিতে দিতে বেরিয়ে এসেছে।

"একবার জামার হাতাটার দিকে তাকিয়ে দেখো।"

জন্ কিছু না বলে হাত দুটো ওর মার সামনে ধরল। ইতিমধ্যে লাইনের ওপর থেকে কে যেন ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে উৎকণ্ঠার ভাব কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। দুজন লোক কথা বলতে বলতে পথ বেয়ে চলে গেল।

মা বলল, "এবার শুতে চলো, সময় হয়ে গেছে।"

অ্যানি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "আমার বাবা যে এখনো ফেরেনি।"

মিসেস বেট্‌স ইতিমধ্যে ওর মনকে তৈরি করে নিয়েছে। বলল, "মন খারাপ করে কি হবে। সময় যখন হবে ঠিক ওকে ওরা কাঠের গুঁড়ির মতো ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে।" ও বলতে চায় যে ওয়াল্টার এলে কিছু সোরগোল হবে না। বলল, "কী আর হবে এমন—মেঝেতে পড়ে থাকবে সারারাত। এরপর কাল ওকে আর কাজে যেতে হয় না।"

একখণ্ড ফ্ল্যানেল গরম জলে ভিজিয়ে ওদের মুখ হাত মুছে দেওয়া হল। ওরা দুজনেই চুপচাপ। রাত্রিবাস পরে হাঁটু গেড়ে উপাসনায় বসল জন্‌, বিড়বিড় করে প্রার্থনার কথাগুলো বলতে লাগল। মা দাঁড়িয়ে ওদের দুটিকে দেখছে। অ্যানির ঘাড়ের কাছে গুচ্ছ গুচ্ছ বাদামি-রঙা সিল্কের মতো কোঁকড়া চুল, জনের মাথায় সোজা সোজা কালো রঙের চুল। ওদের দেখে দেখে ওর সমস্ত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল—তিন-তিনটে নিরীহ প্রাণীর মনোকষ্টের কারণ ঘটিয়েছে ওই ওয়াল্টার। অ্যানি ও জন্‌ মা-র কাপড়ে মুখ লুকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

মিসেস বেট্‌স শোবার ঘর থেকে নেমে এসে দেখল রান্নাঘরটা কেমন যেন খালি হয়ে গেছে—একটা উন্মুখ প্রতীক্ষায় সমস্ত ঘরটা থম থম করছে। অনেকক্ষণ বসে একটানা ও সেলাই করে চলল। রাগ ও দুর্ভাবনা এই দুই মনোভাবের দ্বন্দ্বে ওর মন তখন তোলপাড়।

—দুই—

ঢং ঢং করে ঘড়িতে আটটা বাজল। মিসেস বেট্‌স অর্ধসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজটা চেয়ারের ওপর ফেলে উঠে দাঁড়াল। বাইরের দরজাটা খুলে কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল। তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। উঠোনে খড় খড় শব্দ শুনে চমকে উঠল, পরক্ষণেই মনে হল ইঁদুর

ছাড়া কিছু নয়। বাড়ি ভরতি ইঁদুর। অন্ধকার রাত—রেললাইনের ওপর সারি সারি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে, দূরে খনির ধারে কয়েকটা হলদে পাণ্ডুর আলো জ্বলছে, আর জ্বলছে চানকের মুখের কাছে কয়লার লাল আগুন। লাইন ধরে ধরে ও জোর পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করল। লেভেল্ ক্রসিং-এর শাদা গেট পেরিয়ে পড়ল গিয়ে রাস্তায়। রাস্তা দিয়ে কেউ কেউ হেঁটে চলেছে নিউ ব্রিন্সলের দিকে। রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর আলো জ্বলছে। হাত চল্লিশ দূরে 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' শুঁড়িখানার চওড়া জানালাগুলো উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত, ভেতর থেকে বহুকণ্ঠের কলধ্বনি ভেসে আসছে। বোকার মতো ও ভেবে বসে আছে ওয়াল্টারের একটা কিছু বিপদ ঘটেছে। নিশ্চয় ও শুঁড়িখানায় মদ গিলছে। ও একটু ইতস্তত করতে লাগল। এ পর্যন্ত কোনোদিন ওকে আনতে যায়নি, আজকেও যেতে পারবে না। হেঁটে এগিয়ে চলল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলোর দিকে। একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

"মিষ্টার রিগ্‌লে ?...তাকে চান বুঝি ? বাড়িতে নেই তো," রোগা চিম্‌সে একটি মেয়ে বাসন ধুতে ধুতে মিসেস বেট্‌সের দিকে তাকাল।

একটু সম্ভ্রমের সুরে জিগগেস করল, "মিসেস বেট্‌স নাকি ?"

"হ্যাঁ, তোমার কত্তা বাড়ি ফিরেছেন কিনা খোঁজ করতে এলাম। আমার কত্তার তো এখনো দেখা নেই।"

"তাই নাকি ! জ্যাক্ বাড়ি এসে খেয়ে দেয়ে একটু বেরিয়েছে। শুতে যাবার আগে আধঘণ্টাটাক ঘুরে আসবে বলল। 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'-এ একবার দেখে এসেছো ?"

"না—"

"ইচ্ছে হল না বুঝি—তা না হবারই কথা," মিসেস রিগ্‌লের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন সমর্থনের আভাস। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কই জ্যাক্ তো তোমার কত্তা সম্বন্ধে কিছু বলেনি।"

"নিশ্চয় ওখানে জমে গেছে।"

এলিজাবেথ বেট্‌স কথাগুলো একটু তিক্তস্বরে বলল। ও ঠিক জানে যে পাশের বাড়ির গিন্নি আড়ি পেতে ওর সব কথা শুনছে। শুনল তো ওর বয়ে গেল। ও ফিরে যাচ্ছে এমন সময় মিসেস রিগ্‌লে বলল: "একটু দাঁড়াও—আমি চট করে জ্যাককে জিগগেস করে আসি ও কিছু জানে কিনা।"

"না, না—বিরক্ত করে দরকার নেই—"

"বিরক্ত আবার কি? তুমি একটু ঘরের ভেতর এসে বোসো। একটু দেখো, ছেলেগুলো আবার নেবে অগ্নিকাণ্ড না বাধায়···"

মিসেস বেট্‌স একটু আপত্তির ভাব করে ঘরে ঢুকল। বাড়ীর কর্ত্রী ঘরটা অত্যন্ত নোংরা হয়ে আছে বলে ত্রুটি স্বীকার করলেন।

ত্রুটি স্বীকার করারই কথা। সোফার ওপর ছোট বড় নানান রকম কাপড়-চোপড়ের ছড়াছড়ি—কিছু কিছু জামা কাপড় মেঝের উপর গডাগড়ি যাচ্ছে। ঘরময় হরেক রকম খেলনা ইতস্তত ছড়ানো। টেবিলের ওপর কালো অয়েলক্লথ পাতা, সেখানে নোংরামির চূড়ান্ত। রুটি ও কেকের টুকরো এদিকে-ওদিকে ছড়ানো, ঝোল গড়িয়ে পড়ছে, টী-পটে ঠাণ্ডা চা কেউ ফেলে দেবার নাম করে না।

মিসেস রিগ্‌লের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ বলল, "কেউ কারো কম যায় না। আমাদের বাড়িও সমান নোংরা।" মাথায় একখণ্ড শাল চাপিয়ে মিসেস রিগ্‌লে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল, বলল, "আমি এই এলুম বলে।"

অগোছাল ঘরটার দিকে অপ্রসন্ন ভাবে তাকিয়ে এলিজাবেথ বসে রইল। সময় কাটে না। ও তখন জুতো গুণতে শুরু করে দিল। নানা সাইজের বারো জোড়া জুতো। মেঝের ওপর আবর্জনার দিকে লক্ষ্য করে ওর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ল, "ছেলেপুলের ঘর—

নোংরা হবে না তো কি!" উঠোনে জুজোড়া পায়ের শব্দ, রিগ্লেরা ফিরে এসেছে। এলিজাবেথ বেট্‌স উঠে দাঁড়াল। রিগ্লে প্রকাণ্ড মানুষ, মস্ত চওড়া হাড়। মাথাটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মতো, প্রকাণ্ড মাথা, কপালের ওপর লম্বা একটা ক্ষত-চিহ্ন। খনিতে কাজ করতে গিয়ে মাথা ফেটেছিল, কয়লার গুঁড়ো ঢুকে কাটা জায়গাটা নীল হয়ে গেছে। ক্ষত-চিহ্নটা হঠাৎ দেখলে মনে হয় নীল-রঙা উল্কি।

কোনো সম্ভাষণ না করেই রিগ্লে জিগগেস করে বসল, "ও বুঝি এখনো বাড়ি ফেরেনি?" কথা বলার ভঙ্গীতে কেমন একটা সম্ভ্রম ও সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল। "ও কোথায় গেছে জানি না তো!" মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, "প্রিন্স অব্ ওয়েলস্-এ নেই ওয়াল্টার।"

মিসেস রিগ্লে বলল, "তা হলে হয়তো 'ঈউ'-এ গেছে।"

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। রিগ্লের ভাব দেখে মনে হলো ও কী যেন বলতে চায়।

বলল. "আমরা কাজ সেরে আসছি—আমি চেঁচিয়ে জিগগেস করলাম, ওয়াল্ট আসছ নাকি?—ও বলল, 'তোমরা এগোও আমি হাতের কাজটা সেরে এখুনি আসছি।' আমি আর বাওয়ার্স তো উঠে এলাম। ভাবলাম ও পরের ডুলিতে উঠবে..." ও যেন একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। ভাবখানা এমন যে, বন্ধুকে একা ফেলে আসার জন্য যেন জবাবদিহি করতে দাঁড়িয়েছে। এলিজাবেথ বেট্‌স ভাবছে ঠিক একটা অঘটন ঘটেছে তাহলে—রিগ্লেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলল—

"তাহলে নিশ্চয় ও 'ঈউ-ট্রি'তে গেছে। অনেকবারই তো এরকম দেরি করে এসেছে—আমি কেবল ভেবে মরি। ওকে ধরাধরি করে না আনলে আজ আর ফিরছে না।"

রিগ্লের বউ বলল, "দেখতো কি অন্যায়!"

রিগ্লে একটু ইতস্তত করে ওর নিজের আশঙ্কাটা চাপা দেবার জন্যই

যেন বলল, "যাই একবার চট করে দেখে আসি ডিক্‌এর বাড়িতে গেছে কি না।"

এলিজাবেথ এবার বেশ জোর করেই বলল, "এমনিতেই যথেষ্ট উৎপাত করেছি—আর নয়।" রিগ্‌লে বেশ বুঝতে পারল, ওর এই প্রস্তাবে এলিজাবেথ খুব খুশিই হয়েছে।

ওরা যখন গলির মোড়ে, এলিজাবেথ শুনতে পেল রিগ্‌লের বৌ ছুটে পাশের বাড়ি যাচ্ছে। ওকে নিয়ে ওদের আলোচনা হবে—এ কথাটা ভাবতেই ওর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

"সাবধানে পা চালাতে হয় এ জায়গাটায়," রিগ্‌লে বলছে, "চারদিকে যা গর্ত একদিন কেউ হোঁচোট খেয়ে পা ভাঙবে।"

এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে রিগ্‌লের পাশে চলতে লাগল। যেতে যেতে বললে, "ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে অথচ বাড়িতে জনপ্রাণী নেই—এটা আমার ভালো লাগছে না।"

রিগ্‌লে বলল, "হ্যাঁ, তা তো ভালো না লাগারই কথা।" ইতিমধ্যে ওরা বেট্‌সদের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। গেটটা খুলে দিয়ে রিগ্‌লে বলল, "কিছু ভাবনা নেই। আপনি বাড়িতে বসুন গিয়ে, আমি এই এলাম বলে।"

বাড়িতে সব চুপচাপ। হ্যাট্ ও তে-কোনা শালটা ছেড়ে এলিজাবেথ বসল, ঘড়িতে নটা বেজে কয়েক মিনিট। হঠাৎ চানক মোয়ানের দিক থেকে পুলি-ইঞ্জিনের শব্দ এল, খাদের নিচে রসা নামছে। ডুলি যথাস্থানে পৌঁছে গেছে, ঘর্ঘর করে ব্রেক কষার শব্দ, এলিজাবেথের শরীরের সমস্ত রক্ত যেন উবে যায়। নিজেকে তিরস্কার করেই যেন বলে, "কী যে ছাই মাথামুণ্ডু ভেবে মরছি—ও নিশ্চয় রাত নটার সিফ্‌ট নাবছে।"

কান পেতে চুপ করে বসে রইল। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়?

আধঘণ্টার মধ্যে ওর শরীর মন অবসন্ন হয়ে পড়ল। "কেন এরকম করছি আমি," নিজের প্রতি ওর নিজের করুণা হচ্ছে, "এভাবে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমি নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনব।"

আবার ও সেলাই নিয়ে বসল।

পৌনে-দশটায় পায়ের শব্দ শোনা গেল—একটি লোকের পায়ের শব্দ। ও দরজার দিকে তাকিয়ে আছে—দরজা খুলে ঢুকল একটি বুড়ি, মাথায় কালো টুপি, থুতনির নিচে ফিতে দিয়ে বাঁধা, গায়ে কালো রঙের শাল জড়ানো। এই বুড়ি ওয়াণ্টারের মা। বয়স প্রায় ষাট বছর, পাণ্ডুর মুখের চামড়া কুঞ্চিত, বয়সের রেখার জালে যেন ধরা পড়েছে দুটি বিবর্ণ নীল চোখ। দুয়োর ভেজিয়ে খিটখিটে গলায় বুড়ি বলতে শুরু করল, "আমাদের কি হবে লিজি। হা ভগবান কি করি।"

"কি হবে মানে?" এলিজাবেথ উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত।

বুড়ি সোফায় বসে মাথা নাড়িয়ে বলল, "নিজেই কিছু জানি না বাছা, তোমায় কি করে বলব। আমার দুঃখের কি আর শেষ আছে—কপালে এত কষ্টও ছিল…"

বুড়ি অঝোরে কাঁদতে লাগল, কোঁচকানো গালের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। ওর কাঁদুনি গাওয়া শেষ হতে না হতেই এলিজাবেথ বাধা দিয়ে বলল, "কী বলছ তুমি? কী হয়েছে ঠিক করে বলো না মা?"

আস্তে আস্তে চোখের জল মুছে বুড়ি বলল, "আমার হতভাগা ছেলেটার কি হল রে। আমি কি করব গো! লিজি, তোমার তো আবার শিগগির…সর্বনাশ হয়ে গেল।"

এলিজাবেথ চুপ করে শুনছে ওর কথা।

"ও কি মারা গেছে?"

প্রশ্নটা করতেই ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল, মনে মনে ওর নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। এমন সম্ভাবনার কথা ও ভাবল কেমন

করে। ওর এই প্রশ্নে বুড়ি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; বলল, "অমন কথা বোলো না এলিজাবেথ। ভগবান ওকে রক্ষা করুন। আমি শুতে যাবার আগে এক গেলাস নিয়ে বসে আছি—এমন সময় জ্যাক রিগ্‌লে এসে বলল ওয়াল্টের কি যেন হয়েছে। যতক্ষণ ওরা ওয়াল্টকে বাড়িতে না নিয়ে আসে ততক্ষণ যেন আমি তোমার এখানে এসে বসে থাকি। এল আর চলে গেল, রিগ্‌লেকে একটি কথাও জিগগেস করবার ফুরসুত পেলাম না। আমি তৎক্ষণাৎ টুপিটা মাথায় চড়িয়ে ছুটে এসেছি। ভাবলুম—আহা বেচারী লিজি একে তো ওর পোয়াতী অবস্থা। কেউ যদি হঠাৎ এসে একটা খারাপ খবর দিয়ে বসে—তাহলে কী যে হবে ভগবানই জানেন। তুমি এতে কিন্তু ঘাবড়ে যেয়ো না, লিজি; ঘাবড়েছ কি ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে। ক-মাস—ছয় না পাঁচ? কি বললে? আট? তবে তো সময় হয়ে এল বলে।"

এলিজাবেথ তখন অন্য কথা ভাবছে। ওয়াল্ট যদি দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে থাকে তবে সামান্য পেন্সন এবং ও নিজে যৎসামান্য যা রোজগার করতে পারবে তা দিয়ে কি সংসার চলবে। মনে মনে ও হিসেব করতে লাগল। যদি ওর কেবলমাত্র চোট লেগে থাকে তাহলে ওরা হয়তো ওকে হাসপাতালে নাও নিয়ে যেতে পারে। হাসপাতালে গেলে নার্স বেচারীর প্রাণান্ত। ওকে যদি বাড়িতেই এনে দেয় তাহলে এলিজাবেথ হয়তো ওর মদ খাওয়া ও অন্যান্য বদ অভ্যাসগুলো ছাড়াতে পারবে। ওয়াল্টারের অসুখে ও সেবা করছে এই ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর চোখ টনটন করতে লাগল। কী করছে ও—এ যে বৃথা দুঃখ বিলাস! ছেলেদের কথা ও ভুলবে কেমন করে—ওযে ওদের মা। মা ছাড়া জন্‌ আর অ্যানির চলবে না, ওই একটা জায়গায় ওর না থাকলেই নয়।

বুড়ি আপন মনেই বকে চলেছে—"এই সেদিন মাত্র ওর প্রথম হপ্তার

মাইনে এনে আমার হাতে তুলে দিল। ওয়াল্ট আমার ছেলে ভালো, সে যাই বলুক অন্য লোকে। ওর নিজের একটা ধরন আছে সেটা সবাই বোঝে না। ওর যে কেন এমন হল, আমি ভেবে পাইনে। ছেলে বয়সে একটু দুরন্ত ছিল, কিন্তু সারাক্ষণ হাসি খুশি। এযাত্রা রক্ষা যদি পায়, ঠিক দেখো ও নিজেকে শুধরে নেবে। তোমায় ও অনেক ভুগিয়েছে সে আমি জানি, লিজি। কিন্তু আমায় কোনোদিন জ্বালাতন করেনি। কেমন করে ওর এমন হল .....”

আপন মনে ঘ্যান-ঘ্যান একঘেয়ে সুরে বুড়ি বিড়বিড় করতে লাগল। এলিজাবেথ একমনে কী যেন ভাবছে। পুলি-এঞ্জিনের ধকধকানি শুনে ও হঠাৎ চমকে উঠল, একটা কর্কশ শব্দ এল ব্রেক কষার। তারপর সব চুপচাপ। বুড়ি এ-শব্দটা শুনতে পায়নি। এলিজাবেথ নিবিষ্ট হয়ে প্রতীক্ষা করছে। বুড়ি কথা বলেই চলেছে, মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে চুপ করে যাচ্ছে।

“ওকে তো তুমি পেটে ধরোনি লিজি, তাই বুঝতে পার না। ও এখন যত বড়টাই হোক না কেন, আমার কাছে ও সেই ছেলেমানুষ থেকে গেছে। ওর আব্দার আমার গা-সহা হয়ে গেছে। পুরুষমানুষের আব্দার না সইলে চলে—”

রাত এখন সাড়ে দশটা। বুড়ি বলছিল, “তা যাই বলো লিজি সমস্ত জীবনটাই এক ঝকমারি ব্যাপার, শেষ বয়স পর্যন্ত দুঃখকষ্টের অন্ত নেই। নইলে এই বুড়ো বয়সে···”

একটা আচমকা শব্দ এল গেট খোলার—সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ।

“আমি গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আসি লিজি, তোমায় যেতে হবে না।”

বুড়ি সোফা থেকে ওঠবার আগেই এলিজাবেথ দরজা খুলে দিয়েছে। খনির পোশাক-পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে।

“ওরা ওকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে, মিসেস বেট্‌স।”

মুহূর্তের জন্য এলিজাবেথের হৃদযন্ত্র যেন থেমে গেল। তার পর মুহূর্তে শিরায় শিরায় রক্তের বন্যায় ওর দম যেন বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

"ওর কি খুব বেশি লেগেছে?"

মজুরটি মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "ডাক্তার বলছেন অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। বাতিঘরে ডাক্তার ওকে দেখছেন কিনা!"

ভুরু কুঁচকে এলিজাবেথ বলল, "চুপ, চুপ! চুপ করো মা, ছেলেদের জাগিয়ো না। ওদের ঘুম থেকে ওঠানো, সে আমার বরদাস্ত হবে না।"

বুড়ি শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে করুণ ভাবে কাঁদতে লাগল। লোকটা সরে যাচ্ছিল—এলিজাবেথ এগিয়ে গিয়ে ওকে জিগগেস করল, "কেমন করে হল?"

বেচারী ভারি অপ্রস্তত। বলল, "আমি তো ঠিক জানি না। সামান্য কী একটা কাজ বাকি ছিল। ও বলল কাজটা সেরে যাই। ওর সঙ্গীরা চলে গেছে, ইতিমধ্যে খাদ ধসে গিয়ে ওর মাথার উপরকার চাল পড়ে গেছে।"

"ওকে বুঝি চাপা দিয়েছে?"

লোকটা বলল, "না। হুড়মুড় করে পড়ে ওর যাবার রাস্তা, হাওয়া ঢোকবার রাস্তা—সব বন্ধ করে দিয়েছে। ওর গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। অন্ধকূপের মধ্যে দম আটকে মারা গেছে।" এলিজাবেথ শিউরে পিছু হটে গেল। পেছন থেকে বুড়ি জিগগেস করছে, "কী বলছে লোকটা? কী হয়েছিল?"

লোকটা এবার একটু গলা চড়িয়ে জবাব দিল, "দম আটকে মারা গেছে।" এলিজাবেথ বুড়ির হাতটা চেপে ধরে কাতর ভাবে বলল "দোহাই মা, ছেলেদের জাগিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।"

নিজের অজান্তে ও নিজেও কাঁদতে লাগল। বুড়ি সেই আগের মতো দুলে দুলে করুণ ভাবে কাঁদছে।

এলিজাবেথের মনে পড়ল, ওকে তো ওরা বাড়ি আনছে, তার আগে তো সব তৈরি রাখতে হবে। "ওকে বসবার ঘরেই আনবে ওরা," ও আপন মনে বিড়বিড় করে বলল। দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মতো।

মোমবাতি জ্বালিয়ে এলিজাবেথ বসবার ঘরে গেল। ছোট্ট ঘর—ঘরের হাওয়া ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে, অথচ অগ্নিস্থলী নেই যে আগুন জ্বালবে। মোমবাতিটা নাবিয়ে ও একবার ঘরের চারদিক দেখে নিল। বাতির আলো পড়েছে জানলার শার্সির ওপর, দুটো ফুলদানির ওপর আর ঘরের আসবাবের মেহগনি কাঠের ওপর। ফুলদানি দুটোতে কতকগুলো পাটকিলে-রঙা ক্রিসান্থিমামের গুচ্ছ—সমস্ত ঘরটাতে ফুলের মৃদু গন্ধ মৃত্যুর মতো হিমশীতল। এলিজাবেথ এক মুহূর্তের জন্য ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ ঘুরিয়ে একবার আন্দাজ করে নিল মেঝের ওপর ওকে শোয়াবার মতো যথেষ্ট ঠাঁই পাওয়া যাবে কি না। চেয়ারগুলো একপাশে 'সরিয়ে রাখল। এবার ওকে শোয়ালে আশে-পাশে চলা-ফেরারও খানিকটা জায়গা পাওয়া যাবে। লাল টেবিলক্লথ ও আর এক খণ্ড পুরানো কাপড় এনে বিছিয়ে দিল, সংকীর্ণ কার্পেটের টুকরোটা যেন না নষ্ট হয়ে যায়। বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে ও শীতে কেঁপে উঠল। কি জানি কি ভেবে আলমারি থেকে ও একটি পরিষ্কার ধোপদুরস্ত শার্ট বের করে নিল, স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভাবটা দূর করার জন্য জামাটা ধরল আগুনের কাছে। ও যখন এত সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তখন ওর শাশুড়ী সেই আগেকার মতো দুলে দুলে নিচু গলায় কাঁদছে।

"ওখান থেকে তোমায় একটু সরতে হবে মা," এলিজাবেথ বলল, "ওরা ওকে আনতে গেছে। তুমি এই দোল-চেয়ারে বোসো।"

খানিকটা যন্ত্রচালিতের মতো বুড়ি গিয়ে আগুনের ধারে দোল-চেয়ারে বসল। এলিজাবেথ চলে গেল ভাঁড়ার ঘরে, আর একটা মোমবাতি আনতে। ভাঁড়ার থেকে বেরুচ্চে এমন সময় শুনতে পেল ওরা আসছে, তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওরা নামল, ওদের ভারী বুটের মচমচ আওয়াজ ও ফিসফিস কথা বলার শব্দ কানে আসছে। বুড়ি এতক্ষণে চুপ করেছে। লোকগুলো উঠোনে দাঁড়িয়ে। এলিজাবেথ শুনতে পেল খনির ম্যানেজার ম্যাথিউস বলছে, "তুমি সামনের দিকে এগোও জিম! দেখো—সামলে—"

দরজা খুলে গেল। জিম পেছন ফিরে ঘরে ঢুকল স্ট্রেচারের এক প্রান্ত ধরে। ওয়াল্টারের পেরেক লাগান খনির বুটজোড়া দেখা গেল। বাহক দুজন দাঁড়িয়ে গেছে। ম্যানেজার লোকটি ছোটখাট, একগাল পাকা দাড়ি। জিগগেস করল, "কোথায় ওকে রাখবে?"

এলিজাবেথের আচ্ছন্ন ভাবটা এতক্ষণে কাটল। ভাঁড়ার থেকে মোমবাতি হাতে বেরিয়ে এসে বলল, "বসবার ঘরে।"

আঙুল দেখিয়ে ম্যানেজার বলল, "ওই ওদিকে জিম!" বাহকেরা দরজার মধ্যে দিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ওয়াল্টারের দেহের ওপর যে কোটটা ফেলা ছিল সেটি পড়ে গেল। মেয়েরা দেখল ওর কোমর অবধি গা খালি—এই হল ওর প্রতিদিনকার খনির পোশাক। বুড়ি নিচু গলায় কাঁদতে শুরু করল।

"স্ট্রেচার একধারে নামাও। তারপর কাপড়ের ওপর শুইয়ে দাও। দেখো সামলে—আস্তে।" ম্যানেজার নির্দেশ দিতে লাগল।

দেহটা নামাতে গিয়ে একজন বাহকের হাত লেগে একটা ফুলদানি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ও একটু অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে স্ট্রেচারটা নামিয়ে রাখল। এলিজাবেথ ওর স্বামীর দিকে এ পর্যন্ত তাকিয়ে দেখেইনি। বসবার ঘরে ঢুকেই ও ভাঙা ফুলদানির টুকরো

ও ফুলগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগল। দেহটা ওরা নামাতে যাবে, এলিজাবেথ বাধা দিয়ে বলল, "একটু দাঁড়াও!"

তিনজন চুপ করে দাঁড়িয়ে। ও ঝাড়ন দিয়ে মেঝের ওপর থেকে জলটা মুছে দিতে লাগল।

হাতের তেলো দিয়ে কপালটা ঘষতে ঘষতে ম্যানেজার বলতে লাগল, "কী বিশ্রী কাণ্ড দেখো তো! জীবনে এমন ব্যাপার দেখিনি। কে যে ওখানে ওকে পড়ে থাকতে বলল—কিছু দরকার ছিল না। হুস্ করে সমস্ত চালটা পড়ে গিয়ে ওর পথ আটকে দিল। সামনে পেছনে ওপরে নিচে চারফুট জায়গাও ছিল না। আশ্চর্য বলতে হবে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।"

অর্ধনগ্ন মৃতদেহটা গুঁড়ো কয়লা লেগে কালীমূর্তি হয়ে গেছে। দেহটার দিকে তাকিয়ে ম্যাথিউস বলল, "ডাক্তার বললে যে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। এরকম সাংঘাতিক ব্যাপার আমি কখনো শুনিনি। এসব যেন অদৃষ্টের চক্রান্ত। স্রেফ জাঁতিকলে পড়া আর কি।" এই বলে ওর হাতটা সজোরে নাটকীয় ভঙ্গীতে নামিয়ে দিল।

খনির মজুর দুজন পাশে দাঁড়িয়ে, হতাশের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছে। দুর্ঘটনার ছবিটা কল্পনা করে করে সবাই যেন ভয়ে শিউরে উঠল।

দোতালা সিঁড়ির মাথা থেকে অ্যানির গলা শোনা গেল, "মা, মা, কে ওখানে—কী হয়েছে?"

এলিজাবেথ দ্রুতপদে সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, "কিছু হয়নি। চেঁচামেচি করছ কেন? ঘুমোতে যাও এক্ষুণি—"

তারপর ও নিজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বসবার ঘর থেকে ওরা স্পষ্ট এলিজাবেথের পা ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওর কথাও ওদের কানে আসছে—"কী হয়েছে, বলো তো? বোকা মেয়ে কোথাকার!" ওর গলা ভাঙা ভাঙা, জোর করে ও যেন মোলায়েম সুরে কথা বলছে।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে মেয়েটি বলল, "আমি ভাবলুম কারা যেন এসেছে। বাবা এসেছে না কি ?"

"হ্যাঁ, ওকে ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তাতে হয়েছে কি ? এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমিয়ে পড়ো তো।"

শোবার ঘর থেকে এলিজাবেথের গলা ভেসে আসছে। বোঝা গেল এবার ও ছেলেদের গায়ে ভালো করে কম্বল জড়িয়ে দিচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে মেয়েটি জিগগেস করল: "মাতাল হয়ে এসেছে না কি ?"

"না রে না—মাতাল হয়নি। ও—ও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"বাবা কি নিচের তলায় ঘুমোচ্ছে ?"

"হ্যাঁ—ব্যস্‌ এখন আর গোল করে না।"

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। আবার মেয়েটির ভীত গলায় প্রশ্ন হল, "ওটা কিসের শব্দ ?"

"বলছি কিছু নয়। মিছে ভাবছ কেন ?"

শব্দটা হল অ্যানির ঠাকুরমার চাপা কান্নার। বুড়ির কোনো দিকে আর হুঁস নেই। দোল চেয়ারে বসে বসে কেবল দুলে দুলে কাঁদছে। ম্যানেজার ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল, "চুপ, চুপ।"

বুড়ি চোখ মেলে ম্যাথিউসের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল।

অনিচ্ছায় আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে অ্যানি করুণ ভাবে শেষ প্রশ্ন শুধালো—"কটা বেজেছে ?"

ওর মা গলাটা ততোধিক নিচু করে বলল, "দশটা।" এরপর ও নিশ্চয় ঝুঁকে পড়ে ছেলেদের চুমো দিল।

ম্যাথিউস ইশারায় ওর লোকদের বলল বেরিয়ে আসতে। ওরা টুপি পরে স্ট্রেচার তুলে নিল, মৃতদেহটা ডিঙিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ির বাইরে চলে

এল। পাছে ছেলেরা আবার জেগে যায়—সেই ভয়ে অনেকটা রাস্তা ওরা নিস্তব্ধে হেঁটে গেল।

এলিজাবেথ একতলায় ফিরে এসে দেখে ওর মা ওয়াল্টারের মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাপুস-নয়নে কাঁদছে।

"ওকে আবার ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে," এলিজাবেথ বলল। চুল্লীর ওপর কেতলি চাপিয়ে মৃতদেহের পায়ের কাছে বসল হাঁটু গেড়ে, বুটের ফিতে খুলতে শুরু করে দিল। একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় স্যাঁত-সেঁতে ঘরটি অনুজ্জ্বল। ফিতে খুলতে গিয়ে ওকে প্রায় মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল। বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টার পর—ভারী বুট দুটো খুলে এলিজাবেথ এক কোনায় রেখে দিল। ফিসফিস করে বুড়িকে বলল, "তুমি আমায় একটু সাহায্য করবে এসো।" দুজনে ওরা ওয়াল্টারের সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেলল।

উঠে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল মৃত্যুর গভীর মহিমায় সজ্জিত হয়ে ওয়াল্টার শুয়ে আছে—ভয়ে শ্রদ্ধায় ওদের মন আপ্লুত, কিছুক্ষণ হেঁটমাথায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ি নিচু গলায় নাকিস্বরে কাঁদতে লাগল। এলিজাবেথের মনে হল একদিন ওকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা যেন চিরকালের জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ওয়াল্টার যেন একেবারে অনধিগম্য—নির্বিকার নির্লিপ্ত আপনার মধ্যে আপনি বিলীন হয়ে আছে, যেন এলিজাবেথের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। এলিজাবেথ এটা মেনে নিতে পারল না, ঝুঁকে ওর হাতটা রাখল মৃতদেহের ওপর, যেন ওর অধিকার ছাড়বে না। খনির ভেতরটা গরম ছিল, ওর গায়ের তাপ এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। দুহাতের মধ্যে ছেলের মুখটি নিয়ে বুড়ি মা অসংলগ্নভাবে আপন মনে বিড়বিড় করছে। বৃষ্টিতে ভেজা গাছের পাতা থেকে যেমন টপ টপ জল পড়ে, তেমনি বুড়ির চোখ থেকে আপনা হতেই যেন জল গড়িয়ে পড়ছে। এলিজাবেথ ওর স্বামীর দেহটি

জড়িয়ে ধরল—এখানে ওখানে ঠোঁট ও গাল ছুঁইয়ে যেন শুঁকছে, খুঁজছে, যেন হাতড়ে দেখছে কোথাও একটা কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। খেই মেলে না, ও প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে। ওয়াল্টার যেন দুর্ভেদ্য দুর্গ—অনড় অটল—কোথাও প্রবেশের পথ নেই।

এলিজাবেথ উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘর থেকে নিয়ে এল এক গামলা গরম জল, আর আনল সাবান, ফ্ল্যানেলের টুকরো এবং একটা নরম তোয়ালে। বলল, "ওকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।" বুড়ি মা দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে লাগল—এলিজাবেথ সযত্নে ওর স্বামীর মুখ ধুয়ে দিচ্ছে, সন্তর্পনে ফ্ল্যানেলের টুকরো ভিজিয়ে লালচে রঙের জমকালো গোঁফজোড়া ঠোঁটের ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। মনের আতঙ্কটা ঢাকবার জন্য এলিজাবেথ ওর সেবা করতে লেগেছে। বুড়ি একটু ঈর্ষান্বিত ভাবে বলল, "দাও আমি ওকে মুছিয়ে দিই।" এলিজাবেথ ধুয়ে দিতে লাগল আর মৃতদেহের অপর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বুড়ি ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল, দুজনের কারো মুখে কথা নেই। যে দেহটা ওরা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে সেটা যে মৃতদেহ—এ কথাটা ওরা ভুলতে পারছে না। দেহ স্পর্শ করতে গিয়ে দুজনের দুই বিভিন্ন রকমের ভাব জাগছে। মা ভাবছে ওয়াল্টারকে পেটে ধরা যেন ওর বিফল হয়ে গেল। ওর জিনিস ওর হাত থেকে যেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। স্ত্রী ভাবছে /মানুষ কত একা—মানুষের আত্মার কেউ দোসর নেই / যে সন্তানের ভার ও আজ বইছে এমন কি তার সঙ্গেও ওর আত্মার কোনো যোগ নেই!

ধোওয়া মোছা শেষ হল। ওয়াল্টার দেখতে সুপুরুষ, ওর মুখের ওপর উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ নেই—মাথায় লালচে চুল, পেশীবহুল সুপুষ্ট সুগঠিত শরীর। কিন্তু এ যে ওর মৃতদেহ।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে বুড়ি ছেলের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

আছে। ভয়ে স্নেহে ওর মায়ের প্রাণ উছলিত হয়ে উঠছে। ফিসফিস করে অস্ফুট গলায় বলল, "আহা বাছা রে আমার!"

এলিজাবেথ আবার মেঝের উপর বসে পড়ল, ওয়াল্টারের গলার কাছে গালটা রেখে পড়ে রইল; ওর সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। ও যে মরে গেছে! ওর মৃত্যুহিম দেহের সঙ্গে ওর দেহের চিরকালের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। একটা দারুণ অবসাদে ওর মনটা শ্লথ হয়ে পড়েছে, সমস্ত জীবনটা ওর এমনি ব্যর্থ হয়ে গেল।

বুড়ি আপনমনে বলে চলেছে, "আ-হা, দেখো দেখো দুধের মতো শাদা রঙ, কচি ছেলের গায়ের মতো নরম চামড়া। আহা বাছা আমার! দেখো কোথাও একটা দাগ নেই। কি সুন্দর দেখতে!" ছেলের রূপের জন্যে এ যেন মায়ের গর্ব। এলিজাবেথ দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। "দেখেছ লিজি—ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে। সোনা আমার! ধন আমার! ওর মনের পাপ সব ধুয়ে মুছে গেছে, নইলে এমন শান্ত দেখায় কখনো। ওখানে আটকা পড়ে যতটুকু সময় পেয়েছে ততটুকু সময়ে ও সব অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। বাছা আমার, সোনা আমার। কিরকম প্রাণ খুলে হাসতো ছেলেবেলায়, তুমি যদি দেখতে—খুব ভালো লাগতো ওর হাসি। ও যখন খুব ছেলেমানুষ, লিজি—"

এলিজাবেথ চোখ তুলে চাইল। মৃতদেহের মুখটা আলগা হয়ে পড়েছে। গোঁফের তলায় মুখটা ঈষৎ হাঁ-করা, চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট ঘোলাটে। জীবনের সেই ঢিমে আঁচের উত্তাপ নিঃশেষ হয়ে গেছে—ও একটা আলাদা জিনিস, ওর সঙ্গে এলিজাবেথের কোনো সম্বন্ধ নেই। ও যে কতখানি পর তা এলিজাবেথ আজ মর্মে মর্মে বুঝছে। ওর জরায়ু যেন শিউরে উঠছে ভয়ে—ও যেন ভেবে উঠতে পারছে না কী করে একটি অপরিচিত আগন্তুককে ওর দেহের সঙ্গে একীভূত করে এতদিন পোষণ করেছে! এই শেষ পরিণতি তাহলে—কেউ কারো নয়, সবাই আলাদা?

কেবল দুদিন জীবনের উত্তাপ দিয়ে মিছে এই বিভেদ ঢাকবার চেষ্টা। কথাটা ভাবতেও ভয় হয়, ভয়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিল। ওরা কেউ কারো ছিল না অথচ এল পরস্পরের কাছে। পরস্পর পরস্পরকে দিনের পর দিন নগ্নদেহ উপহার দিয়েছে—ওয়াল্টার ওকে বুকে টেনে নিয়েছে—সম্ভোগ করেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওরা এক হতে পারেনি ; আজ দুজনের যেমন পৃথক সত্তা সেদিনও ছিল এমনি স্বাতন্ত্র্য। এর জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। ওর জরায়ুর সন্তানটি যেন বরফের মতো শীতল বোধ হচ্ছে—শক্ত আলাদা একটি জীব। মৃতদেহকে দেখে ওর অনাসক্ত মন বলে উঠল, "কে আমি ? কী করে কাটিয়েছি এত দিন। যার সত্বা নেই, যে মিথ্যা, সেই স্বামীর ঘর করেছি, ঝগড়া করেছি তার সঙ্গে। সে তো কেবল বেঁচে ছিল। আমি কি তাহলে ভুল করেছি ? কার সঙ্গে কাটালুম এতদিন ? সত্যিকার লোকটা ওই তো মেঝের ওপর পড়ে আছে।" ভয়ে ওর আত্মা যেন মরে গেল। ও এখন জেনে ফেলেছে ওয়াল্টারকে ও কোনো দিন সত্য করে দেখেনি, ওয়াল্টারও ওকে দেখেনি কখনো সত্য করে। অন্ধকারের অন্তরালে ওদের সাক্ষাৎ, অন্ধকারে পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। কার সঙ্গে যে কার সাক্ষাৎ, কে যে কার বিরোধিতা করেছে কেউ জানে না। আজ ও সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তাই ওর মুখে একটিও কথা নেই। এতদিন ও ভুল দেখেছে, ভুল বুঝেছে। ওয়াল্টার যা নয় তাই বলে ওকে ডেকেছে—ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছে। অথচ ওয়াল্টার চিরটা কাল আলাদা ছিল—আলাদা থেকে গেছে, চিন্তা আলাদা, ভাবনা আলাদা, কাজ আলাদা, জীবন আলাদা। সে চিরন্তন বিচ্ছেদ কখনো জোড়া লাগেনি। যে-দেহটাকে ও ভুল করে জেনেছিল সেই নগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে ওর ভয় করতে লাগল, লজ্জা হতে লাগল। ওই ওয়াল্টারই হলো ওর সন্তানদের জন্মদাতা। আজ যেন এলিজাবেথের আত্মা দেহ

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা দাঁড়িয়েছে। ওয়াল্টারের নগ্নদেহটা আজ ও অস্বীকার করছে বলে ও যেন কুণ্ঠা বোধ করছে। ওটা তো মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নয়, তা হলে কেন এত ভয়ঙ্কর ঠেকছে ওর কাছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওয়াল্টারের চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার সাদৃশ্য নেই, ওদের পরস্পরের পথ আলাদা। এখন ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওয়াল্টারের নিজস্ব সত্তাকে ও স্বীকার করে নেয়নি। এই তো ছিল ওদের জীবন—মিথ্যায় গড়া। মৃত্যু এসে এই মিথ্যা থেকে ওকে মুক্তি দিয়েছে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে। মৃত্যুর প্রতি ওর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, মৃত্যু ওকে এটুকু বুঝিয়েছে যে ও মরে যায়নি। এদিকে ওর মনটা দুঃখে, শোকে, ওয়াল্টারের প্রতি মমতায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে। শেষ মুহূর্তে বেচারী কী দুঃখটাই না সয়েছে—কী বিভীষিকার মধ্যে দিয়েই না গেছে নির্বান্ধব অসহায় অবস্থায়! ওর মনটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। সংকটে ও ওয়াল্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। নির্দয়ভাবে আঘাত পেয়েছে এই নগ্ন দেহটা—এই অপর ব্যক্তি। কই ও তো তার কিছু প্রতিবিধান করতে পারল না। অ্যানি ও জন্ আছে অবশ্য—কিন্তু ওদের সামনে তো সারা জীবনটা পড়ে আছে। মৃত লোকটার সঙ্গে ছেলেদের কোনো সম্পর্ক নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে জীবনধারা দুই বিভিন্ন স্রোতে বয়ে গেছে—মিলেছে সন্তান জন্মদানের মোহানায়। ও যে জননী সে কথা মেনে নিতে ওর দ্বিধা নেই, কিন্তু স্ত্রী হওয়া যে কী শোচনীয় আজ প্রথম সে-কথা এলিজাবেথ বুঝতে পারল। বেঁচে ছিল যখন, তখন ওয়াল্টারও নিশ্চয় ভাবতো স্বামী হওয়া কি ঝকমারি! পরলোকে ওয়াল্টার ওকে হয়তো চিনবেই না, দেখা হলে অতীতের কথা ভেবে দুজনেই হয়তো লজ্জা পাবে। কী এক রহস্যময় কারণে ওদের দুজনের দেহ থেকে সন্তানের উৎপত্তি ঘটেছে। সন্তান জন্মেছে কিন্তু

যে-দুটি দেহ থেকে ওদের জন্ম সে দুটি দেহকে মিলিত করেনি। মৃত্যুর ব্যবধান এসে আজ এলিজাবেথকে বুঝিয়ে দিয়েছে ওয়াল্টার আর ওর মধ্যে চিরকালের প্রভেদ, চিরকালের মতো ওদের দুজনের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। এই একটি ঘটনায় চরম সমাপ্তি ঘটে গেল। এ-জীবনে ওরা দুজনে দুজনকে স্বীকার করে নেয়নি। ওয়াল্টার নিজেকে এবার চিরতরে সরিয়ে নিয়েছে। ওর মনটা হু হু করে উঠল। মারা যাবার অনেক আগে থেকেই ওয়াল্টার আর ওর সংসার-জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। আজ তাহলে সব শেষ। যাই হোক না কেন, ওর স্বামী তো ছিল—কিন্তু পুরোপুরি ওকে কখনো পায়নি এলিজাবেথ। ওর ক্ষুদ্র একটি অংশ—কত ক্ষুদ্র অংশ ও পেয়েছে!

"ওর জামাটা ঠিক করে রেখেছ—এলিজাবেথ?"

কিছু জবাব না দিয়ে এলিজাবেথ ফিরে দাঁড়াল। ও বুঝতে পারছে ওর শাশুড়ী চায় যে বউ একটু কাঁদুক-কাটুক। প্রাণপণ চেষ্টা করল চোখে জল আনতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—ও পাথরের মতো নির্বাক হয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে জামাটা নিয়ে এল।

এখানে ওখানে হাত দিতে দিতে এলিজাবেথ বলল, "জামাটা আগুনে শুকিয়ে নিয়েছি।" ওয়াল্টারের গায়ে হাত দিতে ওর দ্বিধা হতে লাগল। ওর বা অপর কারুর অধিকার নেই ঐ দেহটা স্পর্শ করবার। অতি সম্ভ্রমে এলিজাবেথ ওর গায়ে হাত দিল। ওকে জামা পরানো কি সোজা কথা? দেহটা ছুঁতেই একটা ভীষণ আতঙ্কে ও শিউরে উঠল। নিঃসাড় নিস্পন্দ গুরুভার এই দেহটা ওর কাছ থেকে কতদূরে সরে গেছে—ওদের মধ্যে আজ অনন্ত ব্যবধান।

জামা পরানো হল। চাদর দিয়ে সমস্ত দেহটা ওরা দুজনে ঢেকে দিল; মুখের ওপর থেকে চাদরটা যাতে না সরে যায়, সে জন্যে মাথার ওপরে দু একটা গেরো বেঁধে দিল। তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল ঘর

থেকে। বেরিয়ে এসে বসবার ঘরের দরজাটা এলিজাবেথ শক্ত করে এঁটে দিল—পাছে ছেলেরা সকালে উঠে ওখানে ওকে পড়ে থাকতে দেখে। এবার ও গেল রান্নাঘরটা গুছোতে। ওর মনটা এখন গভীর শান্তির মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে। এ প্রশান্তি একটা বিরাট ভারের মতো ওর বুকের উপর চেপে বসেছে। এলিজাবেথ জানে ও জীবনের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে, জীবন আজ ওর প্রত্যক্ষ প্রভু। কিন্তু যে মৃত্যুর কবল এড়াতে ও পারবে না, অগোচর অপ্রত্যক্ষ হলেও যার কাছে একদিন ওকে হার মানতেই হবে—আজ সেই মৃত্যুর কথা ভাবতেও ওর সমস্ত শরীর লজ্জায় ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে সংকুচিত হয়ে উঠছে।

—ক্ষিতীশ রায়

প্রাশিয়ান অফিসার

সকাল থেকে সেই তপ্ত শাদা রাস্তা ধরে তারা প্রায় কুড়ি মাইল হেঁটেছে। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কয়েকটা গাছের ছায়া মুহূর্তের জন্যে পেয়েছে, তার পরেই আবার সেই রৌদ্রদাহ। দু-ধারে বিস্তৃত নাতিবন্ধুর উপত্যকা রোদে যেন পুড়ে যাচ্ছে। উপত্যকায় কোথাও গাঢ় সবুজ 'রাই', কোথাও ফিকে সবুজ গমের চারার ক্ষেত। জ্বলন্ত আকাশের নিচে, এই সব ক্ষেত আর অনাবাদী জমি, কালো পাইন বন আর ফাঁকা মাঠ, সব মিলে একটা তপ্ত বিবর্ণ জ্যামিতিক নকসার সৃষ্টি করেছে। রাস্তার সামনের দিকে কিন্তু নিশ্চল নীলাভ পাহাড়ের পর পাহাড়, আর তাদের চূড়ায় গভীর নীলিমার মাঝে তুষারের স্নিগ্ধদ্যুতি। 'রাই'-এর ক্ষেত আর মাঠ, আর রাস্তার দুধারে নিয়মিত ব্যবধানে রোপিত ফলের গাছগুলির মাঝ-খান দিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে সৈন্যবাহিনীটি ক্রমাগত মার্চ করে চলে। ঘন সবুজ 'রাই'-এর ক্ষেত থেকে শ্বাসরোধকারী একটা উত্তাপ উঠতে থাকে, পাহাড়গুলো কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সেনাদের পা ক্রমশ আরও গরম হয়ে ওঠে, তাদের শিরস্ত্রানের তলায় চুলের ভেতর দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। পিঠের থলিগুলোর উত্তপ্ত স্পর্শে প্রথম প্রথম তাদের কাঁধগুলো যেন পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়েছে, এখন কিন্তু তার বদলে কেমন একটা ঠাণ্ডা ছুঁচ ফোটার মতো অনুভূতি ছাড়া আর কিছু তারা টের পাচ্ছে না।

সামনে শ্রেণীর পর শ্রেণী পাহাড়গুলো খাড়া মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে—যেন আধা মর্ত আধা স্বর্গ, আর তাদের নীলাভ চূড়াগুলিতে নরম তুষারের প্রলেপ রেখা যেন সেই স্বর্গ মর্তের ব্যবধান।

এই পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরবে আর সকলের সঙ্গে সে হেঁটে যাচ্ছিল।

এখন আর তার হাঁটতে কষ্ট হয় না বললেই হয়। প্রথম যাত্রার সময় সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল কিছুতেই খোঁড়াবে না। গোড়ায় গোড়ায় পা ফেলতে কি নিদারুণ যন্ত্রণাই না তার হয়েছে। প্রথম মাইল খানেক সে প্রায় দম বন্ধ করে হেঁটেছে, আর তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিয়েছে। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে সে সব কেটে গিয়েছে। যাই বল, ওগুলো আঁচড়ের দাগ বৈ তো নয়! ঘুম থেকে ওঠবার সময় ঊরুর পেছন দিকে এই কালশিটে দাগগুলো সে লক্ষ্য করেছে। তার পর সকালে প্রথম পা ফেলা শুরু করা থেকে এখন পর্যন্ত সেগুলির কথা ভুলতে সে পারেনি। যন্ত্রণা চেপে রেখে নিজেকে সামলে রাখবার চেষ্টায়, বুকের ভেতর কেমন একটা পিষে-ধরা জ্বালা সে এখন অনুভব করছে। শ্বাস নিতে গিয়ে হাওয়া যেন সে আর পাচ্ছে না। তবুও সে এক রকম হালকা ভাবেই হেঁটে চলেছে।

সকালে কফি নেবার সময় ক্যাপ্টেনের হাত কেঁপে গিয়েছিল, অর্ডারলি দেখেছে। ঘোড়ায় চড়ে ক্যাপ্টেন সামনের গোলাবাড়ির দিকে ফিরেছে। ক্যাপ্টেনের চেহারাটি সুন্দর, ফিকে নীলের ওপর গাঢ় লাল রঙের পটি দেওয়া ইউনিফর্মে তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। তলোয়ারের খাপ আর তার কালো শিরস্ত্রাণ রোদে ঝিকমিক করছে, তার মসৃণ ঘোড়ার গা বেয়ে ঘামের ধারা ঝরে পড়ছে। অর্ডারলির মনে হয়, দ্রুত ধাবমান ঐ ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে সে যেন অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ক্যাপ্টেন তার জীবনের অভিশাপ, তবু অমোঘ ভাবে, মৌন ছায়ার মতো সে তার অনুসরণ করে চলেছে। আর ক্যাপ্টেনও সারাক্ষণ তার অর্ডারলি সম্বন্ধে সচেতন। সে যে তার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর একজন—একথা ক্যাপ্টেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

ক্যাপ্টেনের বয়স প্রায় চল্লিশ, লম্বা সুঠাম চেহারা, রগের ওপরের চুল পাকতে শুরু করেছে। ইউরোপে তার চেয়ে ভালো ঘোড়সওয়ার আর নেই বললেই হয়। গা টিপে দেবার সময় তার ঘোড়সওয়ারের উপযোগী অদ্ভুত পেশীগুলো দেখে, অর্ডারলি অবাক হয়ে গেছে।

এইটুকু ছাড়া অর্ডারলি ক্যাপ্টেনকে ভালো করে কখনো লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ। নিজের দিকেও তার যেমন দৃষ্টি নেই, তার ক্যাপ্টেনের দিকেও তেমনি। তার মনিবের মুখ সে কদাচিৎ দেখেছে। সে সেদিকে তাকায়ই না। ক্যাপ্টেনের চুল কড়া ও লালচে, ছোট করে ছাঁটা। তার পুরু ঠোঁটে একটা পাশবিক কাঠিন্য, তার ওপরে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা গোঁফ। মুখটা তার বেশ ভাঙা, গালগুলো শীর্ণ। তার কুঞ্চিত কপাল আর মুখের গভীর রেখাগুলোর জন্যে হয়তো তাকে বেশি সুন্দর দেখায়। তাকে দেখলে এই কথাই মনে হয় যে, জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম সে করে চলেছে। ঘন ভুরুর তলায় নীল চোখে সব সময়ই কেমন একটা চাপা নিরুত্তাপ আগুনের ঝিলিক।

প্রাশিয়ার অভিজাত বংশে তার জন্ম, স্বভাব তার অসহিষ্ণু ও উদ্ধত। তবে তার মা ছিলেন পোল্যাণ্ডের একজন কাউণ্টেস্। যৌবনে জুয়া খেলায় প্রচুর ঋণ করে সৈন্য বিভাগে উন্নতির আশা ভরসা সে নিজেই নষ্ট করেছে। সামান্য পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়েই তাই তাকে থাকতে হয়েছে। বিয়ে সে কখনো করেনি, অবস্থা গতিকে তো বটেই, তা ছাড়া কোনো নারী তার মধ্যে সে বাসনা জাগাতেও পারেনি। ঘোড়ায় চড়েই তার দিন কাটে। অফিসারদের ক্লাবে এবং কখনো কখনো ঘোড়দৌড়ে সে নিজের ঘোড়া নিজেই চালায়। মাঝে মাঝে নারী-সঙ্গ তার জীবনে প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু এরকম প্রত্যেক ঘটনার পর আবার কাজে যখন সে ফিরেছে, তখন দেখা গেছে তার ললাট আরও বেশি কুঞ্চিত, তার চোখের দৃষ্টিতে আরও গভীর বিরক্তি ও বিদ্বেষ।

তার অধীনস্থ সেনাদের সঙ্গে সে কিন্তু নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবেই ব্যবহার করে যায়, যদিও রাগ তার একেবারে পৈশাচিক। সুতরাং তাকে ভয় করলেও অধীনস্থ সেনারা তার ওপর খুব বেশি বিরূপ নয়। অমোঘ নিয়তির মতোই তারা তাকে মেনে নিয়েছে।

অর্ডারলির প্রথম প্রথম তাকে শুধু উদাসীন, কঠিন ও খাঁটি ধরণের মানুষ বলেই মনে হয়েছে। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে হৈচৈ করা তার স্বভাব নয়। তাই কি কি হুকুম সে দেয়, আর কি ভাবে সে হুকুম তামিল করা চায়, তার বেশি নিজের মনিব সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানবার সুযোগ অর্ডারলি পায়নি। সমস্ত ব্যাপার ছিল নিতান্ত সহজ। তার পরই ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু।

অর্ডারলির বয়স প্রায় বাইশ, মাঝারি গোছের জোয়ান চেহারা। সবল, ভারী ভারী হাত পায়ের গড়ন, গায়ের রঙ তেমন উজ্জ্বল নয়, ঠোঁটের ওপর নরম কালো গোঁফের রেখা। যৌবনের কেমন একটা উত্তাপের আভাস তার মধ্যে আছে। তার সূক্ষ্ম টানা ভুরুর নিচে ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, কোনো চিন্তার ধার সে ধারে না। জীবনের পরিচয় আপনা থেকে শুধু ইন্দ্রিয়ের পথেই তার পাওয়া।

ক্রমে ক্রমে ক্যাপ্টেন তার অর্ডারলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে যৌবনের যে অচেতন প্রবল দীপ্তি তা যেন কিছুতেই সে এড়াতে পারে না। বয়সের কাঠিন্যের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের দেহে যে জড়ত্ব, অনমনীয়তা এসেছে, তার ওপর তরুণ অর্ডারলির যৌবন যেন উত্তপ্ত শিখার মতো এসে লাগে। সে এমন সহজ, এমন আত্মস্থ—তার সমস্ত চলা-ফেরায় এমন কি একটা আছে, যাতে তার সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন সচেতন না হয়ে পারে না। সেই সঙ্গে তার মনে কোথায় একটা জ্বালাও যেন ধরে প্রাশিয়ার এই সেনাপতি জীবনের এ স্পর্শ সে তার চাকরের কাছ থেকে চায় না। ইচ্ছে করলে সে অবশ্য চাকর বদল করতে পারত, কিন্তু তাও

সে করে না। আজকাল সে তার অর্ডারলির দিকে কদাচিৎ তাকায়, বরং অধিকাংশ সময় পাছে তাঁকে দেখতে হয় বলেই যেন মুখ ফিরিয়ে থাকে। তবু সেই তরুণ সৈনিক যখন আপন মনে ঘরের মধ্যে নিজের কাজে ঘুরে বেড়ায়, তখন ক্যাপ্টেন তাকে লক্ষ্য না করে পারে না। নীল জামার নিচে তার যৌবনসুলভ সবল স্কন্ধ, তার গ্রীবার বক্রতা, সব কিছুই ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করে এবং সেই সঙ্গে কেন বলা যায় না, মন তার তিক্তও হয়ে ওঠে। মাঠের চাষিদের মতো অর্ডারলির হাতগুলো সবল ও নিটোল। সেই হাতে যখন সে রুটি ধরে বা মদের বোতলটা এগিয়ে দেয়, তখন ক্যাপ্টেনের রক্ত, ঘৃণা ও ক্রোধের একটা বিদ্যুৎ দাহে যেন জ্বলে ওঠে। তার অর্ডারলি যে আনাড়ি তা নয়, বরং তার গতিবিধিতে কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। তার এই সহজ পশুসুলভ স্বাভাবিকতাই ক্যাপ্টেনকে অত বেশি উত্যক্ত করে তোলে।

একবার অর্ডারলির অসাবধানতার জন্যেই বুঝি, মদের একটা বোতল টেবিলের ওপর উল্টে যায়। এক ঝলক লাল মদ টেবিল-ক্লথটার ওপর গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন যে ভাবে রেগে আগুন হয়ে তার দিকে চেয়েছিল, অর্ডারলি কোনো দিন তা ভুলতে পারবে না। ক্যাপ্টেনের নীল চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়েছে, আর অর্ডারলির মনে হয়েছে সেই অগ্নিময় দৃষ্টি যেন তার হৃদয় পর্যন্ত ভেদ করে প্রবেশ করেছে। এরকম ভয়বিহ্বল সে আগে কখনও হয়নি। তার স্বসম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা এই এক আঘাতেই কেমন যেন চূর্ণ হয়ে গেছে। তার পর থেকেই সব সময় সে একটু আড়ষ্ট হয়েই থাকে। পরস্পরের সম্বন্ধে সেই দিন থেকেই এই দুটি মানুষের মনের মধ্যে একটি অদ্ভুত মনোভাবের সূত্রপাত হয়েছে।

সেই দিন থেকেই অর্ডারলি তার মনিবের সঙ্গে দেখা হওয়ার নামেই মনে মনে কেমন ভয় পায়। তার অবচেতন মনে, সেই ইস্পাতের মতো

তীক্ষ্ণ নীল চক্ষুর দৃষ্টি, সেই কঠিন ভ্রূকুটি যেন মুদ্রিত হয়ে আছে। আজকাল সে তাই যথাসম্ভব মনিবকে এড়িয়ে চলে, সামনে যখন থাকে তখনো সোজা তার মুখের দিকে তাকায় না। আর তিন মাস গেলেই তার এই চাকরির মেয়াদ ফুরোবে। একটু অধীর ভাবেই সে সেই মুক্তির দিন গোনে। ক্যাপ্টেনের সামনে এলেই সে বেশ অস্বস্তি বোধ করে। মনিবের চেয়ে চাকরই নিজের মনে নিরিবিলিতে থাকবার জন্যে বেশি ব্যাকুল।

এক বছর ধরে সে ক্যাপ্টেনের কাছে কাজ করছে। কি তার কর্তব্য তা সে জানে এবং সহজেই তা সে পালন করে। তার মনিব, আর সেই মনিবের হুকুম তার কাছে রোদ বৃষ্টির মতোই এমন স্বাভাবিক ব্যাপার যা নির্বিচারে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। ব্যক্তিগত ভাবে সে ওসব কিছুর সঙ্গে জড়িত নয়।

কিন্তু এমন মনিবের সঙ্গে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে সে জড়িত এবং সেই জন্যে বন্দী বন্য পশুর মতো সে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল।

কঠিন, অটল নিয়মানুবর্তিতায় ক্যাপ্টেনের সমস্ত জীবন বাঁধা, সেই বর্ম ভেদ করেও এই তরুণ সৈনিকের সজীবতার প্রভাব তাকে যেন আলোড়িত করে তোলে। কিন্তু অভিজাত বংশে তার জন্ম, চলা-ফেরা থেকে তার দীর্ঘ সুগঠিত হাতের আঙুলগুলিতে পর্যন্ত সে পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের মনের এ গভীর চাঞ্চল্যকে সুতরাং সে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। প্রকৃতি তার আসলে অত্যন্ত উগ্র, চিরদিন সে প্রকৃতি সে দমন করে রেখেছে। মাঝে মাঝে দু-একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে নেমেছে, সৈন্যদের সামনে কখনো কখনো সে মেজাজ দেখিয়েও ফেলেছে। সব সময়ই তার মনে হয়, এই বুঝি নিজেকে আর সামলে রাখতে সে পারবে না। কিন্তু কর্তব্য-নিষ্ঠাকেই নিজের জীবনে সে বড় স্থান দিয়েছে। ওদিকে তরুণ

সৈনিকের জীবন সম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক। তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-ভঙ্গীতে পর্যন্ত বন্য প্রাণীদের মতো জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের পরিচয়।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ক্যাপ্টেন তার অর্ডারলিকে শুধু চাকরের মতো নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে আর দেখতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্ডারলির দিকে লক্ষ্য না রেখে সে পারে না, যখন তখন তাকে সে কড়া হুকুম দেয়, তাকে যথাসম্ভব খাটাবারই চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে রেগে উঠে জুলুম জবরদস্তি করতেও সে ছাড়ে না। আজকাল ক্যাপ্টেন তাকে তীব্র ভৎর্সনা করার সময়, অর্ডারলি নিজেকে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে নিয়ে যেন বধির হয়ে থাকে ; আরক্ত অপ্রসন্ন মুখে শুধু ভৎর্সনার পালা শেষ হবার জন্যেই অপেক্ষা করে। নিজেকে যেন সে অদৃশ্য কোনো বর্ম দিয়ে ঘিরে রাখে, তার মনিবের আক্রোশ, তার তিরস্কার, সে বর্ম ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে না।

তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতের দাগ ছিল। সেই সবল, নিটোল হাতে এই কুৎসিত দাগটুকু ক্যাপ্টেনকে অনেকদিন থেকে অদ্ভুতভাবে পীড়িত করেছে। একদিন সে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। অর্ডারলি তখন টেবিল-ক্লথটা ভালো করে পাতছিল, হঠাৎ পেন্সিল দিয়ে তার বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে ক্যাপ্টেন জিগগেস করেছে, 'এ দাগ কি করে হল ?'

চমকে উঠে অর্ডারলি উত্তর দিয়েছে, 'কুড়ুলের ঘায়ে, হের হাউপ্টমান।'

হাউপ্টমান আরো একটু বিশদ বিবরণের জন্য অপেক্ষা করেছে। কিন্তু আর কিছুই না বলে অর্ডারলি নিজের কাজে চলে গেছে। ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরেছে তার চাকর তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। মনের রাগ সে মনেই চেপে রেখেছে। তার পরদিন সেই দাগী বুড়ো আঙুলটা যাতে দেখতে না হয়, তার জন্যে নিজের মনকে সে প্রাণপণে দমন করেছে।

তার ইচ্ছে হয়েছে, ঐ আঙুলটা ধরে—কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতার কল্পনাতেই তার রক্তস্রোতে যেন আগুন ধরে গেছে।

ক্যাপ্টেন জানে তার চাকর শিগগিরই মুক্তি পাবে। উৎসুক ভাবেই সে যে তারই দিন গুণছে সে কথাও ক্যাপ্টেন জানে। এ পর্যন্ত অর্ডারলি হাউপ্টমানের কাছ থেকে যথা সম্ভব দূরে দূরেই থেকেছে। ক্যাপ্টেন তাতেই ক্রোধে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। অর্ডারলি কাছে না থাকলেও ক্যাপ্টেন অধীর হয়ে ওঠে, আবার সে সামনে থাকলেও যন্ত্রণা-কাতর তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। অর্ডারলির ভাবলেশহীন চোখের ওপর সূক্ষ্ম টানা ভুরুর রেখা তার কাছে অসহ্য। সামরিক জীবনের কঠোর শাসনও অর্ডারলির দেহে কোনো যান্ত্রিক কাঠিন্য আনতে পারেনি। তার সেই সৌষ্ঠবও হাউপ্টমানের চক্ষুশূল। হাউপ্টমানের জুলুম জবরদস্তি যত বাড়ে, যত সে আরো রূঢ় হয়ে অর্ডারলিকে বিদ্রূপজর্জর করে তোলে, অর্ডারলি ততই যেন আরো মূক, আরো ভাবান্তরহীন হয়ে ওঠে।

'গরু না ঘোড়ার বাচ্চা, যে সোজা সামনে তাকাতে পার না। আমি কথা বলবার সময় চোখ যেন আমার দিকে থাকে।'

অর্ডারলি তার মনিবের দিকে চোখ ফিরিয়েছে, কিন্তু সে চোখ যেন দৃষ্টিহীন। রাগ দমন করবার চেষ্টায় হাউপ্টমানের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে, তার লালচে ভুরু একটু কেঁপে উঠেছে।

একদিন হাউপ্টমান তার চাকরের মুখের ওপর একটা ভারী সামরিক দস্তানা ছুঁড়ে মারে। ইন্ধন দেওয়া আগুনের মতো অর্ডারলির চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে, আর তাইতেই হাউপ্টমান যেন এক অপরূপ তৃপ্তি পেয়ে, বিদ্রূপ ভরে হাসতে থাকে। সে হাসির পেছনে কোথায় যেন একটু ভয়ের কল্পনাও ছিল।

আর মাত্র দু-মাস বাকি। আপনা থেকেই অর্ডারলি নিজেকে সম্বরণ করে

রাখবার চেষ্টা করে। ক্যাপ্টেনের কাজ সে এমন ভাবে করে যেন তার মনিব কোনো একটা মানুষ নয়। একটা অবাস্তব কর্তৃত্ব মাত্র। সে ক্যাপ্টেনের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসতে চায় না, এমন কি স্পষ্ট ভাবে ঘৃণা করতেও নয়। কিন্তু তবু ক্যাপ্টেনের প্ররোচনায় যে ঘৃণা তার মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়ে ওঠে, তা সে নিজের সচেতন মনের আড়ালেই রাখতে চায়। কোনো দিন সৈন্যবিভাগ ছেড়ে গেলে পর, এ ঘৃণা নিজের কাছে স্বীকার করবার সাহস তার হয়তো হতে পারে। স্বভাবত সে নিরলস, বন্ধু-বান্ধবও তার অনেক, কিন্তু নিজে না জানলেও সে সত্যিই সঙ্গীহীন। এই নিঃসঙ্গতা এখন আরো যেন বেড়ে যায়। সৈন্যবিভাগের মেয়াদ এমনি ভাবেই হয়তো সে কাটিয়ে দিতে পারে, তবু ক্যাপ্টেনের আক্রোশ যত মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তত সে মনে মনে ভীত হয়ে ওঠে।

অর্ডারলি একটি মেয়েকে ভালবাসে—পাহাড়-অঞ্চলের একটি মেয়ে, স্বাধীন ও সরল। দুজনে এক সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতে যায়, কথা তারা পরস্পরের সঙ্গে বড় বেশি বলে না। কথা বলবার জন্য নয়, শুধু তাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটবার আনন্দেই অর্ডারলি তার সঙ্গে বেড়াতে যায়। শারীরিক এই স্পর্শটুকুই তার মন যেন জুড়িয়ে দেয়। ক্যাপ্টেনকে গ্রাহ্য না করা তার পক্ষে সহজ হয়।

হাউপ্টমান সে কথা বুঝতে পারে এবং সেই জন্যেই তার আক্রোশের আর অন্ত থাকে না। সমস্ত বিকেল সে অর্ডারলিকে ফুরসৎ পেতে দেয় না। অর্ডারলির মুখে যে রুদ্ধ আক্রোশের গাঢ় ছায়া পড়ে, তাই দেখেই তার আনন্দ। কখনো কখনো দুজনের চোখাচোখি হয়ে যায়। তরুণ সৈনিকের চোখে গভীর বিদ্বেষ, আর তার মনিবের দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিদ্রূপ।

নিজের মনের এই বিকার, হাউপ্টমান নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না। নিজেকে সে এই বলেই বোঝাতে চায় যে এরকম আহাম্মুক,

বেয়াড়া, মূর্খ চাকরের ওপর, যে কোনো লোকের পক্ষেই রেগে ওঠা স্বাভাবিক। সুতরাং নিজের কাছে নিজে সাধু সেজে অর্ডারলির প্রতি সমান ব্যবহারই সে করে যায়। কিন্তু মন তার ক্রমশই আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। একদিন হঠাৎ অর্ডারলির মুখের উপর সে একটা বেল্‌ট সজোরে চাবুকের মতো বসিয়ে দেয়। এই আকস্মিক আঘাতের বেদনায় অর্ডারলির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, তার মুখে রক্তের দাগ দেখা যায়, কিন্তু ক্যাপ্টেন এ দৃশ্যে গভীর লজ্জার সঙ্গে একটা অপরূপ উল্লাসের স্বাদ যেন পায়।

ক্যাপ্টেন মনে মনে জানে এরকম কাজ আগে সে কখনো করেনি। লোকটা সত্যিই অসহ্য। ক্যাপ্টেনের মনের ভেতরটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, কোনো আত্মসংযম তার নেই। এক নারী সঙ্গিনী নিয়ে সে কিছু দিনের জন্যে বাইরে বেড়াতে চলে যায়।

কিন্তু স্ফূর্তির নামে সে এক পরিহাস। সঙ্গিনীকে তার ভালোই লাগে না। তবু নির্দিষ্ট ছুটির দিনগুলো তার সঙ্গে কাটিয়ে সে যখন আবার ফিরে আসে, তখন তার মন নিতান্ত পীড়িত। বিরক্তি ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই। সমস্ত বিকেল ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে সে সোজা রাত্রের আহারে এসে বসল। তার অর্ডারলি কোথায় বেরিয়েছে। টেবিলের ওপর তার লম্বা সুগঠিত হাত দুটি রেখে হাউপ্টমান একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মনে হল সমস্ত রক্ত যেন তার বিষ হয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে অর্ডারলি ঘরে ঢুকল। তার ঘন কালো চুল, তার চমৎকার ভুরু, তার সবল, সুগঠিত, তরুণ দেহ-সৌষ্ঠব, সবই ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করে দেখল। এক হপ্তার মধ্যেই ছেলেটি যেন তার পুরানো স্বাস্থ্য ও প্রসন্নতা ফিরে পেয়েছে। হাউপ্টমানের হাতগুলো তখন কাঁপছে, সে হাতগুলোর মধ্যে কি যেন এক উন্মাদ শিখা জ্বলে উঠেছে।

নীরবে হাউপ্টমান খেয়ে চলেছে। একটু বেশি ব্যস্ত হওয়ার দরুনই বোধ-হয়, অর্ডারলির হাতে কয়েকটা ডিশ্ ঝন্ঝন্ করে উঠল।

'খুব তাড়া আছে নাকি?' অর্ডারলির উজ্জ্বল উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন জিগগেস করলে। কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

ক্যাপ্টেন আবার জিগগেস করলে, 'আমার কথার উত্তর দেবে কি?'

ডিশের বোঝা হাতে নিয়ে অর্ডারলি জবাব দিলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ক্যাপ্টেন খানিক অপেক্ষা করে, তার দিকে চেয়ে আবার জিগগেস করলে, 'খুব তাড়া আছে কি?'

এবার জবাব এল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎশিখা যেন খেলে গেল। সে জিগগেস করলে, 'কেন?'

'একটু বাইরে যাবার কথা ছিল।'

'না, এখন এখানে থাকতে হবে।'

অর্ডারলি একমুহূর্ত ইতস্তত করলে। ক্যাপ্টেনের মুখও কঠিন। অবশেষে অর্ডারলি প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'যে আজ্ঞে।'

হাউপ্টমান আবার বললে, 'কাল সন্ধ্যায়ও তোমাকে আমার দরকার হবে—আর তোমার জেনে রাখাই ভালো যে এখন থেকে কোনো দিনই বিকেলে তুমি ছাড়া পাবে না, যতদিন আমি ছুটি না দিই।'

অর্ডারলি অতি কষ্টে একবার মুখ খুলে বললে, 'যে আজ্ঞে।'

সে দরজার দিকে ফিরতেই ক্যাপ্টেন আবার জিগগেস করলে, 'তোমার কানে পেন্সিল গোঁজা কেন?'

অর্ডারলি একমুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর উত্তর না দিয়ে দরজার বাইরে চলে গেল। সেখানে প্লেটগুলো সাজিয়ে রেখে কান থেকে পেন্সিলের টুকরোটা নিয়ে পকেটে রাখল। যে মেয়েটিকে সে ভালো-বাসে, তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে সে একটা কবিতা এই পেন্সিল দিয়ে

ঢুকছিল। আবার সে টেবিল পরিষ্কার করতে ফিরে গেল। ক্যাপ্টেনের মুখে কেমন একটু ঔৎসুক্য, তার চোখের দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য।

'তোমার কানে পেন্‌সিল ছিল কেন?' আবার জিগগেস করলে।

অর্ডারলির হাতে ডিশের বোঝা। তার মনিব বড় সবুজ স্টোভটার কাছে দাঁড়িয়ে। মুখে ঈষৎ হাসি, চিবুকটা যেন সামনের দিকে ঠেলা। তার দিকে চেয়ে অর্ডারলির সমস্ত রক্ত হঠাৎ যেন আগুন হয়ে গেল, চোখে যেন আর সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। উত্তর না দিয়ে সে আচ্ছন্নের মতো দরজার দিকে ফিরল। ডিশ্‌গুলো সে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে সজোরে একটা লাথি খেয়ে সে উপুড় হয়ে পড়ল। ডিশ্‌টিস্‌গুলো সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, সে নিজে একটা রেলিং ধরে কোনো রকমে সামলে নিলে। তারপর যতবার সে উঠতে চেষ্টা করে ততবারই পেছন থেকে সজোরে লাথির পর লাথি খেয়ে তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে রেলিংটা ধরে সে বসে রইল। ক্যাপ্টেন তখন ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। নিচে দিয়ে যেতে যেতে পরিচারিকা ভাঙ্গা ডিশ্‌গুলোর অবস্থা দেখে, একটু বিদ্রূপের মুখভঙ্গী করে গেল।

হাউপ্টমানের বুকের ভেতর একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। একটা গ্লাশে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে সে এক ঢোকে সেটা খেয়ে ফেললে। বেশ খানিকটা মদ ঢালতে গিয়ে আগেই মেঝেয় পড়ে গেছে। সবুজ ঠাণ্ডা স্টোভটায় হেলান দিয়ে সে শুনতে পেল বাইরে তার অর্ডারলি সিঁড়ি থেকে ভাঙ্গা ডিশ্‌গুলো তুলছে। নেশায় আচ্ছন্নের মতো বিবর্ণ মুখে সে অপেক্ষা করে রইল। খানিক বাদে অর্ডারলি আবার ভেতরে ঢুকল। তখন কেমন যেন সে বিমূঢ়, যন্ত্রণায় ভালো করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। তার সেই অবস্থা দেখে ক্যাপ্টেনের বুকটা একটু মোচড় দিয়ে উঠল—একটা অদ্ভুত আনন্দের মোচড়।

ক্যাপ্টেন ডাকলে, 'স্কোনার।'

'আজ্ঞে,' অর্ডারলির উত্তর দিতে একটু দেরি হল।

'আমি তোমায় একটা কথা জিগগেস করেছিলাম,' তীব্র কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বললে, 'তোমার কানে পেন্‌সিল ছিল কেন?'

স্কোনারের মনে হল তার বুকের ভেতরটা যেন আগুনের মতো জ্বলছে, নিঃশ্বাস নিতেও তার কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণাকাতর চোখে হাউপ্টমানের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো সাড়া তার নেই। জ্বালাময় হাসির সঙ্গে ক্যাপ্টেন আবার পা তুললে। তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে স্কোনার বলে উঠল, 'আজ্ঞে আমি ভুলে গিয়েছিলাম!'

'পেন্‌সিলটা কি জন্যে ছিল?'

'আমি লিখছিলাম,' কথা বলবার চেষ্টায় স্কোনারের বুক দ্রুত ওঠা-নামা করছে ক্যাপ্টেন দেখতে পেল।

'কি লিখছিলে?'

আবার স্কোনার কথা বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক। কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বার হল না। হঠাৎ হাসিতে হাউপ্টমানের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং পর মুহূর্তেই ঊরুতে প্রচণ্ড বুটের ঠোক্কর খেয়ে স্কোনার এক পাশে কাত হয়ে পড়ল! তার মুখ, দুটি কালো নিস্পলক চোখ বাদে, একেবারে মৃতের মতো বিবর্ণ।

'তার পর?' হাউপ্টমান জিগগেস করলে।

স্কোনারের কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক, তার জিভটা যেন এক টুকরো শুকনো কাগজ। কথা বলার জন্যে সে একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। ক্যাপ্টেনের পা-ও সঙ্গে সঙ্গে ওঠায়, একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে, জড়িত ভাঙ্গা গলায় স্কোনার বললে, 'আজ্ঞে একটা কবিতা লিখছিলাম।'

'কবিতা! কিসের কবিতা?'—ক্যাপ্টেনের মুখে কেমন একটা বিবর্ণ হাসি।

শুষ্ক জড়িত স্বরে স্কোনার উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে একটি মেয়ের জন্যে।'
'ও, টেবিল পরিষ্কার কর,' বলে ক্যাপ্টেন মুখ ফেরালে। দু-বার কথা বলতে গিয়ে স্কোনারের গলাটা ধরে গেল। অবশেষে কোনো রকমে একটা অস্ফুট উচ্চারণ শোনা গেল, 'যে আজ্ঞে।'
স্কোনার এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্তে সে যেন বুড়ো হয়ে গেছে, তার চলার ভঙ্গী আড়ষ্ট।
ঘরে হাউপ্টমান একলা। কিছুতেই কোনো চিন্তা না করবার জন্য প্রাণপণে সে নিজেকে শাসন করছে। তার মনের ভেতর গভীর একটা কামনা-পূরণের তৃপ্তি, সেই সঙ্গে বিপরীত একটা যন্ত্রণা, তার মনের গভীরে কি যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা নিস্পন্দ ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনের ভেতর নানা বিরুদ্ধ অনুভূতির একটা প্রচণ্ড তাণ্ডব চলেছে। শুধু প্রাণপণে সঙ্কল্প করে তার মন সে চিন্তাশূন্য করে রেখেছে! মনের এই আলোড়নের তীব্রতা একটু কেটে যাবার পর, সে মদ্যপান করতে শুরু করলে। নেশায় একেবারে বেহুঁশ না হয়ে পড়া পর্যন্ত সে আর থামল না। সকালবেলা সে যখন উঠল, তখন কালকের কথা চেতনা থেকে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টায় সে অনেকখানি সফল হয়েছে। আসল ঘটনা তার মনে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, শুধু প্রচুর নেশা করবার পর যে অবস্থা হয়, মনে শুধু তেমনি একটা দুর্বলতা ও বিতৃষ্ণা। স্কোনার কফি নিয়ে যখন এল, তখন হাউপ্টমানের ভাব দেখে মনে হল, কোনো কিছুই যেন ইতিমধ্যে ঘটেনি। কাল সে যা করেছে, তা সে নিজের মনে স্বীকার করতে চায় না। যা কিছু হয়ে থাক, তার নিজের দায়িত্ব কিছু নেই। দোষ যদি কিছু থাকে, তা শুধু ঐ অবাধ্য, আহাম্মুক স্কোনারের।
অর্ডারলির সমস্ত বিকেলটা যেন নেশার ঘোরে কেটেছে। শুকনো গলাটা ভেজাবার জন্যে, সে খানিকটা বিয়ার খেয়ে নিয়েছিল কিন্তু বেশি খেতেও

তার ইচ্ছে হয়নি। মদে পাছে তার অনুভূতিগুলো আবার তীব্র হয়ে ওঠে, এই তার ভয়। শরীর মনের অবস্থা তার এমন, যে একবার বসলে আর ওঠবার ক্ষমতাই সে পায় না। কোনো রকমে আড়ষ্টভাবে সে সমস্ত কাজ করে গেল। তারপর একেবারে ক্লান্ত হয়ে যখন শুতে গেল, তখন সমস্ত শরীর মন তার অসাড়। ঘুম নয়, কেমন একটা আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে তার সমস্ত রাত কেটে গেল। মৃত্যুর মতো সেই গাঢ় আচ্ছন্নতা শুধু মাঝে মাঝে যেন চকিত বেদনার বিদ্যুৎ শিখায় বিদীর্ণ।

সকালে কুচকাওয়াজ হওয়ার কথা, কিন্তু বিউগল্ বাজবার আগে সে জেগে উঠল। তার সমস্ত বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা, কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক। আগেকার রাত্রের সমস্ত ঘটনাই তার মনে এখনো জেগে আছে। ঘরের অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এবার তাকে কাজে বেরুতে হবে। বয়স তার নিতান্ত অল্প। জীবনে সত্যকার দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার হয়নি বললেই হয়, তাই এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। শুধু এ রাত যদি আর না ফুরোয়, অন্ধকারে আবৃত হয়ে সে যদি অনির্দিষ্ট কাল এই ভাবে কাটিয়ে দিতে পারে, তাহলেই সে যেন বেঁচে যায়। কিন্তু তা হবার নয়। এই অসাড় যন্ত্রণা-কাতর দেহ নিয়ে তাকে এখুনি উঠতে হবে, সে জানে। ক্যাপ্টেনের ঘোড়ার সাজ পরাতে হবে, তার কফি তৈরি করে দিতে হবে। নিয়তির মতো অমোঘ এ কর্তব্যের শাসন না মেনে তার উপায় নেই।

সমস্ত দেহটা তার যেন একটা ভারী বোঝা, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজেকে ঠেলে তুলল। যে কোনো রকম অঙ্গচালনাই তার পক্ষে কষ্টকর। শুধু মনের জোরে তাকে সব কিছু করতে হচ্ছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে যন্ত্রণায় খাটের পায়াটা তাকে ধরে ফেলতে হল। নিজের উরুর দিকে চোখ পড়ায় সে দেখতে পেলে, সেখানে আঘাতের বড় বড় কালশিটে দাগ পড়েছে। একটু হাতের ছোঁয়া লাগলেও যেন যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাতে

হবে। কিন্তু অজ্ঞান হতে সে চায় না, কাউকে কিছু জানাতেও নয়। যা কিছু ঘটেছে, তা শুধু তার ও ক্যাপ্টেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। এখন তার পৃথিবীতে, সে আর তার ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই।

ধীরে ধীরে কোনো রকমে পোশাক পরে, সে প্রাণপণে হাঁটবার চেষ্টা করলে। তার চেতনায় সব কিছুই যেন আবছা। তবু কোনো রকমে সে নিজের কাজ সারলে। তার দেহের যন্ত্রণা যেন তার অসাড় মনকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলল। তবু এখনো অনেক কিছু বাকি। কফির ট্রে নিয়ে সে ক্যাপ্টেনের ঘরে গেল। ক্যাপ্টেনকে অভিবাদন করার সঙ্গে সঙ্গে স্কোনারের মনে হল, তার অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত এই বিলুপ্তি নীরবে সহ্য করে আবার ধীরে ধীরে সে যেন নিজের সত্তা ফিরে পেল। তার পর তার কাছে ক্যাপ্টেনই যেন ক্রমশ অস্পষ্ট, অবাস্তব হয়ে গেল। মনের এই অনুভূতিটি সে জোর করে ধরে রাখতে চায়। ক্যাপ্টেনের সত্যিকার কোনো অস্তিত্ব নেই, এইটুকু জোর করে মনে করতে পারলেই যেন সে নিজে বাঁচার আশা করতে পারে। কিন্তু কফি নিতে গিয়ে ক্যাপ্টেনের হাত কাঁপতে দেখে, আবার তার মনে হল, তার চারিদিকে সব কিছু যেন ভেঙ্গে পড়ছে।

তারপর বাইরে ক্যাপ্টেন যখন ঘোড়ায় চড়ে মার্চের হুকুম দিচ্ছে, আর সে নিজে বন্দুক আর সৈনিকের ঝোলা নিয়ে যাত্রা করবার জন্যে, যন্ত্রণা-কাতর দেহে তৈরী হয়ে আছে, তখন তার মনে হল, সব কিছুর ওপর শুধু যদি সে চোখ বুজে থাকতে পারে তাহলেই যেন সে বেঁচে যায়। সামনে তার শুষ্ক কণ্ঠে সুদীর্ঘ পর্যটনের যন্ত্রণা, এবং তা থেকে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে একটি মাত্র সঙ্কল্প জাগ্রত, যেমন করে হোক নিজেকে তাকে বাঁচাতেই হবে।

(২)

ক্রমশ গলা শুকিয়ে যাওয়াটাও তার সয়ে আসবে। দূরের আকাশে তুষার-ধবল পাহাড়ের চূড়াগুলো যে জ্বলছে, নিচের উপত্যকায় শাদাটে সবুজ তুষার নদী যে এঁকে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে, এই ব্যাপারটাই তার কাছে অপার্থিব, অপূর্ব। কিন্তু জ্বরের উত্তাপে তৃষ্ণায় তার পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। কোনো প্রতিবাদ, কোনো অনুযোগ না করে, সে কোনো রকমে হেঁটে চলেছে, কথা বলতে সে চায় না, কারুর সঙ্গে নয়। তুষারের কুচির মতো নদীর ওপর দুটো সিন্ধু-সারস উড়ছে। রৌদ্র-দগ্ধ সবুজ 'রাই'-ক্ষেতের গন্ধে যেন মন বিকল হয়ে যায়। দুঃস্বপ্ন-মথিত ঘুমের মতো তাদের যাত্রা আর ফুরোয় না, একঘেয়ে ভাবে চলেছে তো চলেইছে।
বড় রাস্তার পাশে একটা নিচু বিশাল গোলাবাড়ি, তার বাইরে অনেক-গুলো জলের টব রাখা হয়েছে। সৈনিকেরা জল খাবার জন্যে সেগুলো ঘিরে দাঁড়াল। তাদের শিরস্ত্রাণ খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তাদের ঘামে-ভেজা চুল থেকে গরম বাষ্প উঠছে। ক্যাপ্টেন ঘোড়ায় চড়েই তাদের লক্ষ্য করছিল। সে তার অর্ডারলিকে দেখতে চায়। তার হিংস্র হাল্কা রঙের চোখের ওপর মাথার শিরস্ত্রাণের ছায়া পড়েছে, শুধু তার গোঁফ, মুখ ও চিবুক রোদের আলোয় সুস্পষ্ট। অর্ডারলিকে ক্যাপ্টেনের ঘোড়ার কাছ দিয়েই যেতে হবে। সে যে ঠিক ভয় পেয়েছে তা নয়, শুধু তার মনে হচ্ছে, শূন্য খোলার মতো তার ভেতরটা যেন একেবারে খালি। সে যেন কিছুই নয়, রোদের মধ্যে সঞ্চরমান একটা ছায়া মাত্র। তৃষ্ণার্ত হলেও ক্যাপ্টেনের সামনে থেকে সে ভালো করে জল খেতেই পারল না। ভিজে চুল মোছবার জন্যে শিরস্ত্রাণটা খোলবারও তার উৎসাহ নেই। ছায়ার মধ্যেই সে থাকতে চায়, জোর করে সচেতন হতে চায় না।

হঠাৎ চমকে উঠে সে টের পেল, ঘোড়া চালিয়ে ক্যাপ্টেন দূরে চলে যাচ্ছে। মনের শূন্যতায় এখন আবার সে ফিরে যেতে পারে।

কিন্তু এই তপ্ত উজ্জ্বল সকালবেলায়, নিজের জীবনের জায়গা আর সে কিছুতেই ফিরে পাবে না। সব কিছুর মাঝখানে সে যেন একটা ফাঁক। ক্যাপ্টেনের মধ্যে জীবনের দম্ভ ও দৃঢ়তা, আর সে নিজে ছায়ার মতো শূন্য, একথা ভাবতেই তার সমস্ত দেহের ভেতর দিয়ে একটা আগুনের শিখা খেলে যায়।

সৈন্যদল এবার পাহাড়ের পথে উঠছে। সেই পথেরই বাঁক ঘুরে তারা ফিরে আসবে। নিচে গাছগুলোর মাঝখানে গোলাবাড়ির ঘণ্টা বাজছে। মাঠে খালি পায়ে যে সব চাষিরা ঘাস কাটছিল, তারা কাজ থামিয়ে পাহাড়ের পথে নেমে যাচ্ছে। তাদের পিঠ থেকে লম্বা বাঁকা কাস্তেগুলো কোনো প্রাণীর থাবার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। তারা যেন স্বপ্নের দেশের লোক। স্কোনারের মনে হয় তার সঙ্গে এদের কোনো সম্বন্ধ নেই। চারধারের সব কিছুরই যেন আকার আছে, সেই শুধু যেন নিরাকার অবাস্তব একটা চেতনা মাত্র, চিন্তা করতে পারে, বুঝতে পারে, এমন একটা শূন্যতা।

উজ্জ্বল পাহাড়ের পথে সৈনিকেরা নীরবে উঠছে। স্কোনারের মাথাটা এবার ঘুরতে শুরু করেছে মনে হল। চোখে সে মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখছে। হাঁটতে গিয়ে মাথায় তার রীতিমতো একটা কষ্ট বোধ হয়। বাতাস গন্ধে এত ভারী যে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। চারধারের সবুজ অরণ্য থেকে সরস পত্রপুঞ্জের একটা তীব্র দুঃসহ গন্ধ ভেসে আসছে। তারি সঙ্গে 'ক্লোভারের' সুবাস, যাতে মধু ও মৌমাছির কথা মনে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে আর একটা মৃদু কটু গন্ধের আভাস পাওয়া গেল। তারা বীচ গাছের জঙ্গলের কাছে পৌঁছেচে। এইবার একটা দম-বন্ধ-করা কুৎসিত গন্ধ। একপাল ভেড়া তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কালো

জোব্বা পরা রাখাল, বাঁকা লাঠি হাতে তাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্কোনারের মনে হয়, সে দেখতে পেলেও ভেড়াদের রাখাল যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

অবশেষে তাদের থামবার আদেশ দেওয়া হল। রাইফেলগুলো ত্রিভুজাকারে পরস্পরের গায়ে সাজিয়ে রেখে, তার চারধারে ঝোলা-ঝুলি ছড়িয়ে তারা একটু দূরে পাহাড়ের একটা ছোট ঢিবির ওপর গিয়ে বসল। সৈনিকদের সমস্ত দেহ তখন ধর্মাক্ত, কিন্তু তা বলে স্ফূর্তির অভাব নেই। দূরের নীল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে স্কোনার এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। অন্ধকার পাইন বনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের তলায় চওড়া একটা নদী বহুদূর পর্যন্ত যেন ঢালু পথে নেমে গেছে। মাইল-খানেক দূরে কারা একটা ভেলা ভাসিয়েছে। কাছেই বনের প্রান্তে [illegible]য়ালের মতো সারি দেওয়া পত্রবহুল বীচ্ গাছগুলোর পাশে, লাল ছাউনি দেওয়া গোলাবাড়িটা যেন গুঁড়ি মেরে আছে মনে হচ্ছে—তার তলার দিকটা শাদা, জানালাগুলো চৌকো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। এধারে ওধারে 'রাই,' 'ক্লোভার' আর ফিকে সবুজ গমের ক্ষেত। ঠিক তার পায়ের নিচে ঢিবিটার তলায় একটা কালচে রঙের জলা। সেখানে সরু লম্বা ডগার ওপরে 'গ্লোব' ফুলগুলো যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হল সে যেন ঘুমিয়ে পড়বে।

হঠাৎ তার চোখের সামনের এই রঙিন মরীচিকার ভেতরে কি যেন একটা গতির আভাস পাওয়া গেল। পাহাড়ের ধার ধরে, শস্য-ক্ষেত-গুলোর মাঝখান দিয়ে ঘোড়ায়-চড়া ক্যাপ্টেনের ফিকে নীল ও লাল মেশান মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে। দৃপ্ত দ্বিধাহীন ভঙ্গীতে ঘোড়ায় চড়ে ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসছে, সকালের সমস্ত উজ্জ্বলতা যেন তারই ওপর কেন্দ্রীভূত। ঘোড়ার বেগ কমিয়ে ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে তাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কোনারের মনে হল, তার মাথার ভেতরে

যেন একটা ভারী জ্বলন্ত অঙ্গার চেপে আছে। খেতে পর্যন্ত তার ইচ্ছে নেই। ক্যাপ্টেন কাছে এসে ঘোড়া থামাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা বিদ্যুৎশিখা খেলে গেল।

পাহাড়ের গায়ে সৈনিকেরা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে আছে। তাদের ফিকে নীল ও লাল মেশান ইউনিফর্মগুলো পাহাড়ের ওপর রঙিন বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। ঘোড়ার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চারদিকে চেয়ে ক্যাপ্টেন সত্যিই গর্ব অনুভব করলে। এই এতগুলি সৈনিক এবং তারই মধ্যে তার অর্ডারলি যে তার একান্ত অধীন এতে সে সত্যই খুশি। ঘোড়া চালিয়ে সে আর একটু ওপরে উঠে গেল। তারপর অধীনস্থ অফিসারের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে সে এক জায়গায় গিয়ে বসল। ইতস্তত ছড়ান সৈনিকদের মধ্যে সুউচ্চ পৃথক যে তার স্থান, তার বসবার ভঙ্গীতেই তা পরিস্ফুট। তার অর্ডারলি, সৈনিকদের জনতার মধ্যে তুচ্ছ, নগণ্য একজন মাত্র।

ক্যাপ্টেন নিচের দিকে চেয়ে দেখতে পেল, সূর্যালোকিত সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে তিনটি সৈনিক, ভারী দুটি জলের কলসী বয়ে টল্‌তে টল্‌তে চলেছে। দূরে একটা গাছের তলায় একটা টেবিল পাতা হয়েছে। ক্যাপ্টেনের অধীনস্থ অফিসার সেখানকার তদারক করতে অত্যন্ত ব্যস্ত। এবার ক্যাপ্টেন জোর করে যেন শক্তি সঞ্চয় করে তার অর্ডারলিকে ডাক দিলে। হুকুম শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্কোনারের কণ্ঠ পর্যন্ত সেই অগ্নিশিখা যেন লাফিয়ে উঠল। অন্ধভাবে সে উঠে দাঁড়াল, তার নিঃশ্বাস যেন রোধ হয়ে আসছে। ক্যাপ্টেনকে অভিবাদন করে মাথা নিচু করে সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন সরাইখানায় গিয়ে তাকে কি একটা অবিলম্বে আনবার আদেশ দিলে। ক্যাপ্টেনের গলার স্বরে কোথায় যেন একটু কম্পন ধরা পড়ছে।

ক্যাপ্টেনের আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্কোনারের বুকের ভেতরটা

আবার যেন জ্বলে উঠল। তার মনে হল, দেহের সমস্ত শক্তি আবার তার ফিরে এসেছে। কিন্তু যান্ত্রিক বাধ্যতার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে সে দ্রুতপদে উৎরাই পথে নামতে শুরু করলে। তার সামরিক বুটগুলোর ওপর ট্রাউজারের কাপড় ফুলে উঠে দূর থেকে তাকে প্রায় ভাল্লুকের মতো দেখাচ্ছে।

কিন্তু স্কোনারের বাইরের দেহই শুধু এমন যান্ত্রিক ভাবে, বাধ্য হয়ে হুকুম তামিল করতে ছুটছে। ভেতরে ধীরে ধীরে তার তরুণ জীবনের সমস্ত শক্তি যেন কোথায় কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছে। আদেশ পালন করে সে আবার পাহাড়ের পথ বেয়ে উঠে এল। মাথার ভেতর এমন একটা যন্ত্রণা যে, নিজের অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে থেকে বিকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে নিজের কঠিন সুদৃঢ় সত্তা সে ফিরে পেয়েছে—সে সত্তা কিছুতেই আর ছিন্নভিন্ন হবার নয়।

ক্যাপ্টেন বনের মধ্যে বেড়াতে গেছে। বনের প্রবেশ-পথে এসে আধ-ছায়ার মধ্যে ক্যাপ্টেনের ঘোড়াটাকে স্কোনার দেখতে পেলে। কাছেই একটা জায়গার অনেকগুলো গাছ সম্প্রতি কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। সূর্যালোকের পেয়ালার মতো স্বর্ণাভ-সবুজ ছায়াময় সেই উজ্জ্বল ফাঁকা জায়গাটিতে দুটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে, ক্যাপ্টেন ও তার অধীনস্থ অফিসার। অর্ডারলি দূরে এসে দাঁড়াল। বড় বড় গাছের গুঁড়ি, বিরাট নগ্ন সব দেহের মতো পড়ে আছে। বনের তলায় আলোর ছিটের মতো কাঠের সব টুকরো ছড়ান। অর্ডারলি শুনতে পেল ক্যাপ্টেন বলছে, 'তারপর আমি সামনে ঘোড়া চালিয়ে যাব।' অধীনস্থ অফিসার অভিবাদন করে চলে গেল। স্কোনার নিজে এবার ক্যাপ্টেনের দিকে অগ্রসর হল।

স্কোনার ধীরে ধীরে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। ক্যাপ্টেন সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে জানে এখন আর তারা মনিব ভৃত্য নয়,

এবার মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে চরম বোঝাপড়ার সময় এসেছে। অর্ডারলি নিচু হয়ে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর ক্যাপ্টেনের খাবার রাখল। তার রোদে-পোড়া নগ্ন উজ্জ্বল হাতগুলোর দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেন কি যেন বলতে চাইলে কিন্তু পারলে না। স্কোনার উরুর ওপর একটা বিয়ারের বোতল রেখে ছিপি খুলে, সেটা একটা মগে ঢালল। ক্যাপ্টেন মগটা হাতে নিয়ে যেন কতকটা প্রসন্ন ভাবেই বললে, 'গরম।'

আবার সেই অগ্নিশিখা স্কোনারের হৃদয় থেকে বেরিয়ে যেন তার নিঃশ্বাস রোধ করে দিলে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,' মাথা নিচু করেই সে ক্যাপ্টেনের বিয়ার পান করবার শব্দ শুনতে পেল। কি একটা প্রবল যন্ত্রণা যেন তার কব্জির মধ্যে অনুভব করে, হাত দুটো সে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করলে। মগের ঢাকনা বন্ধ করার মৃদু শব্দ শুনে সে মুখ তুলে তাকাল। ক্যাপ্টেন তার দিকেই চেয়ে আছে দেখে, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে। ক্যাপ্টেন নিচু হয়ে গাছের গুঁড়ির ওপর থেকে এক টুকরো রুটি তুলে নিলে, সে দেখতে পেলে। সেই নত দেহের দিকে চেয়ে আবার সেই অগ্নিশিখা যেন তার ভেতরে জ্বলে উঠল, তার হাত দুটোয় আপনা থেকে একটা ঝাঁকানি সে অনুভব করলে। ক্যাপ্টেন কেমন একটু অস্বস্তি যে বোধ করছে, তা তার বুঝতে আর বাকি নেই। ছিঁড়তে গিয়ে খানিকটা রুটি মাটিতে পড়ে গেল। দুটি মানুষ পরস্পরের মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুজনেরই মধ্যে একটা অনিশ্চিত ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষার উত্তেজনা। হাউপ্টমান যেন অতিকষ্টে রুটির টুকরো চিবোচ্ছে, অর্ডারলি মুষ্টিবদ্ধ হাতে মুখ ফিরিয়ে আছে।

তারপর স্কোনার চমকে উঠল। ক্যাপ্টেন আবার মগের ঢাকনিটা খুলেছে। মগের সেই ঢাকনিটা আর যে শাদা হাতে ক্যাপ্টেন মগের

হাতলটা ধরেছে, তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্কোনারের দৃষ্টি নিবদ্ধ
ক্যাপ্টেন মগটা তুলছে, স্কোনার একাগ্র দৃষ্টিতে তা লক্ষ্য করে যাচ্ছে
বিয়ার পান করবার সঙ্গে, ক্যাপ্টেনের গলার ওঠা-নামা, তার সবল
চোয়ালের নড়া-চড়া, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। তার সবল বাহুতে
কব্জিতে, ভেতর থেকে যে শক্তির প্রচণ্ড আকর্ষণ সে অনুভব করছিল
তা যেন হঠাৎ মুক্ত হয়ে গেল। তার মনে হল একটা লেলিহান
শিখায় তার দুই বাহু যেন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে
সে লাফ দিলে।

সশব্দে ক্যাপ্টেন একটা ধারাল কাঠের গুঁড়ির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে
গেল। তার পায়ের কাঁটা দেওয়া ঘোড়সওয়ারী জুতো একটা শিকড়ে
গেল আটকে, হাত থেকে বিয়ারের পাত্রটা তার আগেই ছিটকে
পড়ে গেছে। সেই মুহূর্তেই ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ধরে উ
একাগ্র মুখে স্কোনার তার বুকের ওপর পা দিয়ে চেপে বসে,
পণে ক্যাপ্টেনের চিবুকটা কাঠের গুঁড়ির কিনারায় ঠেলে ধরলে। এই
ঠেলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে তার অপূর্ব একটা মুক্তির স্বাদ সে অনুভ
করলে। তার দুই কব্জিতে পরিতৃপ্তির একটা অপরূপ উল্লাস। শরীরের
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, দুই হাতের তালু দিয়ে সে ক্যাপ্টেনে
চিবুকটা পেছন দিকে ঠেলতে লাগল। ক্যাপ্টেনের মুখ দাড়িতে ইতি-
মধ্যেই একটু কর্কশ হয়ে উঠেছে। সেই সবল চোয়াল, সেই ক
চিবুক হাতের মধ্যে অনুভব করাতেও যেন একটা তৃপ্তি আছে
রক্তের দুরন্ত উন্মাদনায় প্রচণ্ড শক্তিতে চাপ দিতে দিতে খুট করে একটু
শব্দ হল, তারই সঙ্গে হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবার মতো একটা অনুভূতি
স্কোনারের মনে হল তার সমস্ত মাথাটা বুঝি বাষ্প হয়ে যাচ্ছে
ক্যাপ্টেনের সমস্ত শরীর মৃত্যুর আক্ষেপে বীভৎসভাবে কুঁকড়ে দুমড়ে
যাচ্ছে। স্কোনারের পক্ষে সে দৃশ্য যেমন ভয়াবহ, তেমনি একটা অদ্ভুত

আনন্দও আছে, সেই আক্ষেপ রোধ করার চেষ্টায়। ক্যাপ্টেনের বুকের ওপর তখনো সে চেপে বসে আছে। তার উরুর চাপে ক্যাপ্টেনের বুক যে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে বসে যাচ্ছে, ক্যাপ্টেনের সমস্ত দেহের কাঁপুনিতে তাকে পর্যন্ত যে নাড়া দিচ্ছে, এতেও যেন কি একটা আনন্দের স্বাদ।

অবশেষে সব শান্ত হয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের নাকের ফুটোগুলো সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তার চোখ দেখা যাচ্ছে না বললেই হয়। মুখটা এমন ভাবে পেছন দিকে ঠেলা যে ঠোঁট দুটোকে অত্যন্ত স্ফীত মনে হচ্ছে। তারই ভেতর থেকে খাড়া খাড়া গোঁফগুলো কুৎসিতভাবে বেরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে নাকের গহ্বর দুটো রক্তে ভরে আসছে দেখে, সে চমকে উঠল। সে রক্ত নাক ছাপিয়ে উঠে একটি ক্ষীণ ধারায় মুখ বেয়ে চোখে গিয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে সে এবার উঠে পড়ল। সেই অসাড় দেহটার দিকে চেয়ে ...র মনে হল, যে তাকে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত করেছে, এ তারই দেহ হলেও, যেন এর মূল্য অনেক বেশি। মৃত দেহের চোখের দিকে চাইতে তার ভয় করছে। চোখগুলো এখন সত্যই বীভৎস, শুধু শাদা অংশগুলি দেখা যাচ্ছে, তার ভেতর আবার রক্তের ধারা এসে জমেছে। এ দৃশ্যে যত আতঙ্কই হোক, মনে মনে স্কোনার পরিতৃপ্ত। ক্যাপ্টেনের যে মুখ সে ঘৃণা করেছে তা এখন নির্বাপিত। তবু ক্যাপ্টেনের মৃতদেহটার দৃশ্য সে যেন সহ্য করতে পারছে না। যেমন করে হোক এটাকে লুকোতেই হবে। তাড়াতাড়ি বড় বড় কাটা গাছের গুঁড়িগুলোর তলায় সে মৃতদেহটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে। মুখটা রক্তে বীভৎস হয়ে উঠেছে। শিরস্ত্রাণ দিয়ে সে সেটা ঢেকে দিলে। তারপর হাত-পাগুলো টেনে সোজা করে দিয়ে, পোশাকের ওপর থেকে ঝরা পাতাগুলো সে সরিয়ে দিলে। গুঁড়িগুলোর তলায় এবার ক্যাপ্টেনের দেহটা শান্ত ভাবে শায়িত। কাঠগুলোর ফাঁক দিয়ে একটা দীর্ঘ রোদের রেখা বুকটার ওপর সোজা গিয়ে পড়েছে।

স্কোনার সেখানে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল। তার নিজের জীবনও এই-খানেই সমাপ্ত।

তারপর আচ্ছন্ন মনে সে শুনতে পেল লেফটেনেণ্ট বনের বাইরে সৈনিক-দের উচ্চৈস্বরে বোঝাচ্ছে যে, নিচের নদীর ওপরকার সেতুটা শত্রুপক্ষের দখলে মনে করে, তাদের কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে। লেফটেনেণ্টের বোঝাবার ক্ষমতা বিশেষ নেই। অভ্যাস মতো কান পেতে থাকলেও স্কোনারের কাছে সব গুলিয়ে গেল। লেফটেনেণ্ট আবার যখন বোঝাতে শুরু করল তখন সে আর কানই দিলে না।

এইটুকু সে জানে যে, তাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। সে দাঁড়িয়ে উঠল। এখনো যে সূর্যালোকে গাছের পাতা ঝিকমিক করছে, এখনো যে মাটিতে কাঠের টুকরোগুলোর ওপর থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে, তার কাছে এটা আশ্চর্য মনে হল। তার নিজের কাছে সমস্ত পৃথিবী বদলে গেছে। আর সকলের কাছে সে পৃথিবী আগেকার মতোই থাকলেও তার আর সেখানে ফিরে যাবার উপায় নেই। বিয়ারের বোতল আর মগটা তার ফেরত দেওয়া উচিত সে বোঝে, কিন্তু আর তা সম্ভব নয়। লেফটেনেণ্ট এখনো ধরা গলায় তার বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করছে। এখনই চলে না গেলে সৈনিকেরা এসে পড়তে পারে। কারু সান্নিধ্য এখন সে সহ্য করতে পারবে না। নিজের চোখের ওপর আঙুল-গুলো একবার সে বুলিয়ে নিলে। কোথায় সে আছে, সে বুঝতে চায়। দূরে বনের পথে ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়ে সে তার ওপর গিয়ে চড়ে বসল। ঘোড়ার ওপর বসতে তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে, তবু বনের পথে ঘোড়া চালিয়ে সে এগিয়ে চলল। খানিক দূর যাবার পর বনের প্রান্তে এসে সে ঘোড়াটা থামিয়ে দাঁড়াল। সূর্যালোকিত উপত্যকায় একদল সৈনিক চলেছে। দূরে একটা জমিতে মই দিতে দিতে প্রতিবার বাঁক নেবার সময় এক চাষি তার বলদের ওপর হাঁক পাড়ছে। ছোট্ট গ্রাম,

আর শাদা চূড়ার গির্জাটি, এই সমস্ত দৃশ্যের মাঝখানে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে। এই সব কিছু থেকে সে এখন বিচ্ছিন্ন। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রা থেকে সে কোন অজানা জগতে সরে গেছে। আর তার ফেরবার উপায় নেই, ইচ্ছাও নেই।

সূর্যালোকিত সেই উপত্যকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে আবার গভীর বনের ভেতর ঘোড়া চালিয়ে দিলে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি চারধারে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তারা স্তব্ধ নির্বিকার। চঞ্চল আলো-ছায়ার টুকরোর মতো একটি হরিণী সেই রোদ ছিটানো ছায়ার মধ্য দিয়ে দৌড়ে গেল। বনের ঘন পত্রপুঞ্জের মাঝে মাঝে, এখানে সেখানে উজ্জ্বল সবুজ ফাঁক দেখা যাচ্ছে। তারপর শীতল অন্ধকার পাইন বন শুরু হল। যন্ত্রণায় তখন সে একেবারে কাতর, তার মাথার ভিতরে একটা বিরাট শিরা অসহ্য ভাবে দপ দপ করছে। জীবনে সে কখনো সুস্থ হয়নি, তাই নিজেকে তার একান্ত অসহায় মনে হয়। সমস্ত ব্যাপারটা তাকে একেবারে বিহ্বল করে দিয়েছে।

ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে সে পড়ে গেল। যন্ত্রণা তার এত তীব্র হবে সে ভাবতে পারেনি। শরীর তার এমন অবশ যে, টাল সামলাবারও তার ক্ষমতা নেই। ঘোড়াটাকে লাগামে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে ছেড়ে দিতেই সেটা বনের পথে ছুটে বেরিয়ে গেল। পুরনো জগতের সঙ্গে এইটিই ছিল তার শেষ যোগ।

সে এখন শুধু নিরুপদ্রব শান্তিতে শুয়ে থাকতে চায়। পাহাড়ের একটা ঢালুতে, বীচ্ ও পাইন গাছের বনের ভেতর একটা নির্জন শান্ত জায়গা খুঁজে পেয়ে সে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনে হল তার চেতনা যেন তাকে ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তার মধ্যে অতিকায় একটা ব্যাধির শিরা দপদপ করছে, সেই কম্পমান শিরা যেন সমস্ত পৃথিবীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে। উত্তাপে তার সমস্ত শরীর পুড়ে

যাচ্ছে। কিন্তু মনের মধ্যে তার যে অসংলগ্ন বিকারগ্রস্ত চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে, তাতে সে সব লক্ষ্য করবার ক্ষমতা তার নেই।

(৩)

হঠাৎ চমকে সে জ্ঞান ফিরে পেল। মুখ তার শুকনো কঠিন, বুকটা সজোরে ধক্ ধক্ করছে, উঠে দাঁড়াবারও তার ক্ষমতা নেই। কোথায় সে এখন? সৈনিকদের ব্যারাকে, না বাড়িতে? কোথায় কিসের যেন বার বার একটা আঘাত সে টের পাচ্ছে। অতি কষ্টে সে চারদিকে চেয়ে দেখলে—চারধারে গাছ আর সবুজ পাতার ছড়াছড়ি, আর তারই মাঝে মাটিতে উজ্জ্বল লালচে খণ্ড খণ্ড রৌদ্রালোক। সে যে কে, তা সে নিজেই যেন জানে না, যা সে দেখছে, তা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কোথায় কি একটা এখনো ঘা দিচ্ছে। সে সম্পূর্ণ সচেতন হবার একবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তবু চেষ্টা সে ছাড়ে না। ধীরে ধীরে চারধারের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সে খুঁজে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত হৃদয় একটা নিদারুণ ভয়ে শিউরে ওঠে। কে যেন কোথায় ঘা দিচ্ছে। মাথার ওপরে একটা 'ফার' গাছ থেকে কালো ভারী কাপড়ের টুকরোর মতো কি যেন ঝুলে আছে সে দেখতে পেল, তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল। তবু চোখ সে যে বন্ধ করেনি সে জানে। সেই অন্ধকার কেটে ক্রমশ আবার তার দৃষ্টি ফিরে আসে। কে যেন কোথায় এখনো ঘা দিচ্ছে। হঠাৎ সে ক্যাপ্টেনের রক্তাক্ত মুখ দেখতে পায়। এ মুখ সে ঘৃণা করে, কিন্তু আতঙ্কে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। গভীর অন্তরে যদিও সে জানে যে ক্যাপ্টেন মৃত, তবু বাইরের মন বিকারের প্রভাব ছাড়াতে পারে না। ঘা দিচ্ছে, তবু কে ঘা দিচ্ছে। মৃতের মতো সে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল, তারপর অচেতন হয়ে গেল।

আবার যখন সে চোখ খুললে, তখন একটা বড় গাছের গুঁড়ি বেয়ে, কি

একটা দ্রুত উঠে যাচ্ছে দেখে, সে চমকে উঠল। ছোট একটা পাখি। পাখিটা মাথার ওপরে শিস দিচ্ছে। ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ—ছোট চঞ্চল পাখিটা ঠোঁট দিয়ে গাছের গুঁড়ি ঠোকরাচ্ছে, তার মাথাটা যেন ছোট্ট গোল হাতুড়ি। কৌতূহলী হয়ে সে চেয়ে রইল। পাখিটা অদ্ভুতভাবে দ্রুত একপাশে সরে গেল, তারপর ইঁদুরের মতো গুঁড়ি বেয়ে পিছলে নেমে এল। এই দ্রুত পিছলে নামা দেখে, স্কোনারের মনের ভেতর একটা নিদারুণ বিতৃষ্ণা জাগে। সে মাথা তোলবার চেষ্টা করে, মাথাটা দারুণ ভারী। তারপর ছোট পাখিটা মাথা নাচিয়ে ছায়া থেকে এক ঝলক রোদের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে যায়, তার শাদা পা দুটো মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কি পরিপাটি আঁট তার গড়ন, পাখায় শাদা ছিট থাকার দরুন সত্যিই সুন্দর দেখায়। ওরকম পাখি একটা নয়, অনেক-গুলিই কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। দেখতে সুন্দর হলে কি হয়, বেয়াড়া ইঁদুরের মতো বীচ্ গাছের গুঁড়িগুলোর মধ্যে তাদের দ্রুত চলা-ফেরা ভারি বিশ্রী।

আবার সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল, তার চেতনা আবার আচ্ছন্ন। গাছের গা বেয়ে যে পাখিগুলো ওঠা-নামা করছে, ওইগুলোই যেন তার আতঙ্কের বস্তু। তার মাথার ভেতর সমস্ত রক্ত যেন এই পাখিগুলোর মতোই চলা-ফেরা করছে, তবু সে নড়তে পারছে না।

আবার যখন তার চেতনা ফিরে এল, তখন সমস্ত শরীরে তার গভীর বেদনাময় ক্লান্তি। তার নড়বার ক্ষমতা নেই, তারই সঙ্গে মাথার সেই যন্ত্রণা। কে-ই বা সে, কোথায়ই বা সে আছে, ঠিক কিছুই সে বুঝতে পারছে না। হয়তো তার সর্দিগর্মি হয়েছে। তা না হলে কি ? ক্যাপ্টেনকে সে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিয়েছে, এই কিছুক্ষণ আগে—না, অনেক, অনেক আগে। তার মুখে রক্ত লেগেছিল, তার চোখ গিয়েছিল উল্‌টে। তবু যা হয়েছে, তাতে আফসোসের কিছু নেই। শাস্তি তো সে পেয়েছে ?

কিন্তু এখন সে যেন আর নিজেরই থই পাচ্ছে না। এই কি জীবন?' না, জীবনের বাইরে সে চলে এসেছে। নিজে সে এখনো অবশ্য ঠিক আছে। আর সবাই যেন আছে একটা বিরাট উজ্জ্বল জায়গায়, শুধু সেই আছে বাইরে। শহর, সমস্ত দেশ, একটা বিরাট উজ্জ্বল আলোকের ক্ষেত্র, আর সে এইখানে বাইরের এই মুক্ত অন্ধকারে একলা। এখানে সব কিছুরই অস্তিত্ব নিঃসঙ্গ। কিন্তু তাদের সকলকেই কোনো না কোনো দিন এখানে আসতে হবে। তাদের সে ছেড়ে এসেছে। এখন তারা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। তার বাপ ছিল, মা ছিল, প্রিয়াও ছিল। কিন্তু তাদের জন্যে কি আর আসে যায়? এ আর এক মুক্ত দেশ।

সে উঠে বসল। কি যেন একটা খস্ খস্ করে চলে যাচ্ছে। একটা ছোট্ট মেটে রঙের কাঠবিড়ালী। মাটির ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে যেতে, তার সমস্ত দেহে অপরূপ যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সে ঢেউ, তার লাল ল্যাজটুকুতে গিয়ে শেষ। খানিক দূর গিয়ে কাঠবিড়ালীটা বসে পড়ে ল্যাজ দোলাতে লাগল। কাঠবিড়ালীটাকে দেখতে তার ভালো লাগছে। প্রাণের খুশিতে সেটা খেলা করে বেড়াচ্ছে। আর একটা কাঠবিড়ালীকে সে হঠাৎ তাড়া করে গেল, তারপর দুটিতে নানা রকম কিচিরমিচির করতে করতে পরস্পরের দিকে ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। স্কোনার তাদের সঙ্গে কথা কইতে চায়, কিন্তু গলা দিয়ে তার একটা চাপা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরুল না। কাঠবিড়ালী দুটো পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে গাছে গিয়ে উঠল। একটা কাঠবিড়ালী একটা গাছের মাঝামাঝি গিয়ে, তার দিকে উঁকি মারছে। এতক্ষণ সে এদের দেখে মজাই পেয়েছে, কিন্তু হঠাৎ কি একটা ভয়ে সে শিউরে উঠল। কাঠবিড়ালীটা এখনো সেইখান থেকে ধারালো মুখে তার দিকে চেয়ে আছে। তার ছোট ছোট কানগুলি খাড়া, থাবার মতো ছোট ছোট হাতগুলো গাছের বাকলে আটকান, শাদা বুকটা উঁচু হয়ে আছে।

আতঙ্কে শিউরে উঠে স্কোনার প্রাণপণ চেষ্টায় দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল। তারপর তার হাঁটার আর বিরাম নেই। কি একটা সে খুঁজছে—সে জল চায়। জলের অভাবে তার মাথাটা যেন আগুন হয়ে আছে। টলতে টলতে খানিক দূরে গিয়েই তার চেতনাও লুপ্ত হয়ে গেল। অচৈতন্য অবস্থাতেই সে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে, শুধু তার তৃষিত মুখটা জলের জন্য উন্মুক্ত।

আবার যখন সে অবাক হয়ে চোখ খুলল, তখন কোনো কিছু স্মরণ করবার চেষ্টা আর তার নেই। তার চারধারে স্বর্ণাভ-সবুজ ঝিকিমিকি, আর, তারই ওধারে গাঢ় সোনালী আলো, আরও দূরে ধূসর বেগুনী আলোর দীর্ণ রেখা, আর তা ছাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান অন্ধকার। তার মনে হয় এবার যেন সে যেখানে পৌঁছবার সেখানে এসে পৌঁছেচে। সত্যের সেই আঁধার অতলতায়, চরম বাস্তবতায় সে যেন উপস্থিত। শুধু তার মাথার মধ্যে জ্বলন্ত একটা তৃষ্ণা। নিজেকে আর তার ভারী ঠেকছে না, সে অনেক হাল্কা হয়ে গেছে, বুঝি এইটাই তার নতুনত্ব। বাতাসে বজ্রের গুরুগুরু। তার মনে হয় সে যেন আশ্চর্য রকম দ্রুতগতিতে সোজা মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে—মুক্তি না জল?

হঠাৎ সে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে অসীম অনন্ত দীপ্তি—দিগন্তব্যাপী বিরাট দেদীপ্যমান সোনা। কয়েকটা বড় বড় অন্ধকার গাছের গুঁড়ি শুধু মাঝখানে গরাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তারই ওপারে এই দীপ্তি সম্বপক বিশাল গমের ক্ষেত থেকেই আসছে। রেশমী সবুজ ডগার ওপর পাকা গমের শীষগুলি যেন জ্বলন্ত পালিশ করা সোনা। মাথায় কালো কাপড় বাঁধা একটি চাষির মেয়ে সেই উজ্জ্বল গমের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে কালো ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে। দূরে ছায়া ঢাকা ফিকে নীল একটা গোলাবাড়ি। একটা গির্জার চুড়ো প্রান্তরের সোনালী দীপ্তির সঙ্গে যেন মিশে গেছে। মেয়েটি তার কাছ থেকে দূরে চলে

যাচ্ছে। তার সঙ্গে কথা বলার ভাষা সে জানে না। সে জানে ঐ মেয়েটির মধ্যেও সেই দূরের জগতের উজ্জ্বল, কঠিন, অবাস্তবতা। কথা বলতে গিয়ে ওরা যে শব্দ করবে, তাতে তার মাথা শুধু গুলিয়েই যাবে। তার দিকে চেয়েও মেয়েটি তাকে দেখতে পাবে না। মেয়েটি ওপারে চলে যাচ্ছে। একটা গাছে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে সে যখন মুখ ফেরাল, তখন চারধার একটু একটু করে অন্ধকার হয়ে আসছে। পাহাড়গুলো যেন আর বেশি দূরে নয়, কি এক অপরূপ আলোয় তারা উজ্জ্বল। নীলাকাশ কেটেই কে যেন তাদের তৈরি করেছে—উজ্জ্বল, স্তব্ধ নীরবতা! উদ্ভাসিত মুখে সেই পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল তার ভেতরকার তৃষ্ণাও ওই পাহাড়গুলোর ওপরকার সোনালী তুষারের মতোই উজ্জ্বল। একটা গাছে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সব কিছুই তার সামনে ধীরে ধীরে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

সারা রাত, থেকে থেকে সমস্ত আকাশ শাদা করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকায়। সে বুঝি আবার হাঁটতে শুরু করেছে। থেকে থেকে সমস্ত পৃথিবী কয়েক মুহূর্তের জন্যে অস্পষ্ট নীলাভ আলোয় যেন তার চারধারে নেমে আসে, প্রান্তরগুলোকে দেখায় যেন ধূসর সবুজ আলোর একটা প্রলেপ, গাছগুলো তার মাঝে জমাট বাঁধা অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে, আর শাদা আকাশের ওপর কালো মেঘপুঞ্জ। তারপর জানালার পাল্লার মতো অন্ধকার যেন নেমে এল, নিশ্ছিদ্র নিবিড় রাত্রি। অর্ধস্ফুট জগতের ক্ষীণ একটু চাঞ্চল্য, সে জগত যেন অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ ঝাঁপ দিয়ে বেরুতে পারেনি। তারপর আবার পৃথিবীর ওপর বিস্তীর্ণ একটা বিবর্ণতার আভাস, তারই মধ্যে অন্ধকারের নানা আকৃতি, ওপরে ভাসমান মেঘপুঞ্জ। পৃথিবী একটা প্রেতায়িত ছায়া, বিশুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে আবার যেন সম্পূর্ণ হয়ে ফিরে আসছে।